

জানুয়ারী, ১৮৯০।

নববর্ষ।

ভাই!
  আজ শুভ দিনে
  লও হাসি মুখে
    স্নেহ উপহার মম।
বোন!
  স্নেহ প্রতিদান
  লও জ্ঞান ধন
    কি আছে জ্ঞানের সম।

অষ্টম বর্ষ।



সুখে দুঃখে আর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। "সখা"র বয়স আজ আট বৎসর। শিশু যখন হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়িয়া এক আধ্ পা চলিতে শিখে, তাহার সুন্দর মুখে যখন এক একটী করিয়া আধ আধ কথা ফুটিতে থাকে; তখন পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের কত সুখ। তারপর যখন ক্রমে বয়সের সঙ্গে জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, চরিত্র গঠিত হইয়া উঠে, সন্তানের যশের আলোকে পিতা মাতার মুখ উজ্জ্বল হয়, তখন পিতা মাতা কতই না সুখী হন। কিন্তু যিনি সে সুখ অনুভব করিবেন, তিনি আজ কোথায়! যাঁহার আদরের "সখা" আজ সাত বৎসর অতিক্রম করিয়া আট বৎসরে পা দিতেছে, তিনি আজ কোথায়? আমাদিগের অনুপযুক্ত হাতে "সখা"র লালনপালনের ভার পড়িয়াছে; আজ "সখা"কে আট বৎসরের দেখিয়া আমাদেরই কত সুখ হইতেছে। "সখা"র যিনি জন্মদাতা, আজ "সখা"কে আট বৎসরের দেখিয়া তাঁহার কতই সুখ—কতই না আনন্দ হইত! প্রমদাচরণের অকাল মৃত্যুতে যাঁহাদের উপর তাঁহার আদরের "সখা"র লালনপালনের ভার পড়িয়াছে, প্রতিপদে তাঁহাদের কেবল তাঁহার কথাই মনে পড়ে। আজ নূতন বর্ষে—সখার জন্ম তিথিতে আরও বিশেষ ভাবে তাঁহার কথা মনে হইতেছে। তিনি জীবিত থাকিলে আজ সখার জন্ম তিথিতে কত উৎসব করিতেন। তাঁহার আদরের "সখা"কে কত বসন-ভূষণে সাজাইতেন। আমরা তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারিতেছি না। তাঁহার আদরের "সখা"র উপযুক্ত রূপ আদর ও উপযুক্ত রূপ লালনপালন করিতে পারিতেছি না। আমরা "সখা"কে অবহেলা, উপেক্ষা বা অযত্ন করিতেছি না। আমরা প্রাণপণে ইহাকে যত্ন করিতেছি, লালনপালন করিতেছি। কিন্তু পিতা মাতার লালনপালনের সঙ্গে, অন্যের যত্ন, অন্যের লালনপালনের তুলনা কোথায়? এই অনাথ শিশুর ভার যে দিন হইতে আমাদিগের অনুপযুক্ত হাতে পড়িয়াছে, সেই দিন হইতেই আমরা বুঝিয়াছি যে, অতিশয় গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার আমাদিগের হাতে পড়িল। আমরা প্রতিপদে বুঝিতেছি যে, "সখা"র অযত্ন হইতেছে, উপযুক্ত প্রকার লালন-পালন হইতেছে না। ইহাতে যেমন আমরা লজ্জিত আছি, তেমনি সময় সময় আমাদিগের ক্ষোভ এবং দুঃখ হয়। কিন্তু এক সান্ত্বনা আমাদিগের আছে। প্রমদাচরণের আদরের "সখা"র যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে অকালমৃত্যু ঘটে নাই ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা, এবং ইহাই আমাদের একমাত্র সুখ। প্রমদাচরণ তাঁহার আদরের "সখা"কে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কত যত্নে কত আদরে লালনপালন করিয়া, তিন বৎসরের সময় ইহাকে অনাথ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে লালনপালনের অভাবে ও অযত্নে "সখা"র অকালমৃত্যু ঘটে নাই ইহাই আমাদের একমাত্র সুখ। আমরা "সখা"র উপযুক্ত প্রকার লালন-পালন করিতে পারিতেছি না সত্য, উপযুক্ত প্রকার আদর যত্ন করিতে পারিতেছি না সত্য, কিন্তু ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। আর প্রমদাচরণ

"সখা"র যে কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া দিয়াছেন, আমরা প্রাণপণে সেই পথে চলিতে চেষ্টা করিতেছি। আট বৎসর পূর্ব্বে "সখা"র জন্মদিনে তিনি লিখিয়াছিলেন যে "বালক বালিকাদিগের চরিত্রের বিকাশ এবং জ্ঞানের বিস্তার করাই আমাদের লক্ষ্য।" আমরাও সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছি।

"সখা" কাহাকেও কুপথে লইয়া যায় নাই, কাহারও সহিত কলহ বিবাদ করে নাই, কাহাকেও কঠিন কথা বলিয়া হৃদয়ে ব্যথা দেয় নাই, ইহাই আমাদের সুখ। প্রকৃত "সখা"র ন্যায় বালক বালিকাদিগকে সৎকথা বলিয়াছে, সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। আজ "সখা"র এই জন্মতিথিতে পরলোক হইতে প্রমদাচরণ তাঁহার আদরের "সখা"কে আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা সেই আশীর্ব্বাদ এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লইয়া, আবার নূতন বর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। পাঠক-পাঠিকাগণ! নববর্ষে—আজ "সখা"র জন্মতিথিতে তোমাদিগকে আমরা স্নেহ জানাইতেছি, তোমরাও তোমাদের "সখা"কে স্নেহের সহিত গ্রহণ কর।



সুখ ও সন্তোষ।

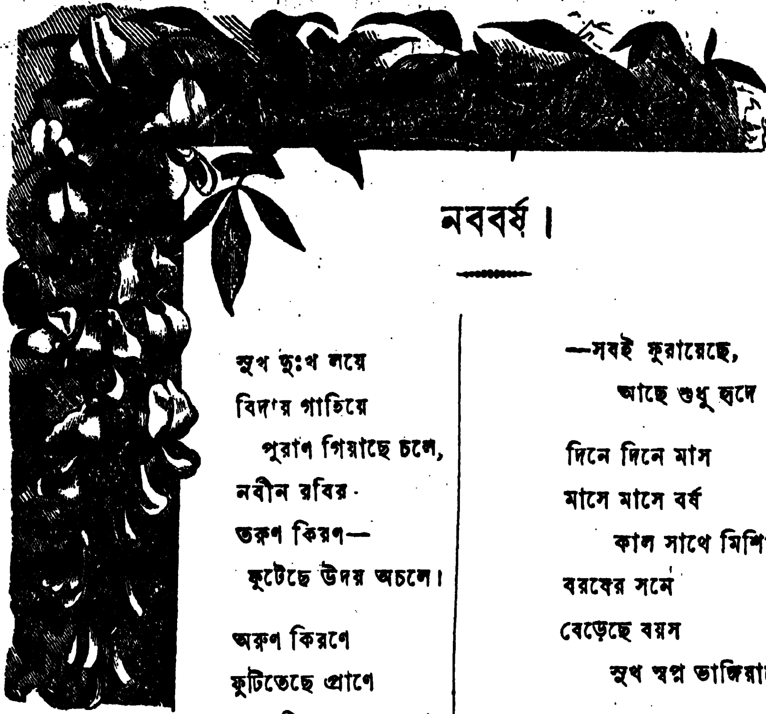
পুরাকালে গ্রীস দেশে এক সম্প্রদায় দার্শনিক ছিলেন, তাঁহারা সুখই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। অনেকে এই মত অতিশয় নীচ বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রশস্তভাবে ইহার অর্থ গ্রহণ করিলে সে ঘৃণার ভাব থাকে না। 'সুখ' বলিলেই যে তাহার অর্থ নীচ ও অপবিত্র হইবে এমন কি? সংসারে সুখের জন্য কে না ব্যস্ত হইয়া থাকে? ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র সকলেই সুখের জন্য লালায়িত। কেহ বা শিক্ষা পাইয়া বিশুদ্ধ সুখের কামনা করে অপর কেহ বা অসভ্য অবস্থার নিকৃষ্ট সুখের জন্য লালায়িত হয়। কেহ বা দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, মানবের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, অপর কেহ বা আপনার স্বার্থ সাধন ও কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখ লাভের জন্য ব্যগ্র হয়। মহাত্মা বুদ্ধ সুখের জন্যই রাজ্য সম্পদ, স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আবার দুরাচার দুর্য্যোধনও সুখের জন্যই নানারূপ ছল ও অত্যাচার করিয়া পাণ্ডব-রাজ্য গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল! সুতরাং দেখা যায় যে, যদিও বিভিন্ন প্রকৃতির লোক বিভিন্ন প্রকারের সুখ কামনা করিয়া থাকে, কিন্তু সকলেই তাহা লাভ করিবার জন্য উৎসুক। এক কথায় বলিতে গেলে সুখ-ইচ্ছা মানব সমাজের স্থিতি ও উন্নতির মূলীভূত কারণ।

কিন্তু এই সুখ-ইচ্ছা কেমনে চরিতার্থ হইতে পারে? অথবা সুখ লাভ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত কিনা? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে আমা-

দিগকে একবার আপনার প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। আমরা যাহা সুখ মনে করিয়া তাহা পাইবার জন্য ব্যস্ত হই, যদি সৌভাগ্যক্রমে তাহা পাওয়া যায়, তবে কি আমরা সেই অবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকি? এ প্রশ্নে সকলেই এক উত্তর দিতে বাধ্য। অতীত ইতিহাস পাঠ করিয়া যে উত্তর পাই আমরাও তাহাই অনুভব করি। সে অবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট থাকি না। তখন তাহা সুখকর বোধ হয় না, আবার নূতন সুখের জন্য মন ধাবমান হয়। একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এখানে কেবল সাংসারিক সুখের কথাই বলা হইতেছে। আমরা সংসারের কোনরূপ বর্ত্তমান অবস্থাতেই সুখের অবস্থা বলিয়া মনে করি না। প্রথমতঃ যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হই কিন্তু তাহা লাভ করিলে আর সে সৌন্দর্য্য থাকে না। যাহা দূর হইতে স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও শীতল জল বলিয়া মনে করি——পান করিয়া দেখি তাহা লবণাক্ত ও কর্দ্দমময়। ইহা বুঝিতে পারিয়াই মহাজ্ঞানী মহাত্মারা ইহাকে মরীচিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা হইতে দূরে পলায়ন করিয়া দেব-জগতের পবিত্র ও বিশুদ্ধ সুখ লাভ দ্বারা সুখ ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সকলের ভাগ্যে সে সুখ সম্ভবপর নয়। সকলেই যদি সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করিবে তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা কেমনে সাধিত হইবে? সেই অভিপ্রায় সাধনের জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে একটী উপায় করিয়া দিয়াছেন। তাহার নাম সন্তোষ। ইহা অপেক্ষা আর প্রকৃষ্টতর উপায় নাই। এ উপায় অবলম্বন করিলে ভিখারীও রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ। যাহারা নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট তাহারা সাংসারিক শত [illegible] বিঘ্ন হইতে দূরে থাকিতে পারে। পার্থিব ধন [illegible] লাভে যে সকল অসংখ্য বিপদ আছে তাহা তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। যখন দুরাশাগ্রস্ত ও অবৈধ সুখান্বেষণকারী ব্যক্তিগণ বিপদের তুমুল ঝটিকায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, সংসার সমুদ্রে নিরুপায় হইয়া পড়ে, তখন পরিমিত অবস্থায় সন্তুষ্ট ব্যক্তি নিরাপদে কূলে বসিয়া, তাহাদের মূর্খতা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। কিন্তু সন্তোষের ভাণ করিয়া যেন অলসতার আশ্রয় গ্রহণ না করিতে হয়। পরমেশ্বর আমাদিগকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া, যদি কেবল জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি, তবে তাহা সন্তোষ বলিয়া উক্ত হইতে পারে না। নিজের যে ক্ষমতা আছে—যে গুণ জগদীশ্বর দিয়াছেন, তাহা দ্বারা নিজের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে সকলেরই কর্ত্তব্য। যদি ফল না পাও ক্ষুণ্ণ হইও না—নিরাশ হইও না। মনে রাখিও—মানুষের কর্ত্তব্য চেষ্টা করা; কিন্তু ফলাফলের জন্য চিন্তা করা নয়। ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার অসীম জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আপনার কর্ত্তব্য পালন কর এবং তিনি যাহা দেন তাহাই কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট চিত্তে মস্তক অবনত করিয়া গ্রহণ কর। ইহাই তোমার কর্ত্তব্য—ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।





নববর্ষ।

সুখ দুঃখ লয়ে
বিদায় গাহিয়ে
পুরাণ গিয়াছে চলে,
নবীন রবির
তরুণ কিরণ—
ফুটেছে উদয় অচলে।

অরুণ কিরণে
ফুটিতেছে প্রাণে
অতীত সুখের কথা,
আজ নববর্ষে—
জাগিতেছে প্রাণে
অতীত দুঃখের ব্যথা।

প্রফুল্ল কুসুম
ছিল যে আনন
পড়েছে কালিমা তায়,
অমল ধবল
ছিল যে হৃদয়
হয়েছে মলিন হায়!

শৈশবের স্নেহ—
শৈশবের প্রেম
শৈশবের কোমলতা,
শৈশবের হাসি,
—সবই ফুরায়েছে,
আছে শুধু হৃদে ব্যথা।

দিনে দিনে মাস
মাসে মাসে বর্ষ
কাল সাথে মিশিয়াছে,
বরষের সনে
বেড়েছে বয়স
সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে।

বরষের সনে
মিশেছে বরষ
সকলই চলিয়া গেছে,
অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা
অপূর্ণ বাসনা
শুধুই পড়িয়া আছে।

কত আশা মনে
করি প্রাণপণ—
সংকল্প সাধিব মোর,
কিন্তু একি হলো
আশা না পূরিল
লভিনু নিরাশা ঘোর।

কত যে আকাঙ্ক্ষা
উঠিল হৃদয়ে

উঠিয়া পাইল লয়,
সংকল্প আমার
কল্পনাই সার ;—
অশ্রুবারি ব'হে যায়।

আজ মুছে অশ্রু
উঠিয়া দাঁড়াই
ভুলে অতীতের কথা,
আবার আশায়
চাহি ভবিষ্যতে
ভুলে অতীতের ব্যথা।

নূতন আশায়
বাঁধিয়া হৃদয়
নূতন সংকল্প ধরি ;
এ নব বরষে
হৃদয়ের আশা
যেন গো পুরাতে পারি।

ইতর জন্তু ও মানুষ।

ইতর প্রাণীরা দিক্ নির্ণয় করিতে পারে ও বহু-কালের পূর্ব্বের বাসস্থান স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে। বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জন্তুর কথা ছাড়িয়া দি, পিপীলিকা মৌমাছি পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত আহারান্বেষণে গিয়া পথ হারা হয় না।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে কুকুরেরা কখন কখন ট্রেনে চড়ে এবং গন্তব্য ষ্টেশনে নামিয়া যায়। যদি কোন কারণে সে ষ্টেশনে নামিতে না পারে তবে তার পরের কোন ষ্টেশনে নামে এবং সেখানে অপেক্ষা করিয়া ফেরত ট্রেনে ফিরিয়া আইসে।

ইতর প্রাণীর বুদ্ধি বিচার ক্ষমতা (reasoning), সমবেদিতা ও অন্যান্য কোমলতর প্রবৃত্তি প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাইয়া, ইহারা যে মনুষ্য অপেক্ষা, নিতান্ত নিকৃষ্ট তাহা বলা যায় না। পণ্ডিতেরা বলেন যে বর্ব্বর মানুষ আর ইতর প্রাণীতে প্রভেদ অতি অল্প। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ইতর প্রাণীর ক্রমশঃ উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া শ্রেষ্ঠ জীব—মানুষ হইয়াছে। মানব সমাজের যেরূপ শ্রেণী বিভাগ আছে, যে সকল সামাজিক ও গার্হস্থ্য কর্ম্মের চলন আছে, পশুদের মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায়। পিপীলিকার পরিপাটি পরিচ্ছন্ন গৃহ, আহার্য্য সঞ্চয়ের ভাণ্ডার, আবর্জ্জনা ময়লা ফেলিবার ঘর, শয়ন গৃহ ও সমাধি স্থান সকলই আছে। মৌমাছি ও পিপীলিকাদের মধ্যে বিভিন্ন কার্য্যের জন্য ব্যবসায় অনুসারে শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট আছে। দণ্ড, পুরস্কার, পীড়িতের সেবা, বৃদ্ধের পেন্সন, দাস রক্ষা ও পশুপালন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

একটা পিপীলিকার শুঁড় কাটিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার সঙ্গীরা আসিয়া ক্ষত স্থানে মৃত্তিকা লেপন করিয়া চিকিৎসা করিয়াছে। পিপীলিকারা আহতদিগকে বহন করিয়া গৃহে লইয়া গিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করে। মৌমাছির রাণী পীড়িত হইলে দাসেরা সেবা করিয়া থাকে। একটা শালিক পীড়িত হইয়া আহারান্বেষণে অক্ষম হইলে আর একটা আসিয়া তাহার মুখে আহার তুলিয়া দিতে দেখা গিয়াছে। একটা কুকুরের পা কোন ক্রমে কাটিয়া যায়, তাহার বন্ধু আর একটি কুকুর তাহাকে কিংস্ কলেজ হাঁসপাতালে সঙ্গে করিয়া

লইয়া যায় ও সেখানকার লোকদিগের নিকট বন্ধুর চিকিৎসার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে থাকে। বন্ধুর পা বাঁধিয়া দিলে আনন্দ প্রকাশ করে।

সন্তান স্নেহ ও সমবেদিতা মনুষ্যের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবদের মধ্যে কোন অংশেই কম নাই। বানরেরা সন্তানের মুখ ধোয়াইয়া দেয় ও সন্তানের গায়ে মাছিটী পর্য্যন্ত বসিতে দেয় না। সন্তান শোকে কোন কোন বানরীকে, প্রভুর শোকে কুকুর বিড়ালকে, ও বন্ধু শোকে কোন কোন পাখীকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে দেখা গিয়াছে। বানর ও কুকুরেরা আহতের সেবা করে এবং কিছু খাইতে পাইলে আগে তাহাকে খাইতে দেয়। মানুষের মত বানরেরা সন্তানদিগকে শাসন করিবার জন্য প্রহার করে।

মৃত্যুর জ্ঞান অনেক প্রাণীর আছে। পারিসের পশ্বালয়ে একটী সিংহীর সহিত একটী কুকুরের অত্যন্ত বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। সিংহী মরিয়া গেলে কুকুরটী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। একটী পিপড়ার মৃত্যু হইলে অন্য পিপড়া তাহার কবর দেয়।

কাহারও মার মৃত্যু হইলে, অনাথ অপালিত শিশুকে অন্যেরা প্রতিপালন করে। এক জনার দুইটী হস্তিনী ছিল। তার একটীর ছানা ছিল। একটী হস্তিনী সেই ছানার প্রহরী ছিল, রক্ষণাবেক্ষণ করিত, আহার দিত ও এবং কাহাকেও তাহার নিকট আসিতে দিত না। এক দিন কোন ভদ্রলোক মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ হাতীটা বুঝি ছানাটার মা? মাহুত বলিল "না, ও টা ওর মাসী"। অর্থাৎ ছানাটার মা—তার তত খোঁজ খবর নেয় না, আর একটী হাস্তিনী আপন সঙ্গিনী সন্তানকে প্রতিপালন করে।

বিবরেরা এক সঙ্গে অনেকগুলি পরিবার বাস করে ইহাদের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। বায়ু সঞ্চালনের জন্য ইহারা কখন কখন বাস গৃহের চারিদিকে গড়খাই কাটিয়া থাকে। বাস স্থানের গুণাগুণ অনুসারে ইহারা বাস গৃহ বিভিন্নরূপে নির্ম্মাণ করে।

পশুদিগের পুরাতন ঘটনা স্মরণ সম্বন্ধে কুকুর ও হাতীর কত গল্প আছে। একজন একটী হাতীর সহিত তাহার শুঁড়ে ছুঁচ ফুটাইয়া তামাসা করিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে তাঁহাকে নিকটে পাইয়া হাতিটী তাহার সমস্ত শরীর পচা জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

কোন ভদ্রলোকের একটী বিড়ালী ছিল তার অনেক ছানা হইয়াছিল। সেই ছানাগুলি দোষ করিলে তিনি বিড়ালীর কান মলিয়া দিতেন। কাণমলা হইতে এড়াইবার জন্য তারপর হইতে ছানারা কোন দোষ করিলে নিজেই তাহাদের কাণ মলিয়া দিত ও অন্য শাস্তি দিত।

কুকুরদের অহঙ্কার আছে, মান অপমান জ্ঞান আছে। ভাল কুকুরকে একটু ভ্রূকুটী করিলে বা ধমক দিলে সমস্ত দিন দুঃখে ম্রিয়মাণ থাকে। আমাদের একটা কুকুর ছিল, রাস্তায় ছোঁড়ারা ঝগড়া মারামারি করিলে সে তাহাদের কাপড় ধরিয়া টানিয়া নিবৃত্ত করিত। দুইটী কুকুরে ঝগড়া হইলে এক জন ক্ষমা চাহিয়া ঝগড়া মিটায়। আবার কখন উপহার দিয়া পরস্পরের ঝগড়া মিটায়। ইহারা ছবি চিনিতে পারে। প্রভুর অনুপস্থিতি কালে প্রভুর ছবির পার্শ্বে কত কুকুরকে দিন কাটাইতে দেখা গিয়াছে। শিকারী গুলি করিয়া পাখী মারিলে, কুকুর আগে আহতটীকে আনে তারপর হতটীকে আনে। আবার দুইটী আহত থাকিলে একটীকে হত্যা করিয়া রাখিয়া আইসে।

মানুষ যাহারই কেন নিকৃষ্ট হউক না, পশু পক্ষী হইতে উন্নততর এবং উৎকৃষ্ট। তবে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মানুষে যতটা পার্থক্য দৃষ্ট হয় বর্ব্বর মানুষে ও বানরে ততটা দৃষ্ট হয় না। সভ্য ও বর্ব্বর মানুষে যে প্রভেদ, বর্ব্বর ও ইতর জন্তুর মধ্যে সেই প্রভেদ; মাত্রায় কম বেশী মাত্র, প্রকারগত নহে। অনেক দেশের অসভ্য জাতিরা আগুনের ব্যবহার জানে না। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যেরা কিরূপে আগুন রাখিতে হয় তাহা জানে না, একবার নিবিয়া গেলে আবার কি করিয়া আগুন করিতে হয় তাহাও জানে না। তাসমানিয়া ও অন্যান্য স্থানের অসভ্যেরা কৃষিকার্য্য জানে না। ফুয়েজি স্ত্রীলোক ও বালকেরা কুকুরের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া সীল মাছের কাচা মাংস ভক্ষণ করে। তুরস্কের মোগলেরা ও তিব্বতবাসী অনেক জাতি কাঁচা মাংস খাইয়া থাকে। আবিসিনিয়ার লোকেরা জীবন্ত গরুর গা হইতে যতটুকু আবশ্যক ততটুকু মাংস কাটিয়া লইয়া কাঁচা খায়।

আমাদের দেশে যেমন ছাগল দিয়া বাঘ ধরে, আফ্রিকার কোন কোন অসভ্য জাতি তেমন সন্তান খাইতে দিয়া সিংহ ধরে।

আমেরিকা ও কামস্কট্‌কার এস্কুইমো জাতি পীড়িত বা দুর্ব্বল শিশুকে মারিয়া ফেলে। জীবন্ত সন্তানকে মার মৃত দেহের সহিত কবর দেয়। কামস্কট্‌কার লোকেরা পিতা মাতাকে বধ করিয়া কুকুরদিগকে খাইতে দেয়। অন্য কোন খাবার না পাইলে ফুয়েজি জাতি বৃদ্ধাদিগকে বধ করিয়া তাহাদের মাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। পিতা মাতা অকর্ম্মণ্য হইতে না হইতেই ফিজিবাসীরা তাহাদিগকে হত্যা করে। ইহারা জ্ঞাতি, বন্ধু সকলকে ডাকিয়া উৎসব করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ফাঁসী দেয়।

সঙ্গীতকারী বালুকা।

বহু দিন পূর্ব্বে আমরা "অতলস্পর্শ" নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সে সম্বন্ধে নূতন কিছু আবিষ্কৃত হইলে পাঠক পাঠিকাদিগকে জানাইব লিখিয়াছিলাম। এসিয়েটীক সোসাইটী এ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তদতিরিক্ত বিশেষ নূতন কিছু এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা হউক সম্প্রতি এসিয়েটীক সোসাইটীর এক সভায় এই অতলস্পর্শ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল; সেই উপলক্ষে আর একটী আশ্চর্য্য বিষয়ের আলোচনা হয়। মানুষেরাই গান করিয়া থাকে; পক্ষীদের মধ্যেও কোন কোন জাতি গান করিতে পারে। কিন্তু একপ্রকার বালি আছে তাহারাও গান করিয়া থাকে। এসিয়েটীক সোসাইটীর কয়েকজন সভ্য এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক বিজ্ঞান সভার, ডাক্তার জুলিয়েন এবং অধ্যাপক বোল্টন বহুদিন পর্য্যন্ত এই সঙ্গীতকারী বালি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ইহার সম্বন্ধে অনেক অবগত হইয়াছেন।

আরবের মরুভূমিতে প্রথম এই সঙ্গীতকারী বালি আবিষ্কৃত হয়। মরুভূমিতে এবং সমুদ্রের উপকূলে এই বালি দৃষ্ট হইয়া থাকে। নাবিকগণ এবং মরুভূমি-চারীগণ কোথা হইতে এ সঙ্গীত উৎপন্ন হইতেছে প্রথমতঃ তাহা স্থির করিতে পারিত না। অনন্ত বিস্তৃত মরুভূমি মধ্যে এবং জনপ্রাণী শূন্য সমুদ্র উপকূলে কোথা হইতে এই মধুর সঙ্গীত আইসে, তাহার কিছুই কারণ বুঝিতে

পারিত না। ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিল যে, এই আশ্চর্য্য সঙ্গীত বালুকারাশি হইতে উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু কোন বালুকারাশি হইতে সঙ্গীত উৎপন্ন হয় তাহার কারণ তখন পর্য্যন্ত কেহই কিছু স্থির করিতে পারে নাই।

নিউ-ইয়র্ক বিজ্ঞান সভার, ডাক্তার জুলিয়েন এবং অধ্যাপক বোল্টন এই বিষয় বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন। যে যে স্থানে এই সঙ্গীতকারী বালি আছে, সেই সেই স্থান হইতে তাঁহারা ইহার নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই বালুকণাগুলি অতিশয় পরিষ্কার এবং নির্ম্মল; ইহাতে ধূলা বা অন্য কিছুই মিশ্রিত নাই, আকারে ক্ষুদ্র এবং ওজনেও খুব হাল্কা। তাঁহারা বলেন যে, এই বালুকণাগুলি যখন বৃষ্টি বা জোয়ারের সময় জল বৃদ্ধি হইলে ভিজিয়া যায়, এবং সেই ভিজা বালুকণাগুলি হইতে যখন বাষ্প উঠিতে থাকে, তখন বালুকণাগুলির উপরের বায়ু ঘনীভূত হইয়া, প্রতি বালুকণার উপর এক একটী আবরণ নির্ম্মাণ করে; এই আবরণটী রবারের ন্যায় স্থিতি-স্থাপক। এবং এই স্থিতি-স্থাপকতার জন্য বালুকণাগুলি অতি সামান্য আঘাতে বা স্পর্শে কাঁপিতে থাকে। এবং এই কম্পনেই এই অদ্ভুত সঙ্গীতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধূলা বা অন্য কোন পদার্থ বালুকণার সহিত মিশ্রিত থাকিলে, উপরে লিখিত বায়ুর আবরণ নির্ম্মিত হইতে পারে না, এই জন্যই বোধ হয় আমরা আমাদের এদেশে সঙ্গীতকারী বালি দেখিতে পাই না। পরীক্ষাদ্বারা আরও দেখা গিয়াছে যে, এই বালুকণা অগ্নির উত্তাপে দিলে, বা ঘর্ষণ করিলে ইহাদের মৃত্যু হয়; আর তখন ইহারা গান করিতে পারে না। কিন্তু যত্নের সহিত রক্ষা করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ইহারা সঙ্গীত দ্বারা মানুষকে মুগ্ধ করে। এই অদ্ভুত বালুকণা সম্বন্ধে এখনও জানিতে অনেক বাকী আছে, এখনও অনেক অনুসন্ধান হইতেছে। নূতন কিছু প্রকাশিত হইলে আবার জানাইব।



জেব্রা।

কি সুন্দর জন্তু! এ জন্তুর নাম কি, কোথায় পাওয়া যায়, কি খায় তোমরা জান? তোমরা বোধ হয় জেব্রার (Zebra) নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবে, অপর পৃষ্ঠায় যে দুইটী চিত্র দেখিতেছ উহা ঐ জেব্রার চিত্র। আফ্রিকা দেশে এই জন্তু পাওয়া যায়। আফ্রিকা কিন্তু খুব বড় দেশ, তাহার সর্ব্বত্রেই যে জেব্রা পাওয়া যায়, তা নয়। আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে অনেক ছোট বড় পাহাড় আছে, ইহারা ঐ সকল পাহাড়ে ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়ায়, ঐ সকল পাহাড়ে নল ঘাসের মত লম্বা লম্বা এক রকম ঘাস জন্মে, সেই ঘাসের ঘন জঙ্গলের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ঘোড়ার মত ইহারা দৌড়াইতে বড় পটু এবং এই জন্য সহজে ধরা যায় না। ঘোড়া অতি সহজে পোষ মানে এবং মানুষের কত কাজে লাগে, কিন্তু জেব্রাকে পোষ মানান বড় কঠিন।

এই চিত্র দেখিয়া জেব্রা কোন জন্তুর মত বোধ হয়। ঘোড়ার মত নয় কি? বস্তুতঃ ঘোড়ার



সঙ্গে ইহাদের বিলক্ষণ নিকট সম্বন্ধ আছে, এক পরিবার বলিলেই হয়। ঘোড়া কিন্তু যত বড় হয় জেব্রা তত বড় হয় না। ইহাদের অঙ্গের ঐ কাল ডোরা ডোরা সুদৃশ্য দাগগুলি যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা দেখিতে ঠিক একটী বড় গর্দ্দভের মত দেখায়। তোমরা সচরাচর যে ধোপার গাধা দেখিয়া থাক এ কিন্তু সে গাধা নয়। ভারতবর্ষের সিন্ধু এবং কচ্ছ প্রদেশে, আরব দেশে এবং আফ্রিকাতে এক প্রকার বন্য গাধা পাওয়া যায় এ সেই গাধা।

দক্ষিণ আফ্রিকার অসভ্য লোকেরা মাংস আহারের নিমিত্ত অনেক সময়ে জেব্রা বধ করিয়া থাকে। ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশের মৃগয়া-প্রিয় লোকেরাও ইহাদিগকে সময়ে সময়ে বধ করিয়া থাকে। অসভ্য এবং সুসভ্য লোকের উৎপাতে জেব্রার বংশ প্রায় উৎসন্ন হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে যত জেব্রা পাওয়া যাইত এখন আর তা যায় না। ঘাস, পাতা ইত্যাদি আহার করিয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা কলিকাতায় থাক তাহারা আলিপুর পশুশালায় গিয়া দেখিয়া আসিতে পার জেব্রা কিরূপ জন্তু।

সুরা এবং বঙ্গনারী।

রাম বাবুর বাসস্থান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন এক ভদ্র পল্লিতে। রাম বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক জন বিখ্যাত চিকিৎসক। শৈশবে ইহাঁদের পিতৃ-বিয়োগ হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং নিজের সাধ্যানুসারে লেখা পড়া শিখাইতেও ত্রুটি করেন নাই। রাম বাবুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধা শক্তি ছিল; তিনি কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ হইয়া একজন খ্যাতনামা ডাক্তার হইলেন। চিকিৎসকের যে যে গুণ থাকা প্রয়োজন তাঁহার তাহা সমুদয়ই ছিল। কিন্তু হায়! যৌবনে তাঁহার হৃদয়ে একটি কীট প্রবেশ করিয়া, তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির মূল একটি একটি করিয়া ছিন্ন করিতে লাগিল। তিনি কুসঙ্গে পড়িয়া মদ্যপান করিতে শিখিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে পাঠ্যাবস্থায়ই বিবাহ দিয়াছিলেন। রাম বাবু স্ত্রীকে বিশেষ ভাল বাসিতেন কিন্তু সুরাদেবীর এমনই মোহিনী শক্তি যে এক বৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার স্ত্রীকে চক্ষের শূল করিয়া তুলিল। দিন নাই রাত্র নাই, অষ্টপ্রহর নেশায় বিভোর হইয়া সেই সরলা কামিনীর প্রতি অতি নির্দ্দয় পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার পত্নী কত চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই রাম বাবুর স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। বরং হিতে বিপরীত হইল, রাম বাবু অকৃতজ্ঞের ন্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পৃথক হইলেন।

রাম বাবু পৃথক হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী নীরদার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নীরদার এখন দুইটি পুত্র এবং একটি শিশু কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বিবাহ হইয়াছে। দুইটীই কলিকাতায় থাকিয়া পাঠাভ্যাস করে। কিন্তু হতভাগিনীর কষ্টের লাঘব না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সময় নাই অসময় নাই সর্ব্বদা স্বামীর সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে হইত। সাধ্বী নীরদা কিন্তু এক দিনের তরে স্বামী-নিন্দা মুখ দিয়া বাহির করেন নাই। নিজের মনঃকষ্ট নিজেই মনে চাপিয়া রাখিয়াছেন। রাম বাবু এখন স্ত্রীকে প্রহার করিতে শিখিয়াছেন। নিশি রাত্রে নেশায় ঢুলু ঢুলু হইয়া বাড়ী আসেন। যদি দেখেন খাবার জিনিস ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলেই স্ত্রীকে প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কোলের শিশুটী ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। নীরদা অনন্যোপায় হইয়া শিশুটীকে লইয়া কোন দিন বা অপর ঘরে, কোন দিন বা পার্শ্ববর্ত্তী কোন গৃহস্থের ঘরে, নিশি যাপন করেন। কিন্তু সেই পাষণ্ড রাম বাবু তখনই সেই গৃহস্থের বাটী যাইয়া দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করেন, তাহাদের ঘর দরজা ভাঙ্গিতে উদ্যত হন এবং অশ্লীল তিরস্কার করিতে থাকেন। তাই নীরদাকে আর কেহ সাহস করিয়া শেষে স্থান দিত না। নীরদা বঙ্গনারী সতী সাধ্বী নিজের শোক নিজে লুকাইত। কোথায় আজ পুত্র, পুত্রবধূ লইয়া সুখী হইবেন, না আজ সজল নয়নে, বিষাদ অন্তরে, মলিন মুখে গৃহ কার্য্য করিতে নিযুক্ত।

রাম বাবু ক্রমে তাঁহার ব্যবসায়ের ক্ষতি করিলেন তাঁহাকে কেহ আর চিকিৎসার জন্য ডাকে না। নিজের হাতে যাহা কিছু ছিল সমুদয়ই সুরাদেবীর উপাসনায় ব্যয় হইয়াছে। নীরদার অঙ্গে যে সমুদয় গহনা ছিল তাহাও বিক্রয় হইয়াছে।

আজ রাম বাবু দুপ্রহর রাত্রে বাটী ফিরিয়া-

হেন। নীরদা শিশুটিকে লইয়া একাকিনী গৃহে ছিলেন; স্বামীর আগমনে ব্যস্ত হইয়া দরজা খুলিয়া দীপ জালিলেন। স্বামী গৃহে প্রবেশ করিয়া নীরদার চুল ধরিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার বানারসী সাড়ীখানা না দিলে ছাড়িবেন না বলিয়া জেদ ধরিলেন। নীরদার মাতৃদত্ত ঐ এক খানি মাত্র সাড়ী সম্বল ছিল, তাই পতির অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাম বাবু স্ত্রীকে প্রহার করিয়াও যখন সাড়ী পাইলেন না, তখন শিশুটিকে ধরিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। মার হৃদয়ে আর সহ্য হইল না। শিশুটিকে কোলে লইয়া অবলা রমনী সেই অন্ধকার নিশীতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। যে ঘরে আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করেন, সেই গৃহস্থই রাম বাবুর কথা মনে করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। নীরদা আশ্রয় পাইলেন না। হা জগদীশ! বলিয়া বসিয়া পড়িলেন। শিশুটি কান্দিতে লাগিল, নীরদার ভয় হইল পাছে পাষণ্ড স্বামী তাঁহাদের অনুসরণ করে। আবার চলিতে লাগিলেন, কিছু দূরে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অনেক মিনতির পর আশ্রয় পাইলেন।

রাত্র প্রভাত হইলে নীরদা বাটী আসিলেন; বাটী আসিয়া দেখিলেন তাঁহার বাক্স ভাঙ্গিয়া স্বামী বানারসী সাড়ী লইয়া গিয়াছেন; অন্যান্য কাপড়াদি ও সমুদয় জিনিস, অগ্নিতে ভস্ম করিয়া, ভস্ম রাশি স্তুপাকার করিয়া রাখিয়াছে। নীরদার প্রাণে আর সহিল না। শিশুটিকে এক গৃহস্থের পুত্রবধূর নিকট কিছু খাওয়াইবার জন্য রাখিয়া আসিলেন। দুই চারি পয়সা যাহার নিকট যাহা ধার ছিল তাহা শোধ করিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া সমুদয় কপাট বন্ধ করিলেন। হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঊর্দ্ধ নয়নে সেই জগৎপাতার নিকট পরকালের জন্য কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করিলেন। তারপর গলায় দড়ি পরাইলেন। যখন দড়ি দিয়া ঝাঁপ দিবেন তখন স্বামীর কথা মনে পড়িল, স্বামীর সেই পূর্ব্বের দেব চরিত্রের কথা মনে পড়িল। কিন্তু তখন অসহনীয় কষ্ট, দারুণ যন্ত্রণা তাঁহাকে আর ফিরাইতে পারিল না। নীরদা পুত্র কন্যাদিগকে অনাথ করিয়া এ সংসার পরিত্যাগ করিলেন।

উপরে যে ঘটনা বিবৃত হইল, তাহা সত্য ঘটনা। সুরাপানে দেশের সর্ব্বনাশ হইল। বঙ্গনারীর কষ্টের মূল সুরা। রাম বাবু এখনও জীবিত। তাঁহার স্বভাবের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি এখনও সুরার দাস।



সারা মার্টিন।

মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের আজীবন চেষ্টা, এবং নিউগেট প্রভৃতি কারাগারের সংস্কারের জন্য এলিজাবেথ ফ্রাই ও তাঁহার সহকারীগণের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সত্বেও, অন্যান্য স্থানের কারাগারগুলির দুর্দ্দশা কিছুমাত্র দূর হয় নাই। বিশেষতঃ ইয়ারমাউথের কারাগারের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় ছিল। সে সময়ের কারাগারের দুর্দশার কথা এলিজাবেথ ফ্রাইএর জীবনীতে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ

নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এই বলিতে পারা যায় যে, অপরাধীদিগকে শাস্তি দেওয়াই কেবল তখন কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল। অপরাধীদিগকে সে সময় পশুর ন্যায় দেখা হইত। একবার যে কারাগারে প্রবেশ করিত, আর তাহার সৎপথে ফিরিবার আশা থাকিত না। কারাগারের কুসংসর্গে চরিত্র অধিকতর বিকৃত ও কলুষিত হইয়া যাইত।

আমরা গত পূর্ব্ব সংখ্যায় লিখিয়াছি যে, কারাগারে প্রবেশ করিয়া সারা মার্টিন কারাবাসী ও কারাবাসিনীদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার মানসে, প্রথমতঃ তাহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহাকে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহারও একটু উল্লেখ করিয়াছি। সমস্ত দিন কার্য্যের পর যে অবসরটুকু পাইতেন, সেই অবসর সময়ে এই হতভাগ্য হতভাগিনীদিগকে শিক্ষা ও ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন। এতদ্ভিন্ন সপ্তাহের মধ্যে এক দিন সম্পূর্ণ ইহাদিগের জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে ক্রমে তাঁহার সেলাইএর কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। কিন্তু পরহিত ব্রতে যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, নিজের স্বার্থের—নিজের সুখের দিকে তাঁহার চাহিবার অবসর কোথায়?

এই সময়ে সারা মার্টিনের পিতামহীর মৃত্যু হয়। পিতামহী তাঁহাকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে সারা মার্টিন অতিশয় শোক পাইলেন। কিন্তু তিনি সে দারুণ শোক ধীরভাবে সহ্য করিলেন। পিতামহীর মৃত্যুর পর, সারা মার্টিন কেইষ্টার হইতে ইয়ারমাউথে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এবং এই সময় হইতে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত পরহিত সাধনে ব্রতী হইলেন।

এদিকে তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে লাগিল। কিয়ৎদিন পরে তিনি সেলাইএর কার্য্য একবারেই পরিত্যাগ করিলেন। জীবিকার জন্য অবশেষে তাঁহার পিতামহীর যে সামান্য গচ্ছিত সম্পত্তি ছিল, কেবল মাত্র তাহার আয়ের উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইল। সেই সামান্য আয়ে অতিশয় ক্লেশে দিনপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ক্লেশের জন্য তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও নিজ ব্রত হইতে বিচলিত হন নাই।

কারাধ্যক্ষ এবং তাঁহার স্ত্রী এই পরোপকারিণী মহিলার অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও যত্নের সুফল দেখিয়া, তাঁহার কার্য্যে ক্রমে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন উশৃঙ্খল প্রকৃতি কারাবাসীগণ ইহাঁর উপদেশে ধীর শান্ত হইতেছে। যাহারা অসৎ তাহারা সৎপথে চলিতে চেষ্টা করিতেছে। কারাগারের সেই ভয়ানক বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি আসিয়াছে। তাঁহার কার্য্যের সুফল দেখিয়া বাহিরের লোকের দৃষ্টিও ক্রমে সেই দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। একটী সদাশয়া মহিলা এবং দুইটী সহৃদয় ভদ্রলোক তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সারা মার্টিন প্রথমতঃ সেই সকল সাহায্য লইতে অস্বীকৃত হইলেন। অবশেষে সেই সকল অর্থ সাহায্য, নিজে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া কেবল মাত্র কারাবাসী ও কারাবাসিনীদের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের জন্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেলাইএর কার্য্য তিনি ইতি পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতামহীর সামান্য গচ্ছিত সম্পত্তির যৎসামান্য আয়ে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতেন। সেলাইএর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অবধি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কারাবাসী কারাবাসিনীদের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের জন্য পরিশ্রম করিতে

লাগিলেন। এবং সেই সদাশয়া মহিলা এবং সহৃদয় ভদ্রলোক দুটীকে অর্থ সাহায্য দ্বারা সারা মার্টিন নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিন বৎসর কাল সারা মার্টিন কারাবাসী ও কারাবাসিনীদিগকে শিক্ষা দান এবং উপদেশ প্রভৃতি দ্বারা চরিত্র সংশোধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিন বৎসর অতিবাহিত হইলে, তাঁহার আর একদিকে দৃষ্টি পড়িল। সারা মার্টিন দেখিলেন অলসতাই হতভাগা হতভাগিনীদের অধোগতির একটী প্রধান কারণ। তিনি দেখিলেন, কোন কাজ না থাকাতে, ইহারা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকে; সুতরাং অসৎ চিন্তা—অসৎ কার্য্যেই ইহাদের সময় অতিবাহিত হয়। তিনি বুঝিলেন যে, যদি ইহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখা যায়, তবে অনেক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। সুতরাং সারা মার্টিন এই সময় সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮২৩ সনে এই কার্য্য প্রথম আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ স্ত্রী অপরাধিনীদিগের দ্বারা কাজ করাইতে আরম্ভ করিলেন এবং পরে পুরুষদিগের দ্বারাও আরম্ভ করাইলেন। সারা মার্টিন নিজে বেশ সেলাইএর কাজ জানিতেন। তিনি স্ত্রী অপরাধিনীদিগকে সেলাইএর কাজ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। হতভাগিনীগণ অল্পকাল মধ্যে বালক বালিকাদিগের পোষাক এবং জামা কোট প্রভৃতি অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি তৈয়ার করিতে লাগিল। পুরুষেরা টুপি, হাড়ের চামচ এবং জামা প্রভৃতি তৈয়ার করিতে লাগিল। সারা মার্টিন এইগুলি বিক্রয় করিতেন, এবং ইহাতে যাহা লাভ হইত, তাহার কতক এই সকল হতভাগা হতভাগিনীদিগের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করিতেন; এবং কতক সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। হতভাগ্য হতভাগিনীগণ যখন কারামুক্ত হইয়া যাইত, তখন তাহাদিগকে ঐ সঞ্চিত অর্থ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিতেন। অনেকে সেই অর্থকে মূলধন করিয়া তাহা দ্বারা সেলাএর ব্যবসায় বা অন্য কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিত। এই দুঃখিনী পরোপকারিণী মহিলা ইহাতেই নিশ্চিন্ত হন নাই। হতভাগা হতভাগিনীগণ যখন কারামুক্ত হইত. তখন তাহারা যাহাতে সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। কারামুক্ত হইয়া গেলেও তিনি রীতিমত তাহাদিগের সম্বাদ লইতেন; অনেককে কাজ কর্ম্ম করিয়া দিতেন, অনাথ অসহায়দিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। একটী সহায় সম্বল হীনা দরিদ্রা রমণীর চেষ্টা ও যত্নে কি অসামান্য হিত সাধিত হইয়াছিল ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। হতভাগা হতভাগিনীগণ যত দিন কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে, সারা মার্টিন কেবল তত দিনই তাহাদের দুঃখে দুঃখিত, ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছেন তাহা নহে। প্রথমতঃ তিনি তাহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিয়াছেন; তারপর তাহাদিগকে নীতি ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাদিগের চরিত্র যাহাতে সংশোধিত হয়, তাহার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। তারপর কারাগারে অলসভাবে বৃথা সময় নষ্ট না করে, এই জন্য তাহাদিগকে নানা প্রকার কার্য্য শিক্ষা দিয়া তাহাতে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। পরিশেষে যখন হতভাগা হতভাগিনীগণ কারামুক্তি লাভ করিয়াছে, তখন তাহারা সৎপথে থাকিয়া যাহাতে জীবন যাপন করিতে পারে তন্নিমিত্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া দিয়াছেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে কারাগারের দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে, অসৎ সৎপথ অবলম্বন করিতে পারে, এই সকল বিষয় লইয়া যখন দেশের পদস্থ ও প্রধান

প্রধান ব্যক্তিরা তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন; এক-জন সভায় তীন সম্বল হীন অবলা রমণী ধীরে ধীরে সেই কার্য্য সাধন করিতেছিলেন। সে সময়ের কারাগারের অবস্থা যখন আমরা চিন্তা করি, এবং কি প্রকার অসৎ ও দারুণ বিকৃত চরিত্র পুরুষ ও রমণী লইয়া তাঁহার কার্য্য করিতে হইয়াছে যখন ভাবি, তখন সারা মার্টিনের মহত্ত্ব বুঝিতে পারি। প্রতিদিন ছয় সাত ঘণ্টা কারাগারে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেন। এই পরোপকারিণী মহিলার অক্লান্ত চেষ্টা এবং ঐকান্তিক যত্নে ভীষণ নরক সদৃশ্য কারাগার অতি রমণীয় দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। এমন দেখা গিয়াছে যে, এক একজন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, পাপ কার্য্যেই যাহার জীবন অতি-বাহিত হইয়াছে, সারা মার্টিনের উপদেশ ও চরিত্র গুণে সে বৃদ্ধেরও মতি ফিরিয়াছে। শুধু তাহাই নহে সেই বৃদ্ধ বয়সে লেখা পড়া পর্য্যন্ত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতিশয় দুর্দ্দান্ত অসৎ যাহারা, তাহারাও এই মহিলার উপদেশ ও শিক্ষা-গুণে ধীর, শান্ত ও সচ্চরিত্র হইয়া গিয়াছে। ইনি কাহাকেও শাস্তি দিতেন না—শাস্তির ভয়ও দেখাইতেন না। অথচ ইহাঁর চরিত্রের এমনি এক শক্তি ছিল যে, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইত, সকলেই ইহাঁর কথা মত—উপদেশ মত কার্য্য করিত। কোন হতভাগা হতভাগিনী নিজ পাপ স্মরণ করিয়া যখন অনুতাপ করিত, তখন তাহাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া সারা মার্টিন চক্ষের জল ফেলিতেন। তাঁহার কোমল পর-দুঃখকাতর হৃদয়, তাহাদের দুঃখে বিগলিত হইত। তিনি তাহাদিগকে শোকের সময় সান্ত্বনা দিতেন, দুঃখের অশ্রু নিজ অঞ্চলে মুছাইয়া দিতেন; তাহাদের চক্ষের জলে নিজ চক্ষু জল মিশাইতেন। তাই হতভাগা হতভাগিনীগণ তাঁহার অতিশয় বশীভূত হইয়াছিল। তাই তাহাদিগের পাপের কথা—হৃদয়ের ব্যথা, হৃদয় খুলিয়া তাঁহাকে বলিত; এবং তাঁহার উপদেশ ও সান্ত্বনায় সান্ত্বনা পাইত।

কারাগারে প্রতিদিন ছয় সাত ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, সারা মার্টিন যে অবসর পাইতেন, সে অবসর সময়টুকুও নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতেন না। দরিদ্র পুরুষ রমণী এবং বালক-দিগের জন্ত যে কারখানা (Work house) আছে, তিনি রীতিমত সেই কারখানায় যাইয়া, সেই সকল দরিদ্র পুরুষ রমণী ও বালক বালিকাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতেন, এবং নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতেন। শিক্ষা ও উপদেশ দান শেষ হইলে, প্রত্যেকের সংবাদ লইতেন; যাহার যে অভাব তাহা শুনিতেন এবং পূরণ করিতেন। তাঁহার সান্ত্বনা, উপদেশ এবং অমায়িক ব্যবহারে সকলেই তৃপ্ত হইত।

সন্ধ্যার পরও এই সদাশয়া মহিলা নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে থাকিতেন না। সন্ধ্যার পর প্রায়ই রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়া বেড়া-ইতেন। তিনি যে রোগীর পার্শ্বে যাইতেন, সে যেন সমস্ত রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইত। রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, আসন্ন মৃত্যু যাহার, তাহাকে ধর্ম্ম-কথা শুনাইতেন।

এইরূপে পরহিত-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া আদর্শ রমনী সারা মার্টিন জীবন অতিবাহিত করি-তেছেন, এমন সময়ে ধীরে ধীরে তাঁহার শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। কারা সংস্কার কার্য্যে চব্বিশ বৎসরের কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু নিজ শরীরের প্রতি তিনি

একবারও দৃষ্টি করেন নাই। যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কিসে তাহার উদ্‌যাপন হইবে, দিবা রাত্র সেই চিন্তা এবং প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। নিজে অতি সামান্য আহার ও সামান্য পরিচ্ছদেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। হতভাগ্য কারাবাসীগণ যে প্রকার আহার করিত, তিনি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আহার করিতেন না। এতদ্ভিন্ন গৃহের সমস্ত কার্য্য এবং রন্ধন প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার নিজের করিতে হইত, কারণ তাঁহার এ প্রকার কার্য্য করিয়া দেয় এমন ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্র কষ্ট অনুভব করিতেন না। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই সন্তোষে পূর্ণ থাকিত। পরহিত-ব্রতে তিনি যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র সুখ ছিল এবং ইহাতেই তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন। পরহিতই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। অন্য কোন বিষয় তিনি চিন্তা করিতেন না—অন্য কোন চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইত না। আত্ম-সুখ তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করেন নাই। আপনাকে তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। এবং আপনাকে ভুলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এত বড় মহৎ কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে চির-সন্তোষ চির-শান্তি বিরাজ করিত। সমস্ত দিবসের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দৈনিক ঘটনাবলী লিখিয়া রাখিতেন।

যাহা হউক এই অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ১৮৪৩ সনে এই সদাশয়া মহিলা অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পাঁচ মাস পর্য্যন্ত তিনি দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ রোগ যন্ত্রণা তিনি অতিশয় ধীর ও প্রশান্ত ভাবে সহ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোগশীর্ণ মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যাইত। সেই রোগশীর্ণ মুখ যেন সদাই প্রফুল্ল। তিনি এই রোগ শয্যায় থাকিয়া তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট এবং দারুণ রোগ যন্ত্রণায়, তাঁহার হৃদয় তিলমাত্র বিচলিত হয় নাই। রোগ শোকের মধ্যে তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, এবং একাগ্রতার সহিত কেবল শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে পাঁচ মাসের দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণা ভোগের পর ১৮৪৩ সনে ২রা নবেম্বর ৫২ বৎসর বয়সের সময় রমণী-রত্ন সারা মার্টিনের মৃত্যু হয়। আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এই পরহিত-ব্রতপরায়ণা মহিলা ইহ জগত হইতে চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সংসারের কঠিনতা, স্বার্থপরতা ও দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে কত পথিককে আলোক প্রদান করিতেছে।

স্থানাভাব বশতঃ এবারে ধাঁধা এবং পত্র-প্রেরকদিগের প্রতি বক্তব্য দেওয়া গেল না। আগামী বারে দেওয়া যাইবে।





ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০।



বিবিধ।

বোম্বাই এর স্যার দিনশ মানকজি পেটীট একজন বিখ্যাত দানশীল ব্যক্তি। মহারাণীর পৌত্র বোম্বাই গিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মানার্থ এবং সেই ঘটনা স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য, স্যার দিনশ মানকজী পেটীট বোম্বাই সহরে একটী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আমাদের কলিকাতায়ও প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের আগমন উপলক্ষে, অনেক টাকা উঠিয়াছিল। তাহার অধিকাংশ টাকা আমোদ প্রমোদ, নাচ তামাসায় ব্যয় হইয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা কি হইবে, এই তর্কই চলিতেছে। বাঙ্গালীর অপেক্ষা বোম্বাইবাসীরা অনেক কাজের লোক।

* *
*

বাণিজ্য ব্যবসায়েতেও বোম্বাইবাসীগণ বাঙ্গালীদের অপেক্ষা প্রধান। আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে একটীও কাপড়ের কল নাই; বিলাত হইতে কাপড় আসিবে তবে আমরা পরিব। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে দেশীয়দিগের স্থাপিত অনেকগুলি কাপড়ের কল আছে। কলিকাতার নিকটে বাউড়িয়া ও ঘুসুড়িতে দুইটী সূতার কল আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কাপড় বোনা হয় না; কেবল সূতা হয়। বোম্বাইবাসীগণ কাপড়ের কল করিয়া খুব লাভ করিতেছেন।

* *
*

একজন জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক চিনি জমাইয়া শ্বেত পাথর প্রস্তুত করিয়াছেন। কল দ্বারা চিনি এমন জমাট বাঁধাইয়াছেন যে, তাহা পাথরের মত কঠিন এবং দেখিতেও ঠিক শ্বেত পাথরের মত হইয়াছে।

* *
*

বিজ্ঞান বলে কত কি আশ্চর্য্য ঘটনা হইতেছে। কাগজ দ্বারা ঘর বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে, রেলের চাকা নির্ম্মিত হইতেছে। এ ছাড়া অতি সূক্ষ্ম কাজও হইতেছে; কাগজ দ্বারা ঘড়ীর চাকা এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র সকলও নির্ম্মিত হইতেছে। আমরা দেখিয়া শুনিয়া কেবল অবাক হইতেছি। আমাদের দেশের লোকের এ সকল দিকে দৃষ্টিই নাই।

* *
*

কলিকাতায় কালা ও বোবাদিগের জন্য একটী আশ্রম খুলিবার কথা শুনা যাইতেছে। এ দেশে—কেবল বোম্বাই সহরে, কালা ও বোবাদিগের জন্য একটী মাত্র আশ্রম আছে। যাহারা জন্ম হইতে বধির এবং কথা কহিতে পারে না, তাহারা এই স্থানে আশ্রয় পাইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, এ প্রকার শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা করে; এবং পরে তাহা দ্বারা জীবন যাপন করিয়া থাকে, অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয় না। আমরা জানি এক জন বোবা অতি উৎকৃষ্ট বাজাইতে পারে; এবং এক জন কালা ও বোবা অতি উৎকৃষ্ট চিত্র করিতে শিখিয়াছে।

* *
*

আফ্রিকার পশ্চিমাংশে এক প্রকার বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মত বড় এবং দীর্ঘজীবী বৃক্ষ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এডান্‌সন্‌ নামক এক জন ফরাসী সাহেব এই বৃক্ষ আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন যে, এই বৃক্ষ পাঁচ হাজার বৎসরেরও অধিক বাঁচে। একবার ভাবিয়া দেখ পাঁচ হাজার বৎসরে, কত কত রাজ্যের উৎপত্তি, কত রাজ্যের লয় হইয়া যায়। এই বৃক্ষের আকার অতি প্রকাণ্ড। গুঁড়ি শিকড় হইতে ৯।১০ হাত উচ্চ হইয়া উঠে, এবং ইহার বেড় প্রায় ৫০।৫২ হাত হইয়া থাকে। ইহার নীচের শাখাগুলি চল্লিশ হাতেরও অধিক বিস্তৃত হয়। ইহাতে এই শাখাগুলির অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিয়া গুঁড়িটী ঢাকিয়া রাখে, তাই এক একটী বৃক্ষকে এক একটী প্রকাণ্ড বন বলিয়া মনে হয়। আফ্রিকার নিগ্রো জাতিরা এই প্রকাণ্ড বৃক্ষের গুঁড়ী খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে গৃহ প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে নিরাপদে বাস করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের এমন গুণ আছে যে, মৃত দেহ ইহাতে বান্ধিয়া রাখিলে তাহা কখনও পচে না, শুকাইয়া শক্ত হইয়া থাকে। সে দেশে অপরাধীদিগের মৃত দেহ দগ্ধ না করিয়া, এই বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখে। ইহার পাতা গাঢ় হরিত বর্ণ. এবং পাঁচটী আঙ্গুল আছে, দেখিতে ঠিক হাতের পাতার ন্যায়। ইহার খুব বড় বড় সাদা রঙ্গের ফুল হইয়া থাকে; এবং ইহার ফল খুব সুখাদ্য ও পুষ্টিকর। এই ফলের মধ্যে যে বীজ আছে তাহা জলে ভিজাইলে অম্লরস হয় এবং তাহাতে জ্বর ভাল হয়; আমাশয় রোগের ইহাতে উপকার হয়। ইহার পাতায় পেটের ব্যারাম ভাল হয় এবং ছালে জ্বর শান্তি হয়। ছাল হইতে সূতা বাহির করিয়া নিগ্রোরা দড়ী ও বস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিয়া থাকে।

* *
*

ইটালী দেশে. মোডেনা নামক স্থানে অনেক প্রস্রবণ আছে। এই সকল প্রস্রবণ জলের নহে, নানা বর্ণের তৈল এই সকল প্রস্রবণে পাওয়া যায়। নীচু জমিতে যে সকল প্রস্রবণ বাহির হয়, তাহাতে লাল বর্ণের তৈল এবং উচ্চ জমির প্রস্রবণ গুলিতে শাদা রঙ্গের তৈল পাওয়া যায়। এই সকল তৈলে বাত, পক্ষাঘাৎ প্রভৃতি রোগের অনেক উপকার হয়।



সাত ভাই।



ভাইয়ের স্নেহেতে
আছি বাঁধা ভাই
সুখে আছি ভাই মোরা,
ভাই কোলে ভাই
আছি লুকাইয়া
সহজে না দিব ধরা।
স্নেহ ডোরে বাঁধা
আছি সাত ভাই
দুঃখ শোক নাহি জানি,
ভাই বিনা ভাই
কিছুই জানি না
ভাবি—তার স্নেহ মুখখানি
নাহি জানি দ্বেষ
নাহি জানি হিংসা
—ক্রোধ লোভ কারে বলে,
কলহ বিবাদ
কিছুই না জানি
আছি ভাতৃ-স্নেহে ভুলে।
ভাইএর গলা ধরে
ভাই চুম' খাই
নাই—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই",
শুধু—ভাইএর মুখেতে
সুখ আমাদের
আর কিছু নাহি চাই।

ভাল মন্দ।

নরেণের বয়স ১২ বৎসর। যে দিন তাহার পিতার মৃত্যু হয় তাহার পর দিবসই তাহার মাতার মৃত্যু হয়। পিতা মাতা উভয়ই ওলাউঠা রোগে মারা যান। নরেণ তাহার এক পিতৃব্যের আশ্রয়ে থাকিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছে। কেদার বাবু একজন সৎলোক। তিনি নরেণকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বাড়ীর বালক বালিকাদিগকে লইয়া নীতি-পূর্ণ গল্প বলেন। নরেণ তাহার পিতৃব্যের নিকট অনেক নৈতিক উপদেশ শিক্ষা করিল। নরেণ স্কুলে যাইবার সময় পাড়ার বালকদের সঙ্গে সদালাপ করিতে করিতে যায়; কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে ব্যথিত হয়। কেহ বা পথে ফড়িং ধরিয়া অযথা কষ্ট দেয়, কেহ বা বাছুরের লেজ মোচড়াইয়া যাতনা দেয়, কেহ বা পরের বৃক্ষের কুল পাড়িয়া খায়, আবার কেহ বা বৃদ্ধাকে 'ডাইনী' বলিয়া পিছু পিছু ধায়। নরেণ তাহাদের এই প্রকার ব্যবহারে মনে আঘাত পাইলেও তাহাদের সঙ্গ ছাড়িতে পারে নাই। একত্রে স্কুলে যায় আবার একত্রে ফিরিয়া আসে। ক্রমে তাহার মনের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। আগে বালকদের যে সমুদয় কুব্যবহার দেখিলে নরেণ ব্যথিত হইত, এখন আর তাহা হয় না। এখন তাহাদের কার্য্যে নরেণের দুঃখ হওয়া দূরে থাক সে এখন তাহাতে হাসিতে থাকে। কিন্তু তাহার মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাহাদের সঙ্গে থাকিলেও তাহাদের ন্যায় কখন কুকার্য্যে রত হইবে না।

আজ নরেণ একাকী তাহার মাতুলালয়ে যাইতেছে। পথে দেখিল চাটুর্য্যেদের বাগানে একটী কুল গাছে সুন্দর কুল পাকিয়া আছে। নরেণের মনে যেন কি একটা ভাবের উদয় হইল; নরেণ খানিক দাঁড়াইল। গাছের পানে একবার চাহিল; কিছুক্ষণ পরে গাছের দিকে দু এক পা করিয়া চলিতে লাগিল। গাছের ধারে পৌঁছিয়া, কুল পাড়িবার জন্য হাত বাড়াইল কিন্তু কেন জানি তাহার—হাত কাঁপিতে লাগিল, শরীর দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। নরেণ সেই কুল তলায় বসিয়া পড়িল। এমন সময় কেদার বাবু সেইখানে উপস্থিত হইলেন। নরেণের মুখ মলিন হইল; ভয়ে জড়সড় হইয়া কান্দিতে লাগিল। নরেণ কেন কান্দিতেছে, কেদার বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল বুঝি বালকের মনে পিতৃ মাতৃ শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। অনেক সান্ত্বনার পর নরেণ স্থির হইল। কেদার বাবু ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন;—'নরেণ, তুমি এখানে বসিয়া কান্দিতেছ কেন? তোমাকে কি কেহ মারিয়াছে?'

নরেণ—না কাকা, আমাকে কেহ মারে নাই। আমি নিজের দোষে নিজে কান্দিতেছি।

কেদার বাবু—তুমি এমন কি দোষ করিয়াছ যে দুধারে তোমার চক্ষের জল পড়িতেছে।

নরেণ—আমার যাহা করা উচিত নয় আমি আজ তাহাই করিতেছিলাম।

কেদার বাবু—কি নরেণ?

নরেণ—যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিলাম তাহাই করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি কার্য্যটি সমাধা করিবার পূর্ব্বেই ক্ষান্ত

হইতে পারিয়াছি। আমি কুল চুরি করিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু আমি ফলে হাত দিবার পূর্ব্বেই বসিয়া পড়িয়াছি।

কেদার বাবু নরেণের কথায় বড়ই সুখী হইলেন এবং মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া, তাহাকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা একটী কুল চুরিতে আর বেশী কি অন্যায় হইত; অমন ত বালকেরা করিয়াই থাকে।"

নরেণ—কাকা আপনিই না শিক্ষা দিয়াছেন, চুরি করা অন্যায়। যখন ন্যায় কি অন্যায়, এবং ভাল কি মন্দ বুঝাইয়া দেন, তখন ত চুরিকে অন্যায় এবং মন্দ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। আমিও বুঝিয়াছিলাম যে বাস্তবিক তাহা অন্যায় এবং এখনও তাহাই বুঝিতেছি।

কেদার বাবু—তুমি কি করিয়া জানিলে যে, চুরি করা অন্যায়? আমি ইহাকে অন্যায় বলিয়া পরিচয় দিয়াছি বলিয়া, না তোমার মন বলিতেছে যে চুরি করা অন্যায়।

নরেণ—আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলি। আমি যখন এই গাছের পাণে চাহিলাম তখনই আমার মনে কেমন একটা ভয়ের উদয় হইল। অমি ত এত দিন যত কার্য্য করিয়াছি কোন দিন ভয় পাই নাই, তবে আজ আমি এই কার্য্যে ভয় পাইলাম কেন? তারপর যখন কুল পাড়িতে হাত বাড়াইলাম তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তখন বেশ বুঝিলাম এ কার্য্যটি অত্যন্ত গর্হিত; নতুবা আমার এ দশা হইবে কেন? আমার মন যেন আমাকে এই কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি আর না ভাবিয়া চিন্তিয়া বসিয়া পড়িলাম। বসিয়া ধীর ভাবে ভাবিয়া দেখিলাম যে, এ কার্য্যটি বাস্তবিক অন্যায়। আজ আমি কুল চুরি করিলাম, কাল যদি আপনার বাক্স হইতে পয়সা চুরি করি, পরশু যদি টাকা চুরি করি? আমার এই প্রথম চুরি ক্রমশঃ আমাকে ডাকাইত করিয়া তুলিতে পারে। তারপর আমি যেমন চুরি করিলাম, এই রকম যদি আমার সমবয়স্ক সকলেই চুরি করিতে শিখে, তবে ত পৃথিবীর সকল বালকেরাই চোর হইবে। পৃথিবীতে তখন আর কেহ সাধু থাকিবে না।

আমার ত মনে হয় আপনি যে দুইটী নিয়ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই দুইটি নিয়ম দ্বারা আমরা অনায়াসে কোন্ কার্য্যটি ভাল এবং কোন্ কার্য্যটি মন্দ তাহা বুঝিতে পারি।

কেদার বাবু—নরেণ তোমার কথায় আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি বাঁচিয়া থাক এবং সৎপথে থাকিয়া সাধুলোক হও। যাও বাড়ী যাও।

নরেণ—আমি মামার বাড়ী যাইব বলিয়া এই পথে যাইতেছি।

কেদার বাবু—তবে আমার সঙ্গে এস, তোমার মামার কাছে তোমার গুণের কথা বলিয়া আসি। তিনি শুনিয়া কতই সুখী হইবেন।



ক্রিকেট্।

(ব্যাট্‌বল খেলা।)

শরীর সবল ও সুস্থ রাখিবার পক্ষে ব্যায়ামের আবশ্যকতা ও উপকারিতা পূর্ব্বে আমরা অনেকবার বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছি। অদ্য এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা বলিতে চাই। নিয়মিত ব্যায়ামে শুধু যে আমাদের শরীর সবল ও সুস্থ থাকে তাহা নহে, ইহাতে আমরা বিপদ আপদে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করি এবং অনেক দুরূহ কাজ সহজে ও কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিতে পারি। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ব্যায়ামের কোন বিশেষ নিয়ম প্রণালী প্রচলিত না থাকিলেও, তখন সকলে যে ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহাতেই ব্যায়ামের ফল বিশেষরূপে লাভ করিতেন। পূর্ব্বকালে গাড়ী ঘোড়ার ব্যবহার বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল না। কোন স্থানে যাইতে হইলে নিজের পা দুখানির উপরই সর্ব্বদা নির্ভর করিতে হইত। এখন এক মাইল পথ যাইতে হইলেই একখানি গাড়ী কিম্বা অন্য কোন যানের বন্দোবস্ত করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বকালে সকলে কাশী বৃন্দাবন প্রায়াগ্ প্রভৃতি তীর্থ স্থানের পুণ্য হাঁটিয়াই লাভ করিয়া আসিতেন। ইহাতে কাহারও দুই তিন মাস লাগিত। সে সময়ে অনেকে চোর ডাকাত প্রভৃতির হাতে যে কত বিপদে পড়িতেন এবং ঐ সমস্ত বিপদ হইতে অনেক সময় যে কত কৌশলে মুক্তিলাভ করিতেন, সে সমস্ত গল্প বোধ হয় অনেকেই ঠাকুর দাদাদের মুখে শুনিয়া থাকিবে। পূর্ব্বকালে যে কেবল হাঁটা চলার জন্যই ব্যায়ামের ফল লাভ হইত তাহা নহে; তখন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালীই এমন ছিল যে, তাহাতে শারীরিক পরিশ্রম না হইয়াই পারিত না। পূর্ব্বে চাকর চাকরাণীর ব্যবহার এত অধিক ছিল না। সে সময়ের লোকেরা নিজের কাজ নিজেরা করিতেই ভাল বাসিতেন। কেবল যাহা নিজের হাতে করা অসম্ভব ছিল তাহারই জন্য অন্যের মুখের দিকে চাহিতেন। ইহাতে কাজ কর্ম্ম যে ভালও হইত তাহা বলা অনাবশ্যক। এখন একখানি বাগান করিতে হইলে দুই তিনটা মালীর দরকার হয়। কিন্তু পূর্ব্বে নিজের হাতেই এ সমস্ত হইত। আমাদের ঠাকুরদাদারা নিজের হাতে যে সমস্ত আম কাঁঠাল নারিকেলের গাছ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফল খাইয়া আমাদের উদরের পরিতোষ জন্মিতেছে। আমরা নিজের হাতে আর কটা গাছ করিতেছি? এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক বৃদ্ধ নিজের কাজ স্বহস্তে করিয়া যত তুষ্ট হন, অন্যের দ্বারা করাইয়া সেরূপ তুষ্ট হন না। এরূপ লোক ৬০।৭০ বৎসরেও এখন বেশ সবল ও সুস্থ আছেন। আমাদের শরীরের বিকৃত অবস্থার দিকে চাহিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন এবং দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহাদের সরল চাকচিক্য-শূন্য বিলাসিতা বিহীন জীবনের অনেক উপদেশপূর্ণ গল্প করিয়া থাকেন।

আজকাল আবার আমাদের দেশের লোকের ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে বোধ জন্মিয়াছে দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হয়। মধ্যে এদিকে একেবারেই দৃষ্টি ছিল না; বরং যে সব ছেলে কপাটি (ডুগ্‌ডুগ্) গোল্লা ছুট প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমের খেলার প্রিয় ছিল, তাহাদিগকে "ষণ্ডামার্ক" "গোঁয়ার" প্রভৃতি মিষ্ট নাম প্রদানে লোকে ঘৃণাই প্রকাশ করিত। আজ কাল আবার লোকের মত ফিরিয়াছে; ব্যায়ামে অনুরাগ

জন্মিয়াছে। আমাদের দেশের বালকেরা যেমন ব্যায়াম প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমের অনুরাগী হইতেছে, তাহাদের পিতামাতারাও সেই সঙ্গে সঙ্গে উহাতে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। স্কুলে স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ক্লাসে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া যেমন বালকেরা পারিতোষিক পাইতেছে, ব্যায়ামে পারদর্শিতা দেখাইয়াও সেইরূপ পারিতোষিক ও প্রশংসা লাভ করিতেছে। এ সমস্ত দেখিয়া সকলের মনেই আনন্দ হইবার কথা। কিন্তু পূর্ব্বে অন্য সময়ে আমরা যেরূপ বলিয়াছি এখনও বিশেষরূপ বলিতেছি যে যিনি যে ব্যায়ামই করুন না কেন নিজের সমর্থ বুঝিয়া করিবেন। সকলের পক্ষে সকল ব্যায়াম খাটে না। পেরালাল বারে (Parallel Bar) ব্যায়ামে সকলের উপকার হইবার কথা, কিন্তু হরাইজনটাল বারের (Horizontal Bar) ব্যায়ামে সকলের উপকার না হইতে পারে। এই বারের ব্যায়াম বিশেষে কাহারও বা অপকারও হইতে পারে। মাটিয়াম প্রভৃতিতে সকলেরই উপকার হইবার কথা এবং ইহা সকলেই সকল অবস্থায় শিখিতে পারেন। অন্ততঃ নিয়ম মত হাঁটা চলাতেও উপকার আছে। শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য, কাহারও তাহা হইতে বিরত থাকা উচিত নহে।

আবার যে আমাদের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রমে অনুরাগ দেখা গিয়াছে, সে যে ইংরাজদের অনুকরণে তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। ইংরাজেরা শরীর কি করিয়া সবল ও সুস্থ রাখিতে হয়, তাহা বেশ জানেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ক্রীড়া কৌতুক এমন খুব কমই আছে যাহাতে শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না। আজ কাল আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বালকবৃন্দের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রমের বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। মানসিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমও নিতান্ত দরকার, অন্যথা শরীর থাকে না। ইংরাজদের আশীর্ব্বাদে আমাদের দেশের বালকদের মধ্যে অনেক শারীরিক পরিশ্রমের খেলা দেখা দিয়াছে, যথা,—ক্রিকেট্ (ব্যাটবল), ফুটবল, লনটেনিস্, ব্যাডমিন্‌টন্ ইত্যাদি। এই সমস্ত খেলাগুলিতেই শারীরিক পরিশ্রমের বিশেষ আবশ্যক; এবং ইহার মধ্যে ক্রিকেট খেলাই আমাদের দেশের বালকদের মধ্যে বিশেষরূপ প্রচলিত হইয়াছে। এই খেলাটি ইংরাজদের অতি প্রিয় খেলা এবং এটী সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদেরই জাতীয় (National) খেলা। ইংরাজ ভিন্ন ইয়ুরোপের অন্য কোন জাতির মধ্যে এ খেলা নাই। ইহাতে সুদক্ষ হইতে হইলে বুদ্ধি ও কৌশলের বিশেষ আবশ্যক। ইংরাজেরা ছেলেবেলা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণতঃ প্রায় ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সমান উৎসাহের সহিত ক্রিকেট্ খেলিয়া থাকেন। বিলাতে এ খেলায় যাঁহারা বিশেষ দক্ষ, তাঁহারা সকলেই আদর ও সম্মানের পাত্র হন। অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ প্রভৃতি বিলাতের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে এ খেলার খুব ধূম, এবং ইহাতে উৎকর্ষ লাভ করিবার জন্য যুবকেরা বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন। বিলাতের যুবকেরা শারীরিক ও মানসিক উন্নতি উভয়ই এক চক্ষে দেখেন। তাঁহারা জানেন, শরীর না থাকিলে কিছুই থাকিবে না। বিলাতে সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিকেট খেলোয়ার এখন ডব্‌লিউ জি গ্রেস্ সাহেব। ইহাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। শ্রীযুক্ত লর্ড রিয়ার পরে বোম্বাই প্রদেশের যিনি গভর্ণর হইয়া আসিতেছেন তাঁহার নাম লর্ড হেরিস। ইনি ক্রিকেট খেলায় বিশেষ

সুদক্ষ ও উৎসাহী। ভারতবর্ষে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নানা সভা সমিতি হইতে তাঁহাকে যে সম্মান-সূচক ভোজ ইত্যাদি দিয়াছে, কয়েক দিবস হইল তাহার একটী ভোজে তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ক্রিকেট খেলায় তাঁহার অনুরাগ, উৎসাহ ও দক্ষতা হেতু তিনি কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেরই অনুরাগ ভাজন হইয়াছেন; অন্যথা দেশে বিদেশে তাঁহার এত বাহুল্যরূপে পরিচিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। লর্ড হেরিসের এই কথা হইতে বেশ বুঝা যায়, বিলাতে এ খেলাটী কত প্রিয়। বাস্তবিকই এটী বীরোপযোগী খেলা। ক্রিকেট ভিন্ন ফুটবল, লন্‌টেনিস প্রভৃতিও বিলাতের যুবকদের খুব প্রিয় খেলা। লন্‌টেনিস বৃদ্ধেরাও বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত খেলিয়া থাকেন এবং এই খেলায় মহিলাগণও সমভাবে যোগ দিয়া থাকেন।

ইংরাজদের দেখাদেখি আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যেও এই সব খেলা দেখা দিয়াছে; এবং সকলেই দেখিয়া থাকিবেন আমাদের দেশের বালকেরা এখন বিশেষ উৎসাহের সহিত ক্রিকেট খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ খেলাতে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে যে বুদ্ধি ও কৌশলের বিশেষ আবশ্যক পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথম হইতে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক ইহা শিক্ষা না করিলে পরে কিছুতেই ইহাতে ভাল হওয়া যায় না। আমাদের দেশে ইহার নিয়ম প্রাণালীর দিকে না চাহিয়া, যাহার যেমন ইচ্ছা তিনি সেইরূপ খেলেন বলিয়া, এখনও ইহাতে কেহ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে ক্রিকেট খেলা ঢাকার ছেলেদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং তাঁহারাই ভাল খেলিতেন। ইহার কারণ এই যে, ঢাকার সাহেবেরা বাঙ্গালীদের নিয়া খেলিতেন এবং ঢাকার কলেজের সাহেব প্রফেসারগণ এ বিষয়ে খুব উৎসাহী হইয়া ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। এখনও বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে যাঁহারা এ খেলায় প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ঢাকার। এগার বৎসর হইল পূর্ব্ব বঙ্গের ছেলেরাই প্রথম কলিকাতা সহরে প্রসিডেন্সি কলেজের মধ্যে একটী ক্লাব্ খুলিয়া খেলিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের উৎসাহ এবং চেষ্টার ফল আমরা এখন এই দেখিতেছি যে, এখন প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে খেলা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালী ছেলেরা অল্পদিনের মধ্যে এই খেলায় ঠিক আশানুরূপ না হউন কতকটা উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এ দেশীয় অনেক সাহেবের ছেলেদের এবং কেল্লার গোরাদের সময় সময় এই বাঙ্গালী ছেলেদের কাছে হার মানিতে হইতেছে। এটী খুব সুখের বিষয় তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

এ খেলা ক্রমশঃ আমাদের দেশে আরও উন্নতি লাভ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিশনার এবং মিউনিসিপালিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত হেরিসন সাহেব কলিকাতার স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এ খেলার যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য প্রাইজ স্বরূপ দুইটী পুরস্কার (সিলড্) প্রদান করিয়াছেন। যে স্কুলের ছেলেরা বাৎসরিক খেলায় সকলকে হারান তাঁহারা সেই বৎসরের জন্য সেই 'সিল্ড' পান। এইরূপ দশ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা বেশী সময় এই সিল্ড পাইবেন তাঁহারা একেবারে উহার অধিকারী হইবেন এবং উহা তাঁহাদের স্কুলের কি কলেজের একটী সম্মানের জিনিস স্বরূপ চিরকালের জন্য থাকিবে। গত তিন বৎসর এই খেলা হইতেছে। বাঙ্গালী কোন স্কুল কি কলেজে এখন পর্য্যন্ত ঐ 'সিল্ড' লাভ

করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের যুবকেরা যদি ছেলেবেলা হইতেই উৎসাহের সহিত সুপ্রণালীতে এই খেলা শিখেন, তাহা হইলে শীঘ্র উহা লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। একটু খেলিতে শিখিয়াই কেহ যেন মনে না করেন যে খুব শিখিয়াছি। ক্রিকেট বড় শক্ত খেলা। ছেলেবেলা হইতেই সুনিয়মে ও সুপ্রণালীতে উহা শিক্ষা না করিলে শেষে ভাল শেখা যায় না। আমাদের দেশের যুবকেরা একটু বড় হইলেই শারীরিক পরিশ্রমের সমস্ত খেলা ছাড়িয়া দেন। তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া ছোট ছেলেদের শিক্ষা দিলে এসম্বন্ধে অনেক উন্নতি হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, মেট্রপলিটন ইনিষ্টিটিউসনের গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এবং প্রসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহোদয়কে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না। তাঁহারা যেরূপ উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত তাঁহাদের যুবক বন্ধুদের এ বিষয়ে শিক্ষা ও উৎসাহ দিতেছেন এবং তাঁহাদেরই উৎসাহে এই তিন বৎসরের মধ্যে যেরূপ সুফল ফলিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। আমরা প্রার্থনা করি তাঁহারা সুস্থ শরীরে থাকিয়া এ দেশের যুবকদের দৃষ্টান্তের ও অনুকরণের স্থল হউন।

আমরা পূর্ব্বে এক সংখ্যায় বলিয়াছি যে সংপ্রতি ইংলণ্ড হইতে একটী টিম্ (দল) এ দেশে খেলিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের অধিনায়ক অর্থাৎ কাপ্তেনের নাম জি এফ্ ভার্নন্। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে খুব সম্ভ্রান্ত লোক যে আছেন তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহাঁদের সকলেরই বয়স অনুমান ২৪ হইতে ৩৫ এর মধ্যে হইবে। ইহাঁদের শারীরিক স্বাস্থ্য দেখিলে চক্ষু জুড়ায়; সকলেই সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। ইহাঁরা কলিকাতায় যে দুইটী খেলা হয় তাহার দুটীতেই এখানকার সাহেবদের বিশেষ রকম হারাইয়া দিয়াছেন। এখান হইতে পাটনা গিয়া তথাকার সাহেবদের সঙ্গে খেলেন। সেখানে দুই দিনে খেলা শেষ না হওয়ায় হার জিত ঠিক হয় নাই। পাটনা হইতে এলাহাবাদ গিয়া দুইটী ম্যাচ্ খেলেন। দুইটীতেই তাঁহারা জয় লাভ করিয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে ইহাঁরা বোম্বাই নগরে গিয়া তথাকার সাহেবদের সঙ্গে প্রথম ম্যাচ্ খেলেন, এবং ইহাতে উক্ত সাহেবদের বিশেষরূপে পরাস্ত করেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিজয়নিশান সমভাবে উড়িতেছিল; কিন্তু বোম্বাই নগরে পার্শীযুবকদের সঙ্গে হারিয়া তাঁহাদের মুখে কলঙ্ক পড়িয়াছে। পার্শীরা তাঁহাদিগকে রীতিমত হারাইয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষে আসিয়া ভার্ণন সাহেবের দল যত দলের সঙ্গে খেলিয়াছেন সকলই ইংরাজ সম্প্রদায়ের। কিন্তু সকলের সঙ্গেই জয় লাভ করিয়া অবশেষে যে তাঁহারা এ দেশীয় লোকের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন, এটী আমাদের খুব সুখের বিষয় বলিতে হইবে। ভার্ণন সাহেবের দল বম্বে হইতে লক্ষ্নৌ ও আগ্রা আসিয়া তথাকার সাহেবদিগকেও হারাইয়াছেন। এখন শুনিতে পাইতেছি পার্শীদের সঙ্গে তাঁহারা আর একবার খেলিবেন। এবার পার্শীরা যদি পরাস্তও হন তাহাতেও ভার্ণন সাহেব তাঁহার সর্ব্ব-জয়ী নাম নিয়া ফিরিয়া যাইতে পারিতেছেন না। আমরা আগামী ম্যাচের ফল জানিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছি; জানিতে পাইলেই তোমাদিগকে জানাইব। পার্শীদের জয় লাভে আমাদের এত উল্লাস দেখিয়া নিরস্ত থাকিলেই হইবে না। আমাদের যুবকেরা ভবিষ্যতে যাহাতে এই প্রকার জয় লাভ করিয়া উল্লাস দেখাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

সেদিন কি শীঘ্র আসিবে না? এ বৎসর আমাদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার উন্নতি বড়ই কম দেখিতেছি। অন্যান্য বৎসরের মত এ বৎসর খেলাই হয় নাই; ইহা অতি দুঃখের বিষয়। আশা করি আগামী বৎসর এরূপ দুঃখ আমাদের প্রকাশ করিতে হইবে না।



আশ্চর্য্য-হ্রদ।

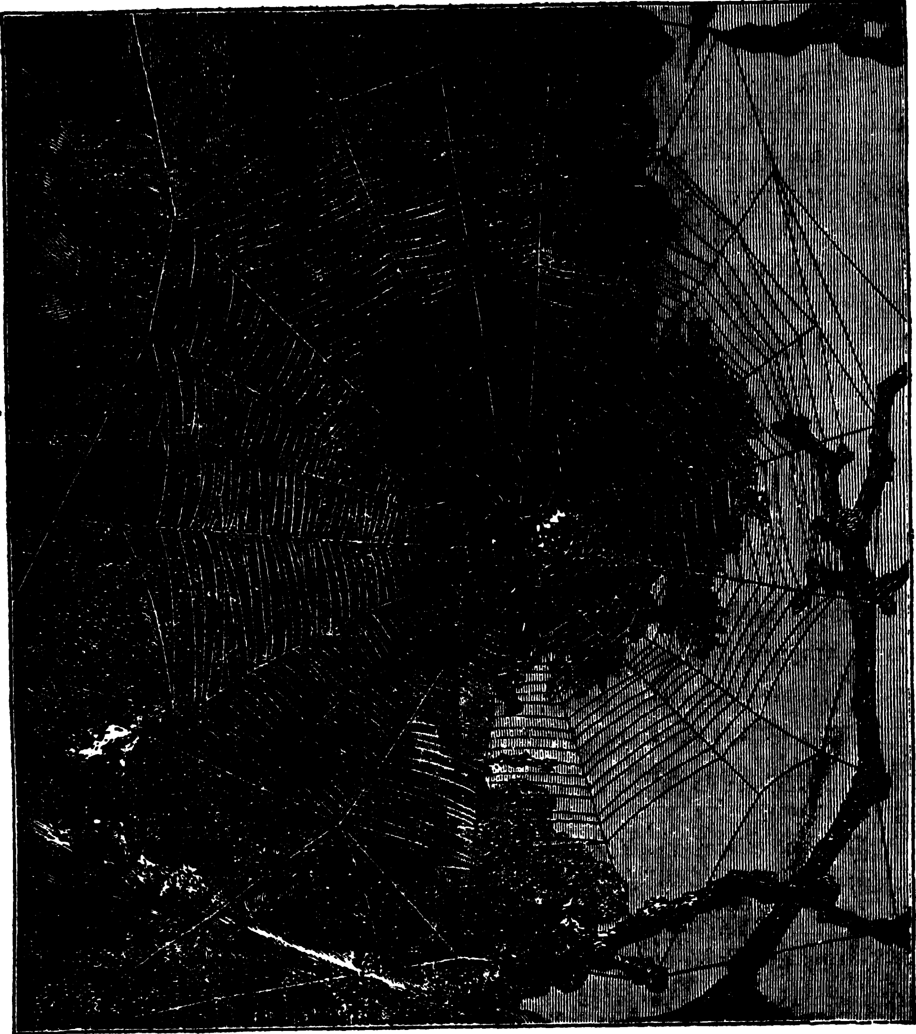
প্রকৃতির মধ্যে কত স্থানে কত আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। প্রকৃতির এই সকল অদ্ভুত সৃষ্টি দেখিয়া মানুষ অবাক হইয়া থাকে। ইউরোপে পর্টুগ্যাল দেশে একটী বিস্তৃত পর্ব্বত শ্রেণী আছে। এই পর্ব্বতের শিখর দেশে দুইটী বৃহৎ হ্রদ আছে। এই দুইটী হ্রদই অতিশয় বিস্তীর্ণ। ইহাদের মধ্যে একটী অতিশয় গভীর, এমন কি লোকের ধারণা যে, সেটী অতলস্পর্শ। দুটী হ্রদই সমুদ্র হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমুদ্র হইতে এত দূরে এবং পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত হইয়াও, সমুদ্রে যখন তরঙ্গ উঠে, তখন এই দুটী হ্রদেও তরঙ্গ উঠিতে থাকে। আবার সমুদ্র জল যখন স্থির থাকে, তখন হ্রদ দুটীর জলও প্রশান্ত থাকে। সমুদ্রের সহিত যে এই হ্রদ দুটির যোগ আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। সমুদ্রের সহিত যে হ্রদ দুটির যোগ আছে, তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। হ্রদের জলে যখন তরঙ্গ উঠে, তখন সেই তরঙ্গের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজের ভগ্ন অংশ সকল ভাসিয়া উঠিতে দেখা গিয়া থাকে। পর্টুগালে আর একটী হ্রদ আছে; ঝড়ের পূর্ব্বে তাহা হইতে এক প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিতে থাকে সেই শব্দ এত গভীর এবং ভয়ঙ্কর যে, তাহা বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। আর একটী হ্রদ আছে, তাহার মধ্যে কাঠ বা তদপেক্ষাও হাল্‌কা জিনিস—এমনকি খড় কুটা, সোলার ছিপি, পাখীর পালক পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহা ডুবিয়া যায়। জলের অপেক্ষা যে পদার্থ ওজনে ভারি, তাহাই জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যাইবার কথা। এবং জল অপেক্ষা যে সকল জিনিস হাল্‌কা, তাহা জলের উপরে ভাসিবে, ইহাই নিয়ম। কিন্তু এই হ্রদের জলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।



মাকড়সা ও মাছি।

মনের মতন, শক্ত চিকণ, জালখানি পাতিয়া,
ধূর্ত্ত চতুর এক মাকড়সা, মনের মাঝে খুব ভরসা,
ভাব্‌ছে "এবার, পড়্‌লে শীকার, যাবে কোথা দিয়া?"
কিন্তু একি বিধির খেলা, ধীরে ধীরে বাড়্‌চে বেলা,

জ্বল্‌ছে উদর, বড়ই প্রখর, কর্‌বে কি উপায়,—
ভাব্‌তেছে তাই, "আজ বুঝি ভাই, বিধি না মাপায়!"
এমন কালে দেখ্‌লে চেয়ে, ভন্ ভনিয়ে গান্‌টী গেয়ে,
পাখার দু-পাশ, ঘুরিয়ে বাতাস, একটী মাছি আসে,
আহ্লাদেতে এগিয়ে এসে, দুষ্ট মাকড় হেসে হেসে,
ব'লছে তাহায়, কপট কথায়, মাখা আদর-রসে!
"এস এস সোণার মাছি, তোমার তরে দাঁড়িয়ে আছি,
দুপর বেলায়, রোদের মাথায়, যাচ্‌চো কোথা ভাই?
এস আমার বৈঠক-খানায়, আমোদ করি খুব দু-জনায়,
এক্‌লা তথায়, মন নাহি যায়, দোসর খুঁজি তাই!"



মাছী বলে "মাপ কর ভাই, লোকে বলে শুন্‌তে পাই,
সে ঘরে হায়, বারেক যে যায়, সেই ফেরে না আর!
এ তিন ভুবন, ক'র্‌লে ভ্রমণ, খোঁজ মেলে না তার!
মাকড় বলে "এই দুপুরে, রোদের মাথায় ঘুরে ঘুরে,
ক্ষুধার জ্বালায়, ঘোর পিপাসায়, ঝ'ল্‌চে তব প্রাণ;
আমার ত ভাই ভাঁড়ার ঘরে, তোমার তরে থরে থরে,

নানান্ প্রকার, কতই খাবার, র'য়েছে সাজান,—
যা চাবে মন উদর ভরে, খাওনা এসে দয়া ক'রে,
ক্ষুধার অনল, হ'লে শীতল, কষ্টটা দূর হবে!
বরফ শীতল, পান করি জল, তৃষ্ণা দূরে যাবে।"
মাছি বলে "কি জানি ভাই, নিন্দুকের ত মরণ নাই,
যথায় তথায়, কতই কথায়, কুৎসা রটায় তোমার!
"সেই ভাঁড়ারে ঢুকলে পরে, এই জীবনে আহার তরে,
ঘুরতে তাহার, হয় নাক আর, ঘোচে জীবন-ভার্!"
মাকড় বলে"কাজ কি তাহার, মিথ্যা কথার কি আসে যায়,
নিন্দুকের ত, স্বভাব যত, জান্‌তে বাকি নাই?
দেখ্‌চি তোমায় ক্লান্ত মতন, বিশ্রামের ত খুব প্রয়োজন,
শয়ন ঘরে, তোমার তরে, বিছনা আছে ভাই!
নরম যেন ফুলের রাশি, ধপ্‌ধপে সে চাঁদের হাসি,
যেমন শয়ন, অম্‌নি নয়ন, বুঁজ্‌বে ঘুমে তুমি!
মধুর ললিত, ঘুম-পাড়া-গীত, গাইবো ব'সে আমি!"
মাছি বলে "না থাক্ ভাই! সবাই বলে শুন্‌তে পাই,
সে বিছানায়, যে জন ঘুমায়, সেই জাগে না আর।
কি জানি হায়, কিরূপ তথায়, কারখানা তোমার!"
হেসে হেসে কয় মাকড়, "দেখ্‌চি তোমায় চতুর বড়,
রূপটী যেমন, গুণটি তেমন, এমন আছে কার?
জল্ জ্ব'লে ঐ দুটী নয়ন, সন্ধ্যাকালের তারার মতন,
কেমন গড়ন, কেমন বরণ, সুনীল চমৎকার!
আ ম'রে যাই নিজের বাহার, দেখ্‌তে তুমি পাও না ত আর,
আমার ঘরে, থাকের পরে, আয়না ভাল আছে,
দেখ্‌বে আপন, রূপের কিরণ, এমনা ভাই কাছে?"
মাছি বলে "আয়নাতে ভাই, রূপের চটক্ দেখ্‌তে না চাই,
কথার ফাঁদে তোমার ক'াদে, পড়্‌লে পরে আর
ঘাড়্‌টী নিয়ে, বাহার দিয়ে, বাহির হওয়া ভার!
তাই বলি শঠ-কপট-প্রভু, ভুল্‌বো না ও কথায় কভু,
জান্‌তে তোমার, আচার ব্যাভার, বাকি নাই আমার,
কাজ্ কি কথায়, হ'লেম বিদায়, পদে নমস্কার!!

কপট খলে, কতই ছলে স্তুতির গান গায়,
চতুর যেজন, সে কখনও, ভুলেনাকো তায়।

ইতিহাসের কথা।

রতবর্ষের যে সকল জাতি শৌর্য্য বীর্য্য এবং বীরত্বে জগতে যশঃ ও গৌরব লাভ করিয়াছিল, শিখ তাহার মধ্যে একটী প্রধান জাতি। ভারতবর্ষ যখন মুসলমানদিগের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন এই বীর জাতির উৎপত্তি হয়। ক্রমে ইহাদের পরাক্রমে পরাক্রান্ত মুসলমানগণ হতবল হইয়াছিল। মহাপরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আরঙ্গজেবও ইহাদের পরাক্রমে ভীত হইয়াছিলেন; এবং বিশ্ববিজয়ী ইংরাজের গর্ব্বও ইহাদিগের নিকট খর্ব্ব হইয়াছিল। গুরু নানক এই বীর জাতির সৃষ্টি করেন; কিন্তু তিনি শিখ জাতির ধর্ম্ম-গুরু মাত্র ছিলেন। শিখগণ তাঁহার সময়ে নিরীহভাবে কেবল ধর্ম্মাচরণেই ব্যাপৃত ছিল। পঞ্জাব প্রদেশে লাহোরের নিকটে এক স্থানে নানকের জন্ম হয়; নানক ক্ষত্রিয় ছিলেন। নানক অল্প বয়সেই পারস্য ভাষা ও গণিত শাস্ত্রে বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিলেন। যৌবনেই নানকের সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিল। নানকের পিতা তাঁহাকে ব্যবসা করিবার জন্য কতগুলি টাকা দিয়াছিলেন; তিনি সেই টাকার দ্বারা খাদ্য জিনিস কিনিয়া ফকীরদিগকে ভোজন করাইলেন। নানক অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং চিন্তাশীল ছিলেন। যৌবনে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে ভারতবর্ষের নানাস্থানে বেড়াইয়া, হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, অনেক সাধু যোগীর সহিত আলাপ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তৃপ্ত হইলেন না। তার

পর দেশে ফিরিয়া নানক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিলেন। এবং এক ধর্ম্মশালা স্থাপিত করিয়া, ধর্ম্মাচরণে রত হইয়া এবং শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। নানক শিক্ষা দিলেন, ঈশ্বর এক ভিন্ন বহু নহেন; ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল মানুষের কল্পিত। নানকের পবিত্র এবং উদার ধর্ম্মমত অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচারিত হইয়া পড়িল, ক্রমে সমস্ত পঞ্জাব তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল; হিন্দু মুসলমান সকলেই আসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। নানকের শিষ্যগণই শিখ নামে পরিচিত। সত্তর বৎসর বয়সে বাবা নানকের মৃত্যু হয়।

ক্রমে মুসলমানদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়ন অতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শিখ গুরুগণ মুসলমান সম্রাটদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া মুসলমানগণ অতিশয় অত্যাচার করিতে লাগিল; এবং অবশেষে প্রাণবধ পর্য্যন্ত করিতে আরম্ভ করিল। এতকাল পর্য্যন্ত শিখগণ নিরীহ ভাবে ধর্ম্মাচরণেই কালাতিপাত করিতেছিল। কিন্তু ক্রমাগত মুসলমানদিগের অত্যাচারে এই নিরীহ জাতি চঞ্চল হইয়া উঠিল। অত্যাচারের পর অত্যাচারে ইহাদিগের হৃদয়ে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল। মুসলমানদিগের হস্তে অর্জ্জুনমল নামক একজন শিখ গুরুর মৃত্যুতে শিখগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অর্জ্জুনের মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদ প্রাপ্ত হইলেন। পিতার মৃত্যু এবং মুসলমানদিগের অত্যাচারে হরগোবিন্দ অতিশয় মুসলমান বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন; প্রতিহিংসা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগিতে লাগিল। হরগোবিন্দ ধর্ম্ম শিক্ষার পরিবর্ত্তে শিখদিগকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবিতকালে শিখদিগের আশা পূর্ণ হয় নাই। হরগোবিন্দের পর তেগবাহাদুর শিখদিগের গুরু হইলেন। তেগবাহাদুর মোগল সম্রাট আরঙ্গজেবের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। আরঙ্গজেব তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিলেন।

তেগবাহাদুরের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি স্বীয় পুত্র গোবিন্দ সিংহকে নিজ তরবারী দিয়া গুরুপদে বরণ করিয়া গিয়াছিলেন। দিল্লীতে যখন তেগবাহাদুরের প্রাণবধ করা হয়, তখন গোবিন্দ সিংহের বয়স পনের বৎসর মাত্র। বালক গোবিন্দ পিতার মৃত্যু সংবাদে অতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু তেগবাহাদুর তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিবার সময় যে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই কথা তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। তেগবাহাদুর দিল্লী যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন, "শত্রুরা আমাকে দিল্লী লইয়া যাইতেছে, যদি আমাকে হত্যা করে, তাহাতে তুমি অধীর হইও না। মৃত্যুর পর আমার দেহ যেন শৃগাল কুকুরে নষ্ট না করে তাহাই দেখিও;—আর এক সময়ে আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইও।" পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া গোবিন্দ শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া বলিলেন, 'আমার পিতা দিল্লীতে হত হইয়াছেন। আমার প্রাণ থাকিতে ইহার প্রতিশোধ লইতে বিরত হইব না এবং তাহাতে আমার প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার। পিতার মস্তক দিল্লীতে রহিয়াছে, তোমরা কি কেহ তাহা আনিয়া দিতে পার?" গুরুর কথা শেষ হইবামাত্র একজন শিষ্য তৎক্ষণাৎ তেগবাহাদুরের মস্তক আনিয়া দিতে প্রস্তুত হইল; এবং দিল্লী হইতে মস্তক লইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্জাবে ফিরিল। পিতার

প্রেতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অত্যাচারী মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য গোবিন্দ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; স্বজাতির দুঃসহ যন্ত্রণা এবং দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রতিবিধানের জন্য একান্ত মনে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু গোবিন্দের সাহস, বিক্রম ও তেজস্বিতা শিখদিগের মধ্যে এক নূতন জীবন আনয়ন করিল। নানক যেমন শিখ-ধর্ম্মের জীবনদাতা, গোবিন্দ সিংহ তেমনি শিখ সমাজের জীবনদাতা। গোবিন্দ পিতার প্রেতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যমুনার পর্ব্বতময় প্রদেশে গেলেন। সেখানে ক্রমাগত বিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিবার উপায় চিন্তা এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। গোবিন্দ নিজে ক্ষমতা লাভ করিবেন বা প্রভুত্ব করিবেন এমন কোন স্বার্থ চিন্তা তাঁহার ছিল না; সাংসারিক সুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। একমাত্র মুসলমানের অত্যাচার হইতে স্বদেশ রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি একদিকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন, আর একদিকে অত্যাচার হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্য শিষ্যদিগকে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। একতা ও আত্মত্যাগ তাঁহার উপদেশের মূলমন্ত্র হইল। শিষ্যদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য গুরু-গোবিন্দ আপনার সমস্ত সম্পত্তি শতদ্রু নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। শিষ্যগণ গুরুর এপ্রকার আত্মত্যাগ এবং তাঁহার অতুল সাহস বীর্য্য ও তেজস্বীতা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। ক্রমে বহু শিষ্য সংগৃহীত হইল। তখন গুরু গোবিন্দ পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যদল লইয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু নানকের নিরীহ ধর্ম্ম সম্প্রদায় এক্ষণে একটী মহাপরাক্রমশালী বীরজাতিতে পরিণত হইল; গুরু গোবিন্দের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন শিখগণ একত্রিত হইয়া একটী মহাপরাক্রমশালী জাতি হইয়া দাঁড়াইল। গুরু গোবিন্দ শিখদিগকে যুদ্ধ কৌশলে নিপুণ করিয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরাক্রমে মোগলগণ প্রথম কয়েক যুদ্ধে পরাজিত হইল; কিন্তু শেষ যুদ্ধে গোবিন্দ পরাজিত হইলেন। এবং ইহার অল্পকাল পরেই একজন পাঠান গোপনে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া, অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণবধ করিল। গুরু গোবিন্দের এই সময় বয়স আটচল্লিশ বৎসর মাত্র।

গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে মোগল সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। আরঙ্গজেবের মৃত্যু হইতেই মোগল রাজত্বের অবনতি হইতে থাকে; ক্রমে দেশ মধ্যে মহাবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। আফগানজাতি এই সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় এবং মোগলদিগকে পরাজিত করে। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও শিখগণ আপনাদের তেজস্বীতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। গোবিন্দ সিংহ শিষ্যদিগকে "খাল্‌সা" নাম দিয়াছিলেন। যাহারা অস্ত্র চালনায় এবং অশ্বারোহণে নিপুণ না হইত, খালসাদিগের মধ্যে তাহারা সম্মান পাইত না; সুতরাং প্রত্যেক খালসাকেই এই দুই বিষয়ে নিপুণ হইতে হইত। ক্রমে খালসাগণ অনেক দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল, এবং এক এক দলের এক এক জন সর্দ্দার নিযুক্ত হইয়া, সেই সকল দল স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিল। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াও শিখগণ জাতীয় একতা বিস্মৃত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত শিখগণ প্রতি বৎসর অমৃতসরে গুরু দরবার মন্দিরে একত্রিত হইত এবং আপনাদের জাতির যাহাতে উন্নতি ও কল্যাণ হয়, তাহার আলোচনা করিত।



গুরু গোবিন্দের পর শিখদিগের মধ্যে আর এক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। ইহাঁর সময়ে শিখগণ পুনরায় মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠে। আমরা উপরে যাঁহার ছবি দিলাম, ইঁনিই সেই পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ। রণজিতের পিতা একটী শিখ দলের অধিপতি ছিলেন। ১৮৭০ সনে রণজিতের জন্ম হয়। রণজিতের পিতা অতিশয় সাহসী ও যুদ্ধকুশল ছিলেন। রণজিৎ পিতার সেই সমস্ত গুণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রণজিতের আট বৎসর বয়সের সময়, তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। রণজিৎ দেখিতে খর্ব্বকায় ছিলেন; বাল্যকালে বসন্ত রোগে তাঁহার একটী চক্ষু কানা হইয়া যায়। রণজিৎ লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার বীরত্ব, তেজস্বীতা, সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ ছিল। পৃথিবীর মধ্যে তিনি একজন বীর বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে আফগানগণ পঞ্জাবে আধিপত্য করিতেছিল, এবং ইংরাজগণ ধীরে ধীরে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন। রণজিৎ আফগান রাজ্যের বিশেষ

সহায়তা করিয়া, পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের আধিপত্য লাভ করিলেন। ক্রমে শিখদিগের মধ্যে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তারিত হইয়া উঠিল এবং অল্প সময় মধ্যে তিনি সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন।

রণজিৎ সিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিবার জন্ম কৃত-সংকল্প হইলেন। প্রথমতঃ তিনি মুলতান হইতে আফগানদিগকে দূর করিলেন। তারপর কাশ্মীর অধিকার করিয়া, সেখানে পুনরায় হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। মহারাজ রণজিৎ সিংহ স্বদেশ হইতে আফগানদিগকে দূর করিয়া, তাহাদিগের দেশে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্ম অগ্রসর হইলেন। একদিন সিন্ধু নদের তীরে, পৃথ্বিরাজ ও অন্যান্ম হিন্দু রাজগণ মুসলমানের হস্তে ভারতের স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহ যেন আজ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্ম অগ্রসর হইলেন। মহাপরাক্রমশালী রণজিৎ নির্ভয়ে সিন্ধু নদ পার হইয়া পাঠান রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এদিকে আফগানিস্থানের প্রধান সর্দ্দার, অসংখ্য সৈন্স সংগ্রহ করিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। নওশেরা নামক স্থানে আফগানদিগের সহিত মহারাজ রণজিৎসিংহের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রণজিৎ যুদ্ধ সময়ে অশ্বারোহী সৈন্সদিগের সম্মুখে যাইয়া মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী আফগানগণও পর্ব্বতের ন্সায় অটল ভাবে তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল, শিখগণ অতুল বিক্রম এবং অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত সমস্ত দিন আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল, অন্ধকারে যুদ্ধক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিল, কিন্তু তথাপি শিখগণ নিরস্ত হইল না। অবশেষে আফগানগণ মহাপরাক্রান্ত বীর রণজিতের বিক্রমে হতবল হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। রণজিত মুসলমানদিগের উপর জয়লাভ করিলেন। পঞ্জাব ছাড়িয়া রণজিতের রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনি নিজ সৈন্সদিগকে ইয়ুরোপীয় প্রণালী অনুসারে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন। সৈন্সদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদান ও রণকুশল করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এবং তিনি ইহাতে বিশেষ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যে এবং তাঁহার অনুগত রণকুশল শিখসৈন্সের পরাক্রমে তাঁহার যশঃ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রণজিৎ লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। তিনি কেবল নিজ প্রতিভাবলে জগতে এত সম্মান ও যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহস, তেজস্বীতা, শৌর্য্য ও বীর্য্য অতুলনীয় ছিল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শিখ জাতিরও দুর্দ্দশা হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর, রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাঁহার দুই পুত্র যুদ্ধে হত হন। মহারাণী ঝিন্দন কনিষ্ঠ পুত্র দলীপের নামে রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন, এই সময় শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। চক্রান্তে পড়িয়া শিখগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল। ইংরাজ দলীপের অভিভাবক হইলেন এবং ইংরাজই এক প্রকার পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন।





মার্চ্চ, ১৮৯০।



বিবিধ।

গতপূর্ব্ব বৎসরের সখায় অর্কিয়পেট্রিক্স নামক এক জাতীয় পক্ষীর বিষয় লিখিত হইয়াছিল, তাহা তোমাদের মনে থাকিতে পারে। পক্ষী জাতির প্রথম অবস্থা সরীসৃপ; অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম সময়ে পক্ষী বলিয়া একটা প্রাণী ছিল না। সরীসৃপ অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া পাখী হইয়াছে। এই রূপান্তর দু দিন বা দশ দিন, দু বছর বা দশ বছরে হয় নাই। ইহাতে কত যুগ লাগিয়াছে কে বলিতে পারে? অর্কিয়পেট্রিক্স এই সরীসৃপ এবং পক্ষীর মাঝামাঝি এক প্রকার জীব। অর্থাৎ ইহার শরীরের গঠন কতকটা সরীসৃপের মত এবং কতকটা পক্ষীর মত। সম্প্রতি এই অর্কিয়পেট্রিক্সের ন্যায় আরও কয়েকটী পক্ষীর অস্থি-পঞ্জর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

* *
*

আমেরিকায় ক্যানসাস্ প্রদেশে হেস্পার্নিস নামক একটী পক্ষীর অস্থিপঞ্জর পাওয়া গিয়াছে। এই পক্ষী প্রায় আড়াই হাত লম্বা এবং পদদ্বয় খুব সবল। কিন্তু ইহার পাখা নিতান্ত ক্ষুদ্র, পাখা দ্বারা ইহারা উড়িতে পারে না। ইহারা জলে বিচরণ করিত, এবং মৎস্য ইহাদের আহার ছিল। পাখীর দাঁত নাই তাহা তোমরা জান, কিন্তু এই অদ্ভুত পক্ষীর সরীসৃপের ন্যায় দাঁত আছে। ইক্থিয়র্নিস নামক আর এক প্রকার পক্ষীর অস্থিপঞ্জর পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি আয়তনে ছোট। ইহাদের পা খুব ক্ষুদ্র, কিন্তু পাখা খুব বড়। হেস্পার্নিসের ন্যায় ইহাদের দাঁত আছে।

* *
*

ইতর জন্তুদিগের ভাষা মানুষের বোঝা সম্ভব কি না, এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইতেছে। ফ্রেজার নামক একজন পণ্ডিত সম্প্রতি 'আর্কিয়ল-জিক্যাল রিভিউ' নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইতর জন্তুর ভাষা মানুষের বোঝা সম্ভব। ইতর জন্তুদের যে ভাষা আছে তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা যে শব্দ করিয়া থাকে তাহাতেই পরস্পরের মনের ভাব পরস্পরে বুঝিতে পারে। মনের ভাব যাহাতে ব্যক্ত হয়, তাহাই ভাষা। তবে মানুষে সে ভাষা বুঝিতে পারে কি না, সে কথা স্থির করা বড় সহজ নহে। কেহ যদি রীতিমত ইহাদের ভাষা অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে সফল হইলেও

হইতে পারেন। এবং কতক কতক যে এখনও মানুষে না বুঝিতে পারে, তাহা নহে। বৎসহারা গাভী যখন বাছুরকে ডাকে, তখন তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়। দরজা বন্ধ থাকিলে অনেক সময় পালিত বিড়ালগুলি এমন এক প্রকার শব্দ করে, যাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে ভিতরে আসিতে চাহিতেছে। প্রভুকে দেখিলে কুকুর মৃদু মৃদু শব্দ করিয়া যে মনের আনন্দ প্রকাশ করে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে; আবার অপরিচিত লোক দেখিলে সে যে বিপদের আশঙ্কা-সূচক শব্দ করে তাহাও আমরা বুঝিয়া থাকি।

* *
*

'Land and Water'—'জল ও স্থল' নামক এক খানি ইংরাজি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কোচিন-চায়না প্রদেশে যে মুর্গীর ডিম পাওয়া যায় সেগুলি খুব ভারি এবং আয়তনেও খুব বড়। ইহার এক একটী ডিম আদ্ পোয়ারও অধিক ওজনে হয় এবং ইহার পরিধি প্রায় নয় ইঞ্চি। আমাদের এদেশে রাজ-হাঁসের ডিমগুলি খুব বড় হইয়া থাকে। এই সকল ডিমের খোলা দ্বারা অনেক কাজ হইয়া থাকে। ছোট খোলা দ্বারা খুব উৎকৃষ্ট 'কার্বনেট্ অব্ লাইম' নামক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বড় বড় খোলার উপরে পূর্ব্বকালে প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি চিত্র করিবার রীতি ছিল, এবং নানা প্রকার কার্য্যে ডিমের খোলা সজ্জিত করিত। ইটালীর ভিনীস নগরে ইহার বড় আদর ছিল এবং সে স্থানের লোকেরা ইহার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিত। অষ্ট্রীচ্ পক্ষীর ডিমের খোলা রুপা দিয়া বাঁধাইয়া জল-পাত্র রূপে বড় লোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইমিউ নামক আর এক প্রকার আফ্রিকাদেশীয় পক্ষীর খোলাতেও জলপাত্র তৈয়ার হইয়া থাকে। আফ্রিকা দেশীয় স্ত্রীলোকেরাও অষ্ট্রীচের ডিমের খোলাতে জলপান করিয়া থাকে, এবং ইহা দ্বারা এক প্রকার বেশ হার প্রস্তুত করিয়া তাহারা গলায় পরিয়া থাকে।

* *
*

'Nature'—'প্রকৃতি' নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে, এক প্রকার বৃক্ষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বিলক্ষণ বৈদ্যুতিক শক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। হস্ত দ্বারা ইহার পাতা ছিঁড়িলে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রে হাত দিলে যে প্রকার লাগে, সেই প্রকার লাগিয়া থাকে। চুম্বক ইহার নিকট নীত হইলে, তখনই ইহার শক্তি প্রকাশ পায়। কিন্তু সকল সময়ে ইহার শক্তি সমান থাকে না। বেলা দুইটার সময় ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতে দেখা যায়। রাত্রিতে শক্তি কিছুমাত্র থাকে না। ঝড়ের সময় ইহার শক্তি অতিশয় বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু বৃষ্টির সময় ইহার শক্তি লোপ হয়। তখন ইহার পাতা ছিঁড়িলে কিছুমাত্র লাগে না। পাখী বা পোকা প্রভৃতি কখনই এই বৃক্ষের উপর বসিতে দেখা যায় না। তাহারা কেমন আপনা হইতেই বুঝিতে পারে যে, এ বৃক্ষের উপর বসিতে গেলে নিশ্চয়ই জীবন যাইবে। পৃথিবীর মধ্যে কত আশ্চর্য্য পদার্থ আছে কে জানে?

* *
*

গত বৎসর স্পেন্সার সাহেব এবং তাঁহার বেলুন কীর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে জানাইয়াছিলাম। তোমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবে, স্পেন্সার সাহেবের ন্যায় আমাদের দেশেরই এক ব্যক্তি—বাঙ্গালী এ বৎসর বেলুন আরোহণ এবং

প্যারাসুট লইয়া অবতরণ করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল, রাম বাবুর প্রতিমূর্ত্তি সহ তাঁহার জীবনী তোমাদিগকে উপহার দিব, কিন্তু সময়াভাবে তাঁহার চিত্র সংগ্রহ হয় নাই বলিয়া আমাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা থাকিল। প্যারাসুট লইয়া অবতরণ করা কতদূর কঠিন কার্য্য এবং কতদূর বিপদজনক তাহা তোমাদিগকে গত বৎসর বুঝাইয়াছি। ইহাতে যে অসম সাহস, ধৈর্য্য এবং কার্য্যকুশলতা দরকার তাহা অনেক ইংরাজেরও নাই। ইংরাজদের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই ইহা পারেন। একজন বাঙ্গালী এই অসম সাহসীক কার্য্যে সফল হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর সামান্য গৌরবের কথা নহে। বাঙ্গালী ভীরু বলিয়া সকলেরই কাছে ঘৃণিত, কিন্তু রাম বাবুর এই কার্য্যে বোধ হয় বাঙ্গালীর সে কলঙ্ক ঘুচিবে। গত ২২শে মার্চ্চ কলিকাতায় টিভলি গার্ডেনে রাম বাবু বেলুনে উঠিয়া প্রায় চারি হাজার ফিট উচ্চ হইতে, প্যারাসুট লইয়া অবতরণ করিয়াছেন। স্পেন্সার সাহেব তাঁহাকে একটী রৌপ্য পদক উপহার দিয়াছেন, এবং রাম বাবুকে অনেক প্রশংসাও করিয়াছেন। স্পেন্সার সাহেব রাম বাবুর শিক্ষাদাতা। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র লাহা নামক আর একজন বাঙ্গালীও ইতিপূর্ব্বে একদিন বেলুনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্যারাসুট লইয়া অবতরণ করেন নাই। শুনিতেছি তিনিও না কি প্যারাসুট লইয়া অবতরণ করিবেন।



কাশী।

কাশী একটী অতি প্রাচীন নগরী এবং হিন্দুদিগের পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। কাশী কলিকাতা হইতে ২৩৮ ক্রোশ এবং ভাগীরথীর তীরে সংস্থাপিত। কাশী সৃষ্টির বিষয়ে কথিত আছে যে, মহাপ্রলয়ের পর নারায়ণ বটপত্রে শয়ন করিয়া জলে ভাসিতে থাকেন। ভাসিতে ভাসিতে পুনরায় তাঁহার পৃথিবী সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল, তখন তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ হইতে শিব এবং বাম অঙ্গ হইতে অন্নপূর্ণা আবির্ভূতা হইলেন। আবির্ভূত হইয়া তাঁহারা মনে করিলেন যে, এমন একটী স্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে হইবে যেখানে মানুষ, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, জীব সকল, যে কোন পাপে পাপী হউক, মৃত্যু হইলে মুক্তিলাভ করিবে। তাঁহারা এই মনস্থ করিয়া পঞ্চক্রোশী কাশী নির্ম্মাণ করিলেন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে যে কোন স্থানে মৃত্যু হউক না, তৎক্ষণাৎ মুক্তি হইবে।

প্রাতঃকালে অপর তীর হইতে কাশীর শোভা অতিশয় মনোহর। দূর হইতেই আমরা প্রাতঃ সূর্য্যে আলোকিত কাশীর দেব মন্দিরের উচ্চচূড়া সকল দেখিতে পাইয়াছিলাম। ক্রমে যখন গাড়ী গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইল, তখন অরুণ কিরণে উদ্ভাসিত, কাশীর শোভা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। নূতন ডফারিণ ব্রীজের উপর দিয়া ক্রমে ক্রমে যখন আমাদের গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল তখন দেখিলাম, অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকায় কাশীর অসংখ্য ঘাট পরিপূর্ণ। সে সময়ের সে দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর।

কাশী হিন্দুদিগের সর্ব্ব প্রধান তীর্থ এবং হিন্দু-ধর্ম্মের অভেদ্য দুর্গ। কাশীতে যত দেব মন্দির আছে, এবং যত বিগ্রহ আছে ভারতে কোথাও আর এত নাই। দেখিলে বোধ হয় যেন কেবল দেব পূজার জন্যই নগরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ভিন্ন এই প্রাচীন নগরে এক সহস্রেরও অধিক দেব মন্দির আছে। ভাগী-রথীর তীর সমস্তই প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাটে শোভিত। দশাশ্বমেধ ঘাট অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ ঘাট। মণিকর্ণিকা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থ। কথিত আছে এক সময়ে বিষ্ণু চক্রের দ্বারা এক পুষ্করিণী খনন করিয়া নিজ শরীরের ঘর্ম্ম দ্বারা তাহা পূর্ণ করেন এবং তীরে বসিয়া পাঁচ সহস্র বৎসর শিবের আরাধনা করেন। নারায়ণের ঘোর তপস্যায় শিবের শিরঃকম্প হওয়ায় তাঁহার কর্ণ হইতে কর্ণের অলঙ্কার খসিয়া পড়ে। তাই এই স্থানের নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে। শিব নারায়ণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন, তখন নারায়ণ এই বর চাহিলেন যে, যে ব্যক্তি এই স্থানে মরিবে মৃত্যুর পর সে বৈকুণ্ঠে যাইবে। ইহার পর গঙ্গা মর্ত্ত্যে আসিয়া মণিকর্ণিকার সহিত মিলিত হই-লেন। হিন্দুদের ইহা পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। এই স্থানে মহাশ্মশান অবস্থিত, রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের কোপে পড়িয়া এই শ্মশানে চণ্ডালের দাসত্ব করিয়াছিলেন।

বেণীমাধবের ধ্বজা কাশীর যত মন্দির এবং অট্টা-লিকা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই স্থানে পূর্ব্বে একটী বৃহৎ মন্দির ছিল। হিন্দু বিদ্বেষী মোগল সম্রাট আরঙ্গজেব এই মন্দির ভগ্ন করিয়া, সেখানে এক মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বেণীমাধবের ধ্বজার উপর উঠিবার যে সিঁড়ি আছে তাহা দিয়া উপরে উঠিলে সমস্ত কাশী দেখিতে পাওয়া যায়।

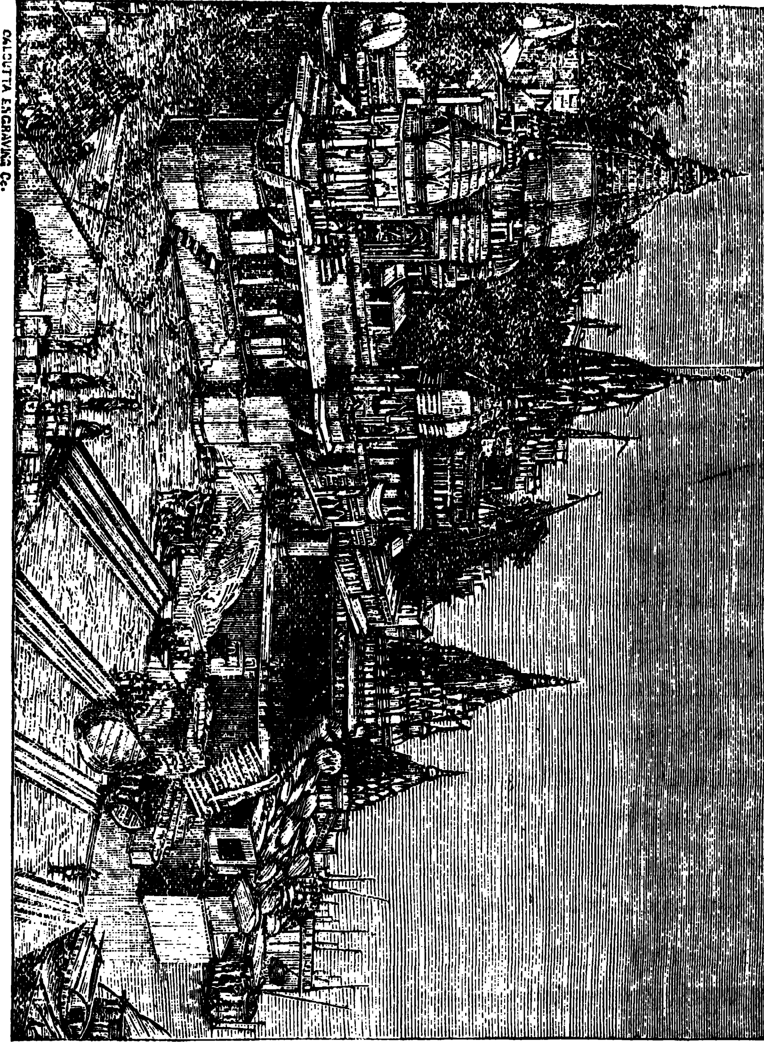
বিশ্বেশ্বরের মন্দির বারানসীর সমুদয় মন্দির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরের উপরিভাগ সমস্তই স্বর্ণমণ্ডিত। রঞ্জিত সিংহ বিশ্বেশ্বরের মন্দির সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। মন্দিরের মধ্যে রৌপ্য নির্ম্মিত একটী কুণ্ডে শিবলিঙ্গ স্থাপিত; তদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি বিগ্রহ দেখা যায়।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে "জ্ঞান বাপী"। এই জ্ঞানবাপী একটী কূপ; উপরটা চারিদিকে প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। বাপীর তলায় যাইবার সিঁড়ি আছে; ইহার তলা গঙ্গার সহিত সংলগ্ন। কথিত আছে যবনেরা যখন কাশীতে অত্যাচার আরম্ভ করেন, তখন মহাদেব এই বাপী দিয়া পলাইয়া রক্ষা পান।

মন্দিরগুলির মধ্যে অন্নপূর্ণার মন্দির বিশে-যতঃ দুর্গা বাড়ীর মন্দির দেখিতে অতি সুন্দর। অন্নপূর্ণার মন্দিরের মেজে শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং নাটমন্দিরের স্তম্ভগুলি সুন্দর চিত্রিত। দুর্গাবাড়ীর মন্দিরটী অতিশয় কারু-কার্য্যে পরিপূর্ণ। মন্দিরটী সমস্তই বড় প্রস্তরে নির্ম্মিত; প্রস্তরে খোদিত শিল্প ও কারুকার্য্য অতিশয় মনোহর।

কাশীর বিখ্যাত মানমন্দির হিন্দুদিগের জ্যোতিষ বিদ্যার পরিচয় দেয়। জয়পুরের মহারাজ মানসিংহ দুইশত বৎসরেরও অধিক হইল এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদিও ছিল, তাহা দ্বারা হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদির গণনা করিতেন। ইহার প্রায়ই বিলাতে চলিয়া গিয়াছে; এখন ভগ্নাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে।

কাশীর রাস্তাঘাটগুলি প্রায়ই অতি সংকীর্ণ এবং অতিশয় অপরিষ্কার। রাস্তাগুলি প্রায়ই প্রস্তর নির্ম্মিত এবং বাড়ী তিন চারি কখনও বা পাঁচ



ছয় মহল উচ্চ। কাশীতে অনেক বাঙ্গালীর বাস রহিয়াছে। বাঙ্গালীটোলায় থাকিলে বাঙ্গালা দেশে আছি কি উত্তর পশ্চিমে আছি, তাহা স্থির করা কঠিন। কাশী যেমন হিন্দুদিগের প্রধান এবং অতি পবিত্র তীর্থ স্থান তেমনি এখানে কুলোকেরও অভাব নাই। কাশীর গুণ্ডার কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। ইহারা সামান্য অর্থের লোভে লোকের প্রাণবধ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। রাত্রিতে নির্ভয়ে কাশীর রাস্তায় বাহির হওয়া যায় না। পূর্ব্বে ইহাদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচার ছিল। গবিন্স নামক একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনে ইহাদের অত্যাচার অনেক কমিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কাশীতে যেমন প্রকৃত ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত এবং জ্ঞানী লোক আছেন, তেমনি অসৎ চরিত্রের লোকেরও

অভাব নাই। কাশীতে যেমন একদিকে স্বর্গের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি আর একদিকে নরকের দৃশ্য দেখিয়া অতিশয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। তৈলঙ্গ স্বামীর মৃত্যুর কথা তোমরা শুনিয়াছ; এখন আর এক জন প্রসিদ্ধ পুরুষ আছেন তাঁহার নাম ভাস্বরানন্দ স্বামী। আমরা ইহাঁর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি এখন আর কাহারও সহিত দেখা করেন না।

কাশীর পিত্তলের কাজ অতিশয় মনোহর; ইহার কারু-কার্য্য অতিশয় প্রসিদ্ধ। "বানারসী-সাড়ী" এই খানেই তৈয়ার হয়; আমরা একদিন সাড়ী তৈয়ার কি প্রকারে করে, তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম।

কাশীর আর একটী জানিবার বিষয় এই যে, এখানে কেহ উপবাস করে না। এখানে কাঙ্গাল গরীব ভিক্ষুকের সংখ্যা নাই। কিন্তু অন্যদিকে তেমনি এখানে অসংখ্য অন্নছত্র আছে। বড় বড় রাজা জমিদারেরা কাশীতে অন্নছত্র দিয়া রাখিয়াছেন, সহস্র সহস্র গরীব দুঃখী প্রতিদিন এইখানে আহার পাইতেছে।

সিকরোলে সাহেবেরা থাকেন এবং আদালত প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের সমস্ত আফিস সেই খানেই অবস্থিত। কাশীর কলেজটী অতি সুদৃশ্য। সংস্কৃত ভাষার এবং হিন্দু দর্শনের আলোচনা কাশীর ন্যায় আর কোথাও হয় না।

কাশীতে বুদ্ধ দেবের কীর্ত্তি রহিয়াছে। এক সময়ে কাশীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জয় পতাকা উঠিয়াছিল। সারনাথের ভগ্ন মন্দিরই এখন একমাত্র বৌদ্ধ-কীর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে।

সতীশের মহত্ত্ব।

(একটী গল্প)

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার কোন একটী উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। বয়স ১০।১১ বৎসর হইবে; অতি শৈশবাবস্থায়ই পিতৃ বিয়োগ হয়। সতীশের পিতা রামকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একটী বড় আফিসে ২০০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার অমায়িকতা ও সৎস্বভাবের জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। রামকুমার বাবুর বয়ঃক্রম যখন ৭।৮ বৎসর তখন তাঁহার পিতা মাতা উভয়েরই কাল হয়। রামকুমারের আর কেহই ছিল না। দূর সম্পর্কের এক খুড়া তাঁহাকে লালন পালন করেন। রামকুমার যখন এণ্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন তখন তাঁহার এই খুড়ারও মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় রামকুমার লেখা পড়া শিক্ষা সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন। কে আর এখন তাঁহার খরচ চালাইবে। রামকুমার ক্লাশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। শিক্ষকেরা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। লেখা পড়া শিক্ষা যেরূপ ব্যয়সাধ্য তাহাতে সহজে রামকুমারের কোন উপায় হইল না। অনেক চেষ্টার পরে কলিকাতায় কোন বড় লোকের বাড়ীতে স্থান হইল বটে; কিন্তু সেখানে এক বেলা রান্না করিয়া খাইতে পড়িতে পাইতেন। স্কুলের অধ্যক্ষগণের কৃপায় স্কুলের মাহিয়ানা তাঁহার লাগিত না এবং

সমপাঠীদিগের দয়ায় পুস্তকাদির অভাবও অনেক পরিমাণে দূর হইত। এইরূপ কষ্টের মধ্যে পড়িয়াও রামকুমার দুই বৎসরের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৮৲ টাকা করিয়া একটী বৃত্তি পান। ইহার পরে এই বৃত্তির সাহায্যেই তিনি অনায়াসে এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; এবং তাহার কিছুদিন পরে ৫০৲ টাকা বেতনে এক আফিসে একটী কর্ম্ম পান। রামকুমারের মন খুব উদার ছিল। দুঃখ কষ্টের মধ্যে লালিত পালিত হওয়াতে পরের দুঃখমোচনে তাঁহার মন সহজেই ধাবিত হইত। কর্ম্ম পাওয়ার কিছুদিন পরে কন্যাদায়গ্রস্ত কোন সদ্বংশীয় গরিব ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী রূপে গুণে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার যোগ্যা ছিলেন। সর্ব্ব মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি রামকুমারে প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তাঁহার স্ত্রীও এসম্বন্ধে সর্ব্বাংশে তাঁহার সহধর্ম্মিণীই ছিলেন। আফিসে রামকুমারের ন্যায় যোগ্য লোক খুব কম ছিল; সুতরাং রামকুমারের উন্নতি খুব শীঘ্র শীঘ্রই হইয়াছিল।

সতীশের শৈশবাবস্থায় রামকুমারের হঠাৎ বিসূচিকা রোগে যখন প্রাণ বিয়োগ হয় তখন তাঁহার শ্বশুরেরও কাল হইয়াছে; সুতরাং সতীশের মাতার তত্ত্বাবধান করিতে আর কেহই ছিল না। সতীশকে বুকে করিয়া এবং ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই ভয়ানক শোক বহন করেন। রামকুমার যে কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন তদ্দ্বারা কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন। সতীশের মাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং স্বামীর যত্নে বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দররূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শিল্প কার্য্য ইত্যাদিও তিনি সুন্দররূপ জানিতেন। সতীশের যাহাতে ভালরূপ বিদ্যা শিক্ষা হয় এবং স্বভাব চরিত্রে সতীশ যাহাতে সর্ব্বাংশে তাহার পিতার তুল্য হয় তজ্জন্য সতীশের মাতা সর্ব্বদা ব্যগ্র ও যত্নবতী ছিলেন। ৮।৯ বৎসর পর্য্যন্ত সতীশের শিক্ষার ভার নিজের হাতেই রাখিয়াছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা ও গণিত সতীশের বয়সানুসারে তাহাকে অনেক বেশী সুন্দররূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সত্যে যাহাতে অনুরাগ জন্মে, ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি জন্মে, পরোপকারে ইচ্ছা জন্মে, সতীশের মাতা সতীশের মনোরঞ্জনের জন্য রামায়ণ মহাভারত হইতে সর্ব্বদা সেইরূপ উচ্চ ও মহৎ দৃষ্টান্তের গল্প করিতেন। সতীশ এক মনে সেই সমস্ত গল্প শুনিত। সেই পুণ্য কথা শুনিতে শুনিতে যুগপৎ তাহার নয়ন শোক ও আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হইত। সতীশ যেমন বড় হইতে লাগিল, মাতার শিক্ষা ও উপদেশগুণে তাহার সত্যানুরাগ, কর্ত্তব্যবোধ এবং ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সতীশের যাহাতে কোন কষ্ট না হয় তজ্জন্য সতীশের মাতা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি নিজ হাতে অনেক শিল্প ও কারুকার্য্যের জিনিস প্রস্তুত করিয়া দোকানে পাঠাইয়া দিতেন এবং তাহা হইতে যে কিছু আয় হইত তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ আনুকূল্য হইত। সতীশের ৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাহার মাতা তাহাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মাতার সৎশিক্ষায় ও অবিশ্রান্ত চেষ্টায় সতীশের বাল্যকালেই বিদ্যাভ্যাসে বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল; সুতরাং ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সতীশ বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিল এবং দুই বৎসরের মধ্যেই চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সতীশ ক্লাশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিল। তাহার সরল স্বভাব ও নির্ম্মল চরিত্রের গুণে শিক্ষকগণ তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন

এবং সমপাঠীরা সকলেই ভালবাসিত। সমপাঠীদের মধ্যে গোপাল নামে একটী ছেলের সঙ্গে সতীশের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। গোপাল বয়সে সতীশ অপেক্ষা কিছু বড় ছিল এবং তাহাদের বাড়ী সতীশদের বাড়ীর কাছেই ছিল। দুইজনে একত্র স্কুলে যাইত, একত্র স্কুল হইতে আসিত। গোপালের বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল ছিল। তাহার পিতা একজন ধনী লোকের মধ্যে গণ্য ছিলেন। গোপাল সতীশের মত কোমল প্রকৃতির লোক নহে। কিছু রাগী এবং দুর্দ্দান্ত ছিল; কিন্তু অন্যায় কিম্বা মিথ্যা প্রবঞ্চনা দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। এই কারণে অনেক ছেলে তাহার ভয়ানক শত্রু ছিল এবং যাহাতে গোপালের শাস্তি ও অনিষ্ট হয় শত্রু বালকের মধ্যে অনেকেরই অবিশ্রান্ত সেই চেষ্টা ছিল।

কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সতীশদের স্কুলের নিকটস্থ অন্য কোন স্কুলের নবীন নামে একটী ছেলের সঙ্গে গোপালের বিশেষ শত্রুতা জন্মে। নবীন কোন প্রসিদ্ধ ধনী লোকের পুত্র। গোপালের উপর সে এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, বিশেষ কোনরূপ প্রহার দ্বারা গোপালের হাত পা ভাঙ্গিয়া চিরকালের জন্য যাহাতে তাহাকে নিরস্ত রাখিতে পারে এই চেষ্টায় সর্ব্বদা ফিরিত। এক দিবস স্কুলের ছুটির পর সতীশের একটু দেরী হওয়ায় সে গোপালের সঙ্গে একত্র বাহির হইতে পারে নাই; কিন্তু কিছু পথ খুব জোর পায়ে চলে এ'সে সতীশ দেখিতে পাইল গোপাল কিছু অগ্রেই যাইতেছে। পশ্চাৎ হইতে গিয়া হঠাৎ গোপালের চক্ষু চাপিয়া ধরিবে এই অভিপ্রায়ে পিছনে পিছনে চুপে চুপে চলিয়া আসিতেছিল। এই সময় তাহারা একটী নির্জ্জন গলি দিয়া যাইতেছিল। গোপালের খুব নিকটে আসিয়াছে এমন সময়ে দেখিতে পাইল যে, পার্শ্বস্থ একটী ছোট গলি হইতে হঠাৎ কে আসিয়া এক খানি বড় লাঠি দ্বারা গোপালকে আঘাত করিল। প্রথম আঘাতেই গোপাল ঘুরিয়া পড়িয়া গেল; এবং দ্বিতীয়বার আঘাত করিবার পূর্ব্বেই সতীশ দৌড়াইয়া গিয়া প্রহারকারীর যষ্টি ধরিল। বলা বাহুল্য যে, প্রহারকারী গোপালের শত্রু সেই দুর্দ্দান্ত বালক নবীন। নির্দ্দয় নবীন এখন গোপালকে ছাড়িয়া সতীশকে মারিতে উদ্যত হইল। সতীশ আত্মরক্ষার্থ তাহার হাতে যে লিখিবার শ্লেট ছিল তদ্দ্বারা নবীনের মাথায় আঘাত করিল। শ্লেটের এক কোণের আঘাত মাথায় লাগায় মাথা হইতে বেগে রক্ত বাহির হইতে লাগিল, এবং নীবন হত ও অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সতীশ ছেলে মানুষ; এই বিষম ব্যাপারে হতবুদ্ধি এবং কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রাণভয়ে বাড়ী পলায়ন করিল। আসিবার সময় পথে অনেকবার তাহার মনে হইয়াছিল—"ফিরিয়া যাই, ফিরিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া দেখাই এবং যাহাতে কাহারও প্রাণহানি না হয় তাহার চেষ্টা করি।" সতীশের মনে এ কথা কখনই উদয় হয় নাই যে, তাহার আঘাতে গোপালের শত্রু নবীনের প্রাণ গিয়াছে। আঘাত খুব জোরে না লাগিলেও মাথার এমন স্থানে লাগিয়াছিল যে, সঙ্গেই সেই হতভাগ্য দুর্দ্দান্ত বালকের প্রাণ বিয়োগ হইল। সতীশ মনে নানারূপ চিন্তা করিয়া শেষে ভয়ে ও ত্রাসে অভিভূত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসাই স্থির করিল এবং অবিলম্বে বাড়ী পৌছিয়া মাতার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। মাতা শুনিয়া ভয়ে ও ত্রাসে অস্থির হইয়া পড়িলেন; এবং কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সতীশ আসার পরেই গোপালের চৈতন্য

হইয়াছিল। উঠিয়াই সম্মুখে তাহার শত্রুর মৃতদেহ দেখিয়া গোপাল পুনরায় মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইল। কিয়ৎকালের মধ্যেই তথায় লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। পুলিশ ইত্যাদি আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। সমস্ত সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল গোপাল মারামারি করিয়া একটী বড় লোকের ছেলের প্রাণবধ করিয়াছে; এবং হত্যা অপরাধে পুলিশে চালান গিয়াছে।

এ সংবাদ সতীশের মাতার কর্ণে পৌছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি সতীশকে কোলে নিয়া এক মনে সকল দুঃখ ক্লেশহারী হরিকে ডাকিতে লাগিলেন। গোপাল সতীশকে সে দিন তাহার পশ্চাতে দেখিতে পায় নাই; সুতরাং কে এ প্রাণহানির কাজ করিয়াছে কিছুই জানে না। কেবল বারম্বার বলিতে লাগিল যে, সে নিজে একাজ করে নাই, কে করিয়াছে জানে না। সে যে নিজে প্রহারিত হইয়া চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথা খুব কম লোকেই বিশ্বাস করিল। পুলিশের কর্ম্মচারীগণ প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, গোপাল ইচ্ছা পূর্ব্বক না করিলেও মারামারি করিতে করিতে নবীনের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। নবীনের সঙ্গে যে তাহার শত্রুতা ছিল তাহাও প্রমাণ হইল। মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষেই বড় বড় উকিল কৌন্সিলী নিযুক্ত হইল প্রথম দিন বিচারে সাব্যস্ত হইল গোপাল হইতে এই কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ব্বক ইহা করে নাই। সকলেই বলিতে লাগিলেন বহুকালের জন্য কারাবাস হইবে। তাহার বাড়ীতে হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল। সতীশের মা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সকল খবর লইতেছিলেন। তাঁহার কর্ণে সমস্ত বৃত্তান্তই পৌছিল। তাঁহার সতীশের জন্য নিরপরাধীর এ ভয়ানক শাস্তি হইবে, একটী পারিবার একেবারে শোক সাগরে ভাসিবে এ কথা মনে করিতেও তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। সতীশেরও কিছু শুনিতে বাকি ছিল না। তাহার অপরাধে প্রিয়বন্ধু গোপালের কারাবাস হইবে এ কথা শুনিয়া সতীশ উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিল। নয়নদ্বয় হইতে অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

বিচারের দ্বিতীয় দিবস সকালে সতীশ তাহার মাতার গণ্ডদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"মাগো এ সব কি শুনিতেছি, আমি আর থাকিতে পারি না। আমার জন্য আমার বন্ধুর কারাবাস হইবে এ আমার অসহনীয়। গোপালের এ হত্যাকাণ্ডে কোনই দোষ নাই, সে নিজে প্রথম তাহার শত্রু কর্ত্তৃক অজ্ঞাতসারে আক্রান্ত হইয়া হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল; অথচ আমার কার্য্যের জন্য সে কারাবাসী হইতে চলিয়াছে। তাহা কখনই হইবে না। আমি আজ বিচারালয়ে গিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিব। আমি ইহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া বলিব যে গোপালের কোন দোষ নাই, সে জানেও না যে, আমি আত্মরক্ষা করিতে গিয়া এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড করিয়াছি। বাল্যকাল হইতে তোমার মুখে রামায়ণ মহাভারতের অনেক পুণ্যকথা শুনিয়াছি;—আজ এই পুণ্যসঞ্চয়ে আমাকে বাধা দিও না।" সতীশের মুখে এই পুণ্যকথা শুনিয়া সতীশের মাতার নয়নে পুণ্য সলিল দেখা দিল, বারম্বার সতীশের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—"বাবা, তোমার মহত্ত্ব ও সততা দেখিয়া, তোমার পুণ্যকথা শুনিয়া আজ আমার জীবন সার্থক হইল। যাও বাবা, তোমার বন্ধুকে রক্ষা কর গিয়া, তোমার পিতার নাম উজ্জ্বল কর গিয়া। আমি যদি কায়মনোবাক্যে ভগবানের

পূজা করিয়া থাকি নিশ্চয় তিনি তোমার সহায় হইবেন। যাও বাবা, সতীশ, তোমার এ মহৎ কাজে আমি অন্তরায় হইব না। ভগবান তোমার সহায় হউন।” যথাসময়ে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে সতীশ বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। বিচারের রায় দিবার সময় উপস্থিত, গোপালের যে কারাবাস হইবে, এক প্রকার স্থির হইয়াছে; এমন সময় ভিড় ঠেলিয়া সতীশ বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আদ্যন্ত সমস্ত খুলিয়া বলিল। হত্যার অপরাধ নিজের স্কন্ধে নিয়া বারম্বার বলিতে লাগিল যে, গোপাল কিছুই জানে না। আরও বলিল যে সে পশ্চাৎ হইতে ওরূপ যে হঠাৎ দৌড়িয়া আসিয়াছিল কাহাকেও আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় নহে, কেবল গোপালের প্রাণরক্ষার জন্য। কিন্তু যখন দেখিল যে সেই দুর্দ্দান্ত আক্রমণকারীর লাঠি তাহার মস্তকের উপর উত্তোলিত হইয়াছে তখন হতবুদ্ধি ও দিক্‌বিদিক্‌শূন্য হইয়া কেবল আত্মরক্ষার্থ সে নবীনের মস্তকে হস্তস্থিত শ্লেটের আঘাত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঐ আঘাতে এরূপ প্রাণহানি হইবে তাহা তাহার মনে হয় নাই। এ লোমহর্ষণ ব্যাপার কেবল নিতান্ত দুর্দৈববশতই ঘটিয়াছে। সতীশ সাশ্রুনয়নে সকাতরে এই সমস্ত ঘটনা বিচারককে বুঝাইয়া বলিল, এবং গোপালকে সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়া এই হত্যাকাণ্ডের অপরাধ নিজ স্কন্ধে নিয়া বিচারকের কৃপার উপর আত্মসমর্পণ করিল। বিচারালয়ের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলেই উৎকর্ণ হইয়া সতীশের মুখে সেই হত্যাকাণ্ডের আমূল বৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন। তাহার কথা শেষ হইলে সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল গোপাল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, এবং সতীশেরও কিছু মাত্র অপরাধ নাই, কেবল সেই দুর্দ্দান্ত নবীনের দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সতীশের এই সাধু ব্যবহারে ও মহত্ত্বে বিচারকের প্রাণ গলিয়া গেল। চতুর্দ্দিক হইতে সতীশের আত্মসমর্পণের সাধুবাদ হইতে লাগিল। বিচারক পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া গোপালকে ও সতীশকে সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং নিতান্ত দুর্দৈববশতঃ এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

গোপালের পিতা সতীশকে আসিয়া চুম্বন করিলেন এবং বারম্বার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সতীশের মাতার নিকট অতি সত্বর সমস্ত খবর পাঠাইলেন; এবং সতীশকে সঙ্গে নিয়া গিয়া গোপালকে ও সতীশকে গৃহিণীর কোলে দিয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন—“তোমার এক ছেলে হারাইবে বলিয়া উন্মাদিনী হইয়াছিলে, প্রভুর ইচ্ছায় এখন দু'টাকে কোলে নিয়া সুখী হও, এবং সেই মঙ্গলময়কে বারম্বার ধন্যবাদ দেও।” পৃথিবীতে সতীশের এতদিন কেবল এক মাত্র মা ছিল, ঈশ্বর ইচ্ছায় তাহার এখন অনেক বন্ধু বান্ধব যুটিল; এবং তাহার সকল দুঃখ দূর হইল। সে দিন বাড়ী গিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সতীশ বলিল—“মাগো, আমি ফিরে এসেছি, এতদিন তুমিই আমার এক মাত্র মা ছিলে; এখন আমার আর এক মা হইয়াছে, আরও কত বন্ধু বান্ধব হইয়াছে।” মাতা বলিলেন—“বাবা, যিনি দিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দেও। সকলই সেই দয়াময়ের ইচ্ছা।”

ডোরথি উইগুলো প্যাটীসন।



জগতে কিছুই চিরদিন থাকে না। বিন্দু বিন্দু জল-পাতে প্রস্তর ক্ষয় হয়; তিল তিল করিয়া মহা সমৃদ্ধ-শালী রাজ্যও লোপ পায়। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে কত রাজ্য উঠিল, কত রাজ্য লয় পাইল, ইতিহাসের পাঠক তাহা জান। প্রতিদিন কত অসংখ্য মানুষ জন্মিতেছে, আবার কত অসংখ্য মানুষ মরিতেছে;—চিরদিন কেহ থাকে না। কিন্তু একটী পদার্থ চিরদিন জগতে অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে, চির-প্রবহমান কাল-স্রোতে তাহাকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। ফুলটী ফুটিয়া দুই দিনের জন্য আপনার সৌন্দর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করে, তারপর দুই দিন পরে শুকাইয়া ঝরিয়া যায়। সৌন্দর্য্য শুকাইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার সুগন্ধ যায় না। এ জগতে কিছুই থাকে না;

চির-প্রবহমান কাল-স্রোতে সকলই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু থাকে কেবল কীর্ত্তি। মানুষ মরিয়া যায়, কিন্তু কীর্ত্তি চিরকাল সজীব রহে। দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক হইল বুদ্ধদেব ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য আজিও অবিনশ্বর রহিয়াছে। খৃষ্ট গিয়াছেন, তাঁহার জলন্ত বিশ্বাস ও নির্ভর আজিও জীবন্ত রহিয়াছে। চৈতন্য গিয়াছেন, তাঁহার প্রেম ও ভক্তি আজিও সজীব রহিয়াছে। চির-প্রবহমান কাল-স্রোতে সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়; একমাত্র কীর্ত্তি অবিনশ্বর হইয়া চিরকাল জগতে রহে। এই অবিনশ্বর কীর্ত্তির উজ্জ্বল আলোক ধীরভাবে চারিদিকে জ্বলিতেছে। যাঁহারা এই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে পারেন জগতে তাঁহাদের নামও অবিনশ্বর হইয়া রহে। আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, তাই আলোক দেখিয়াও দেখি না এবং তাই জগতের পোনের আনা লোকের মৃত্যুর সহিত সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আজ আমরা আর একটী মহিলার জীবনের কথা তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, ইনি আর ইহলোকে নাই, কিন্তু ইহাঁর কীর্ত্তি ইহাঁকে জীবিত রাখিয়াছে, এবং চিরদিনই তাহা অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে। এই মহিলা 'ভগিনী ডোরা' নামে প্রসিদ্ধ। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ১৬ ই জানুয়ারী ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্কসায়রের হক্সওয়েল নামক স্থানে ডোরথি উইণ্ডলো প্যাটীসনের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা মার্ক প্যাটীসন বহুকাল পর্য্যন্ত হক্সওয়েলের ধর্ম্ম যাজকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। হক্সওয়েল গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র এবং একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের এক পার্শ্বে অবস্থিত। ঘন তরুলতা বেষ্টিত একটী নির্জ্জন স্থানে মার্ক প্যাটীসনের আশ্রম তুল্য ক্ষুদ্র গৃহ। ডোরথি মার্ক প্যাটীসনের সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা। পিতার এই শান্তিময় গৃহে ডোরথির বাল্যকাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। বাল্যকালে ডোরথি অতিশয় রুগ্ন ছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে রীতিমত লেখা পড়া করিতে দেওয়া হয় নাই। সুশিক্ষিত ধর্ম্ম-পরায়ণ পিতামাতার দৃষ্টান্তে যে শিক্ষা হইতে পারে, তাহা তাঁহার বাল্যকালেই হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় প্রখর ছিল, যাহা একবার শুনিতেন তাহাই শিখিতে পারিতেন। জ্যেষ্ঠ ভাই ভগিনী-দের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের পাঠাভ্যাস শুনিয়া শুনিয়াই তিনি বিস্তর শিক্ষা করেন। ডোরথি যে মহৎ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, বাল্যকালে তাঁহার কোন কার্য্যে তাহার কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তবে রোগযন্ত্রণায় সহিষ্ণুতা এবং দুঃখ কষ্টে মনের প্রফুল্লতা রক্ষা করিতে তিনি বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রমাগত রোগ ভোগে লোকের প্রকৃতি বিকৃতি হইয়া যায়; কিন্তু ডোরথি ক্রমাগত রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও, এক দিনের জন্যও তাঁহার ভাই ভগিনী বা আর কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হন নাই। তিনি ক্রমাগত উৎকট রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রমেই অধিকতর সহিষ্ণু এবং ধীর হইয়া উঠিলেন, ধীর ও শান্তভাবে রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে শিখিলেন।

ক্রমশঃ।



বিড়াল।

বিড়ালকে সাধারণ লোকে বাঘের মাসি বলিয়া থাকে। বিড়াল ও বাঘ একজাতীয় জীব, তাহাতেই এই প্রবাদ জন্মিয়া থাকিবে।

প্রাচীন মিশরে বিড়ালের বড় মান্য। তথায় বিড়ালের পূজা হইত। মিশরবাসীদিগের পাষ্ট দেবীর প্রতিমূর্ত্তি একটী স্ত্রীলোকের ন্যায়; কিন্তু তাহার মাথা ও মুখ বিড়ালের মত। আমাদিগের দেশেও বিড়াল ষষ্ঠী দেবীর বাহন বলিয়া পূজিত। বোধ হয় পাষ্ট ও ষষ্ঠী পূজকেরা পূর্ব্বকালে একত্র বাস করিতেন, কাল ক্রমে ভিন্ন দেশে যাইয়া বাসস্থান স্থাপন করিয়াছেন।

এক সময়ে বিড়ালের প্রতি এই সম্মান জন্য মিশরবাসীদিগের বড় ক্ষতি হইয়াছিল। আসিয়া মহাদেশ হইতে মিশরে প্রবেশ করিবার পথে পেলিউসিয়াম নামক একটী নগর ছিল। এই নগরে উহাদিগের একটী সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। পারস্যের সম্রাট বহুদিন হইতে মিশর আক্রমণের চেষ্টায় ছিলেন। তিনি এক নূতন চতুরতায় পেলিউসিয়াম নগর হস্তগত করিলেন। মিশরবাসীগণ যে জাতীয় বিড়াল পূজা করে তিনি সেই জাতীয় অনেক বিড়াল সংগ্রহ করিলেন; এবং তাহাদিগকে আপন সৈন্যদলের পুরোভাগে স্থাপন করিয়া পেলিউসিয়াম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পবিত্র বিড়াল আহত হইবে এই ভয়ে পেলিউসিয়ামবাসীগণ একবারেই অস্ত্র চালনা করিতে পারিল না। সুতরাং পারস্য সম্রাট নির্ব্বিবাদে নগর অধিকার করিলেন।

কোন সময়ে এক জন রোমক অসাবধানতা বশতঃ মিশর জাতির পূজিত এক বিড়ালের প্রাণবধ করিয়াছিল। সেই সময়ে রোমক জাতির এমন ক্ষমতা ও প্রাধান্য ছিল যে, পৃথিবীর কোনও জাতি রোমকদিগের গায়ে হাত তুলিতে সাহস করিত না। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত মিশরবাসীগণ ক্রোধে অধীর হইয়া বিড়াল হন্তার প্রাণ সংহার করিল। তজ্জন্য রোম ও মিশর উভয় দেশে অনেকদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল।

মধ্য যুগে বিড়ালের প্রতি লোকের ভারি বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। লোকে বিশ্বাস করিত ভূত ও প্রেতযোনি সময়ে সময়ে কাল বিড়ালের রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। সে সময়ে যদি কেহ কাল রঙ্গের বিড়াল পুষিত ও বিড়ালটী বেশ বুদ্ধিমান হইত, তবে তাহার সহজে নিস্তার ছিল না। রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে বিড়াল ও প্রতিপালক উভয়েরই প্রাণদণ্ড হইতে পারিত।

আরবদিগের মধ্যে বিড়ালের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে। এক খানি আরবি পুস্তকে লিখিত আছে যখন পৃথিবী জলে প্লাবিত হইয়াছিল তখন নোয়া নামক এক ব্যক্তি এক সুবৃহৎ নৌকায় সমুদায় প্রাণীর এক এক দম্পতি লইয়া সেই জলরাশির উপর ভাসিতেছিল। ক্রমে নৌকায় ইঁদুরের উপদ্রব এত বৃদ্ধি হইল যে তিষ্ঠান ভার হইল। তখন নোয়া যাহাতে ইঁদুরের এই বংশ বৃদ্ধির হ্রাস হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটী সিংহ নৌকার পাটাতনের উপর পড়িয়া হাত পা ছুড়িতে লাগিল; এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিড়ালরূপ ধারণ করিয়া ইঁদুরের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিল। আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণ অবশ্যই বিড়ালের এ প্রকারে উৎপত্তি বিশ্বাস করিবেন না।

পূর্ব্বকালে ফ্রান্স দেশে একজন সম্ভ্রান্ত লোক

কোন অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কারাগারে জন প্রাণীর সাক্ষাৎ পাইতেন না। একদিন একটী বিড়াল জানালা দিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল, তিনি মিষ্ট কথায় তাহাকে এমন বশীভূত করিলেন যে, বিড়ালটী প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার নিকট আসিত। বিড়ালেরা বড় সঙ্গীত-প্রিয়। ক্রমে ঐ বিড়াল তাঁহার এমন অনুগত হইল যে, তিনি সীস্ দিলে বিড়াল যেখানেই থাকুক ছুটিয়া আসিত। ক্রমে বন্ধুতা আরও বাড়িয়া গেল। বিড়াল প্রায়ই বাহির হইতে নানা প্রকার পাখী শিকার করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিত; এবং এই প্রকারে কারাগারে আবদ্ধ হইয়াও এই বিড়ালের প্রসাদে তিনি রসনার কষ্টটা কতক নিবারণ করিতেন।

ফরাসী মন্ত্রী রিস্লুর একটী প্রিয় বিড়াল ছিল। যখন তিনি রাজকার্য্য করিতেন বিড়ালটী তাঁহার পরিচ্ছদের উপর সুখে শুইয়া থাকিত। অনেক সময়ে বাটীতে অভ্যাগত উপস্থিত হইলে তিনি ক্রোড়ে শায়িত বিড়ালের ঘুম ভাঙ্গিবার ভয়ে বসিয়াই তাহার অভ্যর্থনা করিতেন।

এ সকল ছাড়া বিড়ালের আদরের আরও অনেক গল্প আছে। আজ আর একটী মাত্র বলিয়া গল্পের উপসংহার করা যাক।

রিস্লুর সময়ের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে হোয়েল নামক জনৈক ওয়েল্সের রাজকুমার বিড়ালদিগের অনুকূলে একটী আইন পাশ করিয়াছিলেন। যে কেহ বিড়াল চুরি করিত তাহাকে তাহার সম্পত্তির কিয়দংশ রাজ ভাণ্ডারে দণ্ড দিতে হইত। দণ্ডের পরিমাণ এইরূপ—বিড়ালটীর লেজ ধরিয়া যদি এরূপে তুলিয়া ধরা যায় যে, তাহার মুখ মাটি ঘেঁসিয়া থাকে; তবে যে পরিমাণ স্বর্ণে বিড়ালের লেজের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হইতে পারে, তাহাই এই অপরাধের দণ্ড।



ব্যাধ বালক একলব্য।

ইংরাজিতে একটী কথা আছে "Where there is a will there is a way" অর্থাৎ ইচ্ছা থাকিলে উপায়ও আছে। ফলতঃ ইচ্ছার সঙ্গে যদি অধ্যবসায়, যত্ন ও পরিশ্রমের সংযোগ হয়, তবে পৃথিবীতে এমন কোন কাজই হইতে পারে না যাহা সুসম্পন্ন না হয়। অনেক বালকের দেখিয়াছি পড়িবার বেশ প্রবৃত্তি আছে অথচ বিদ্যালয়ে পড়া বলিতে পারে না, ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল অধ্যবসায়ের অভাব। পড়িবার সময় অন্য মনস্কতা বড় খারাপ। যাহাতে পড়িবার সময় মন অন্যদিকে না যায় তাহা করা বালকদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। পড়ার উপর খুব যত্ন থাকাও বিশেষ দরকারী। বিদ্যাশিক্ষা ত উচ্চকথা সামান্য কার্য্যও যত্ন না করিলে হয় না। আমরা আজ মহাভারত হইতে একটী ব্যাধ বালকের বাল্য-জীবনী তোমাদিগকে বলিব। ইহাতে তোমরা দেখিতে পাইবে অধ্যবসায় গুণে অতি দুষ্কর কর্ম্মও সহজ হয়।

তোমরা সকলেই জান যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-ভ্রাতা

অতি অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রও জন্মান্ধ ছিলেন—কাজে কাজেই পিতামহ ভীষ্মের হস্তেই তাঁহাদের শিক্ষার ভার পতিত হয়। ভীষ্ম দ্রোণ নামক এক ধনুর্বিদ্যাবিশারদ বহুদর্শী ব্রাহ্মণের হস্তে তাহাদিগের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি এক শত পুত্র ছিল, তাহারাও দ্রোণের নিকট শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। এই সময় ভারতবর্ষে যত যোদ্ধা ছিল, তন্মধ্যে তিন জনের নাম মাত্র উল্লেখ যোগ্য, কারণ তাহাদের সমকক্ষ যোদ্ধা আর ছিল না, প্রথম—পরশুরাম, দ্বিতীয়—ভীষ্ম, তৃতীয়—দ্রোণাচার্য্য। ভীষ্ম পরশুরামেরই শিষ্য, যাহা হউক দ্রোণাচার্য্যের নিকট কুরুপাণ্ডবেরা ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু একশত পঞ্চ শিষ্যের মধ্যে অর্জ্জুন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছিল বলিয়া আচার্য্য মহাশয় তাহাকে অধিক স্নেহ করিতেন এবং বিশেষ যত্নের সহিত তাহাকে নানাবিধ বাণ প্রয়োগ প্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কুরু পাণ্ডবদিগের মধ্যে দ্রোণ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র অশ্বত্থমাও শিক্ষালাভ করিতেছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন আচার্য্য মহাশয়ের পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল। যে বালক ভাল, মনোযোগী ও শিক্ষকের বাধ্য এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করে, তাহাকে শিক্ষক মহাশয় ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না, সে বালক শিক্ষকের প্রাণ-তুল্য হইয়া দাঁড়ায়, তাই বলি সখার পাঠক পাঠিকাগণ, তোমরা যদি গুরু মহাশয়ের ভালবাসা পাইতে চাও, তবে স্বভাবটী সরল ও পবিত্র কর; শিক্ষক মহাশয় যাহা উপদেশ দেন তাহা মনোযোগ দিয়া শুন; তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখ; নির্দ্দিষ্ট পাঠ নিয়মমত অভ্যাস কর; গুরু মহাশয়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সমস্ত কার্য্য কর; দেখিবে তিনি তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবেন না। আর এটা সর্ব্বদা মনে রাখিও যে দুষ্ট বালক শিক্ষকের চক্ষুশূল।

এইরূপে অর্জ্জুন অন্যান্য ভ্রাতা অপেক্ষা অনেক শিখিয়া ফেলিলেন। কেহ তাঁহার সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক অর্দ্ধেকও শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। যখন দ্রোণাচার্য্য কুরু বালকদিগকে শিক্ষা দানে রত ছিলেন, সেই সময় একটী সুন্দর তেজস্বী বালক শিক্ষার্থী হইয়া হস্তিনায় আগমন করে, আচার্য্য মহাশয় তাহার জাতি কুল জানিতে পারিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হইলেন। বালক ম্লানমুখে, সতৃষ্ণ নয়নে আচার্য্য মহাশয়কে দেখিতে দেখিতে প্রস্থান করিল, তাহার সেই শান্ত মূর্ত্তি ও ধীর গমন দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

তোমরা হয়ত বুঝিতে পার নাই কেন আচার্য্য মহাশয় এই সুন্দর বালকটীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন না। সে দরিদ্র, অর্থ দিতে অসমর্থ, এই জন্যই কি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেল? না তাহা নহে—সেকালে গুরু মহাশয়েরা বিদ্যা দান করিতেন—বিদ্যা বিক্রয় করিতেন না। তবে দ্রোণাচার্য্য মহাশয় নীচ জাতীয় ব্যাধ বালককে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া বড় অপমানের বিষয় মনে করিয়াছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকের বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্র নিষিদ্ধ ছিল, এইজন্য কেহই নীচ জাতীয়দিগকে শিক্ষাদান করিতেন না, এখন যেমন উচ্চ নীচ জাতিভেদ না মানিয়া সকলেই সমান অধিকারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে—তখন ওরূপ কেহ করিলে সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইত। প্রসঙ্গ ক্রমে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল,

রামায়ণে যে রামের কথা পড়িয়াছ তিনি যখন রাজা ছিলেন তখন নীচ-জাতীয় এক ব্যক্তি দণ্ডকারণ্যে তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রামচন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া তাহার শিরচ্ছেদ করেন। দেখ কত বড় অন্যায় কথা! নীচ-জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহার ধর্ম্মে পর্য্যন্ত অধিকার থাকিবে না, যাহা হউক সুখের বিষয় যে এখন ইংরাজের মুল্লুকে আর ওরূপ নিয়ম প্রচলিত নাই।

ব্যাধ বালক ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেল, কেহই তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিল না, সে কোথায় গেল, কি করিল, কেহই তাহার সন্ধান লইল না, এদিকে কুরু বালকেরা ধনুর্ব্বিদ্যায় বেশ নিপুণতা লাভ করিলেন। তাহাদের যুদ্ধ কৌশল দেখাইবার জন্য এক দিন মৃগয়ার আয়োজন করা হইল। নিরীহ বন্য পশু বধ করাই মৃগয়ার প্রধান উদ্দেশ্য, এখনও সাহেবদের মধ্যে এবং অনেক ধনী বাঙ্গালীদের মধ্যে পশু শিকার বেশ প্রচলিত আছে। শিকার আর মৃগয়া একই কথা, বন্য হিংস্র জন্তু বধ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ বাসীদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য হিংস্র পশু হনন অনেক সময় দরকার হয় বটে, কিন্তু যে সকল পশু কখন মানুষের অপকার করে না তাহাদিগকে বধ করা বড় নিষ্ঠুরের কার্য্য, কুরু বালকেরা এই নিষ্ঠুর কার্য্যে স্বীয় স্বীয় যুদ্ধ কৌশল দেখাইবার জন্য অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া গুরু দ্রোণাচার্য্যের সহিত গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ।



প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

আহার বিজ্ঞান। শ্রীযুক্ত রসিক লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত। এখানি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক; নিরামিষ আহার শরীরের পক্ষে উপকারী ইহাই এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। আমরা ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন।

প্রেম বন্ধন। শ্রীযুক্ত নটেন্দ্রভূষণ মজুমদার প্রণীত। পুস্তকখানী আমাদিগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত গ্রন্থকারকে জানাইতেছি যে, আমরা তাঁহার অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না। কারণ যে পুস্তক বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে আমরা কেবল সেই সকল পুস্তকই সমালোচনা করিয়া থাকি। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই; স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব আছে।

পত্র ও প্রবন্ধ প্রেরকদিগের প্রতি।

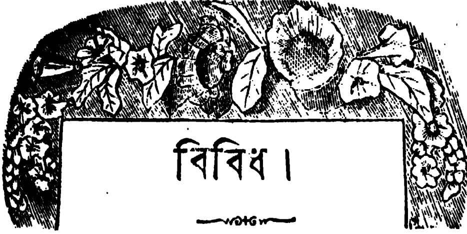
শ্রীনীলকণ্ঠ দত্ত। টাকীর জমিদার সুরেন্দ্র মৃত্যু উপলক্ষে একটী পদ্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। পদ্যটী আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না;

কুমারী রেবা বাই, কটক। আপনার পদ্যটী আগামীবারে দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, গোলাঘাট। পদ্যটী প্রকাশিত হইবে না। লিখিবার আগে শিখিতে হয়, না শিখিয়া লেখা ভাল নয়। বিশেষ পদ্য লেখা বড় কঠিন। ছন্দ বলিয়া একটা পদার্থ আছে, তাহা না জানিলে পদ্য লিখিতে যাওয়া উচিত নয়।



এপ্রিল, ১৮৯০।



বিবিধ।

এক জন পাড়াগেঁয়ে চাষা লোক কলিকাতায় টেলিগ্রাফ পাঠাইবে বলিয়া টেলিগ্রাফের "ফরমে" কাহাকেও দিয়া সংবাদ লিখাইয়া তাহার গ্রামের নিকটস্থ কোন টেলিগ্রাফ আফিসে লইয়া আইসে। টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরক বা 'সিগ্‌নালার' তাহার নিকট হইতে ন্যায্য পয়সা লইয়া তারে সংবাদ পাঠাইয়া সেই "ফরম" খানি ফাইলে গাঁথিয়া ঝুলাইয়া রাখিল। সেই চাষা লোক সেখানে দুই ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া রহিল, তখন টেলিগ্রাফের বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন আর দাঁড়াইয়া আছ কেন? সে বলিল, 'মশাই খবরটা পাঠান হ'ল কিনা, দেখে যেতাম।' বাবু বলিলেন, 'খবর কখন্ পাঠান হইয়া গিয়াছে।' সে বলিল, "আজ্ঞে আমরা চাষা ভুসো লোক, লেখা পড়া জানি না বলে কি এমনিই বোকা—কাগজে লেখা খবরটা ত টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন, আর বলিতেছেন খবর পাঠাইয়া দিয়াছেন। চাষার সঙ্গে কেন ঠাট্টা করেন?"

* *
*

কোন বাবু তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে যাইয়া দেখেন তাঁহার বন্ধুর দশ বৎসরের পুত্র কাঁদিতেছে। তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "বাজার থেকে একটা চুরুট কিনিয়া আনিয়া তাহা ধরাইয়া টানিতেছিলাম এমন সময়ে বাবা আসিয়া"—বলিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল।

বাবু—"বাবা তাই খুব উত্তম মধ্যম দিয়েছে?"

বালক—"আজ্ঞে না—বাবা আমাকে গা'ল দিয়া চুরুট কাড়িয়া লইয়া নিজে সবটা খাইয়া ফেলিয়াছেন।"

* *
*

কোন "প্রদর্শনীর" দরজায় এক গোরা কনেষ্টবল পাহারা ছিল। দর্শকেরা আপন আপন ছড়ি বাহিরে রাখিয়া যেন ঘরে প্রবেশ করেন,—এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক সাহেব দুই পকেটে হাত গুঁজিয়া গড্ গড্ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন,—গোরা অমনি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আপনার ছড়ি কোথায়"—সাহেব বলিলেন, "আমারত ছড়ি নাই।" গোরা বলিল "তবে আপনি ফিরিয়া গিয়া একটা ছড়ি লইয়া আসুন নতুবা ঘরে প্রবেশ করিতে দিব না।"

* *
*

মাছি ফেলা। আমরা যেমন দুধের বাটীতে মাছি পড়িলে, হয় মাছি ফেলিয়া দুধ খাই না হয় সে দুধ ফেলিয়া দি, সেইরূপ ইউরোপের নানা দেশে এই সম্বন্ধে নানা রকম প্রথা দেখা যায়।

মদের গেলাসে মাছি পড়িলে রুষিয়ারলোকেরা মাছি তুলিয়া মদ পান করে। হঙ্গারির লোকেরা মাছি না তুলিয়া ফেলিয়াই পান করে কিন্তু এরূপ ভাবে চুমুক দেয় যে মাছি মুখের ভিতর আসে না, বরং খালি গেলাসের তলায় পড়িয়া থাকে। তুরস্কবাসী মদে কি পড়িয়াছে না পড়িয়াছে তাহা বড় গ্রাহ্য করে না, সব সমেত পান করে। আমেরিকাবাসী আঙ্গুল দিয়া মাছি তুলিয়া মদ খায়। ইংরাজেরা চামচ দ্বারা মাছি তুলিয়া ফেলে। ইটালীয়েরা মাছি সুদ্ধ খানিকটা মদ ঢালিয়া ফেলে তৎপরে বাকীটুকু খায়। ফরাসীরা গেলাসের সমস্তটা ফেলিয়া দেয়। জর্ম্মণেরা তাড়াতাড়ি মাছিটাকে তুলিয়া নানা উপায়ে তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করে; এইরূপ আপন হৃদয়ের দয়া বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া তাহার পর মদ্য পানে অগ্রসর হয়।

* *
*

লণ্ডন নগরের মহত্ব। দৈর্ঘে প্রস্থে লণ্ডন পৃথিবীর সকল নগর অপেক্ষা বড়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকাও যে অন্য কোন নগর অপেক্ষা হীন তাহা বোধ হয় না।

এইখানে চারি মিনিট অন্তর একজন করিয়া জন্মগ্রহণ করে। তোমরা এই সংবাদ পাঠ করার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে ৩০টী শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে ও ২০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে জানিবে। প্রত্যহ ৩৬০ জনের জন্ম ও ২৪০ জনের মৃত্যু হয়। লণ্ডন যেমন একদিকে অতিশয় আনন্দে বিহ্বল হয় তেমনি অপর দিকে গভীর শোক বিষাদে অবসন্ন হয়।

লণ্ডনে সাড়ে তিন হাজার ক্রোশব্যাপী পথ আছে, অর্থাৎ সব পথগুলি এক সঙ্গে যোড়া দিয়া এক লাইনে রাখিলে ৩॥০ হাজার ক্রোশ লম্বা হয়। লণ্ডনের পথে যদি প্রত্যহ ১০ ক্রোশ হিসাবে চল তবে প্রায় এক বৎসর ক্রমাগত হাঁটিলে সমস্ত পথ হাঁটা হইবে। আর যদি তুমি তেমন হাঁটিয়ে না হও, হাঁটিতে হাঁটিতে যদি ঘন ঘন তৃষ্ণা পায় তবে এত পথ হাঁটিতে ভীত হইও না, এই ৩॥০ হাজার ক্রোশ পথের ধারেই ৩৭ ক্রোশের অধিক বিস্তৃত পানাগার আছে অতএব তৃষ্ণার কথা ভাবিও না।

এক বৎসরে লণ্ডনের লোকেরা পাঁচ লক্ষ বলদ, কুড়ি লক্ষ ভেড়া, দুই লক্ষ বাছুর, তিন লক্ষ শূওর, আশি লক্ষ হাঁস-মুরগী ইত্যাদি, বাষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ মাছ, পাঁচ লক্ষ কাঁকড়া, দুই লক্ষ বড় বড় চিংড়ি উদরসাৎ করে। অঙ্ক দেখিয়া ভয় পাইও না—এখনও ইহা ছাড়া কত ফল মূল, শাক সব্জী, গম ও অন্যান্য শস্য ইহাদের পেটে যায় তাহা বলি নাই।

তার পর পাছে এতগুলি খাবার তাদের গলায় বাধিয়া যায় সেই জন্য মাঝে মাঝে গলা ভিজাইয়া লইবার আবশ্যক হয়। যাহাতে গলায় না বাধিয়া সহজে পেটে ঢোকে সেজন্য বিশ কোটী বোতল বীয়ার মদ ইহারা পান করে। ইহা ব্যতীত কেবল পানের জন্য এক কোটী বোতল "রম" সরাপ ও পাঁচ কোটী বোতল অন্যান্য মদ সব সুদ্ধ ছাব্বিশ কোটী বোতল মদ পান করে।



ব্যাধ বালক একলব্য।

(৪৮ পৃষ্ঠার পর।)

(৪৮ পৃষ্ঠার পর।)

কত সুন্দর সুন্দর হরিণ শিশু অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল তাহার সংখ্যা করা যায় না। পশুদিগের কাতর শব্দে সমস্ত বন পরিপূর্ণ হইল, এই সময় একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। একটী কুকুরের মুখের ভিতর অনেকগুলি ফলাহীন বাণ রহিয়াছে, কুকুর ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইতেছে এবং বাণগুলি মুখ হইতে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু গলার ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে বলিয়া সহজে ফেলাইতে পারিতেছে না। তোমরা হয়ত মনে করিতেছ একটা কুকুরের মুখে কতকগুলি বাণ ; এ আবার আশ্চর্য্য কি ? আর দেখিবার বা ভাবিবার বিষয়ই বা কি যে কুরু বালকদিগের ইহাতে কৌতূহল হইল? আমি বলি এতে খুব আশ্চর্য্যের বিষয় আছে এবং তাহা দু এক কথায় তোমাদিগকে বুঝাইব।

মনে কর, তুমি হা করিয়া আছ আমি তোমার অজ্ঞাত সারে একটী মার্ব্বেল তোমার মুখে ফেলিয়া দিলাম তুমি তখন কি করিবে? হা করিয়াই থাকিবে না মুখ বন্ধ করিবে ? নিশ্চয়ই তোমাকে না জানাইয়া শুনাইয়া তোমার মুখ আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু তোমার মুখে একটী মার্ব্বেল ফেলিয়া দেওয়ায় তুমি মুখ বন্ধ করিতে না করিতে যদি আমি আর একটী মার্ব্বেল তোমার মুখে দিতে ইচ্ছা করি তবে আমাকে কত তাড়াতাড়ি সেই কাজটী করিতে হয় ? আর যদি দুইটীর স্থলে কুড়ি পঁচিশটী মার্ব্বেল তোমার মুখে ঢুকাইতে হয় তবে আমাকে যে কত শীঘ্র শীঘ্র তাহা করিতে হইবে একবার ভাবিয়া দেখ! কুকুরের মুখেও সেইরূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমন কি চখের পলক ফেলিতে যে সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে ৩০।৪০টী বাণ কুকুরের মুখ-বিবরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পিতামহ ভীষ্মদেবও খুব তাড়াতাড়ি বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। তোমরা হয়ত মহাভারতে পড়িয়াছ যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, প্রতিদিন দশ সহস্র পাণ্ডব সৈন্য বধ করিবেন। অর্জ্জুন কিন্তু খুব সতর্ক থাকিতেন, তবুও ভীষ্ম তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেন। এক দিন অর্জ্জুন কপালের ঘাম মুছিতে ছিলেন, এই অবসরে ভীষ্ম দশ সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া দশ সহস্র পাণ্ডব সৈন্য বিনাশ করেন। আর একদিন অর্জ্জুন মুখ ফিরাইয়া ভীমের যুদ্ধ দেখিতে ছিলেন এই অল্প সময়ের মধ্যে ভীষ্ম তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করেন, যাহাই হউক কথাগুলি অতিশয়োক্তি হইলেও তখনকার যোদ্ধারা যে বাণ নিক্ষেপে লঘুহস্ত অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

দ্রোণাচার্য্য মহাশয় কুকুরকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। বনের মধ্যে এমন কোন্ বীর আসিয়াছে যাহার এমন বাণ শিক্ষা আছে ? অর্জ্জুনও এরূপ লঘুহস্ত নহেন, তখন সকলেই মৃগয়া পরিত্যাগ করিয়া সেই বীরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর সকলে দেখিতে পাইলেন এক বট-বৃক্ষ তলে এক বালক, সম্মুখে একখানি মৃণ্ময় মূর্ত্তি রাখিয়া অনন্য-মনে নানা প্রকার বাণ নিক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করিতেছে। তাহার দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের

চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, তাহার সেই সময়ের সেই অনুকরনীয় মধুরভাব দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সে কে এবং নির্জ্জন বনে একাকী কি করিতেছে জানিবার জন্য স্বয়ং দ্রোণাচার্য্য তাহার সম্মুখীন হইলেন। বালক দ্রোণকে তাহার সম্মুখে দেখিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং যোড়-হস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি দ্রোণের প্রতিমূর্ত্তি, তখন বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া দ্রোণাচার্য্য জানিলেন, যে ব্যাধ বালক কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিল এ সেই এবং ইহার নাম একলব্য, দ্রোণাচার্য্যের নিকট বিফল মনোরথ হইয়া, দ্রোণের মূর্ত্তি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করতঃ নির্জ্জনে একমনে আপনা আপনি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, দ্রোণাচার্য্যের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিই তাহার গুরু স্থানীয়। সে বলিল দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তির নিকট হইতে অনেক প্রকার ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, কুকুরের কথায় সে বলিল যে, কুকুর ডাকিয়া ডাকিয়া তাহাকে বড় ত্যক্ত করায় সে তাহার মুখের মধ্যে কতকগুলি বাণ নিক্ষেপ দ্বারা তাহার ডাক বন্ধ করিয়াছে। কুকুরকে সে বধ করে নাই কেন জিজ্ঞাসায় উত্তর করিল "আমি ব্যাধের ঘরে জন্মিয়াছি বটে এবং জীবহিংসা আমাদের ব্যবসায় বটে কিন্তু আমি বাল্যকাল হইতেই অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানি, অকারণে জীবহত্যা করা দূরে থাকুক কোন সামান্য প্রাণীকেও কষ্ট দিব না সংকল্প করিয়াছি।"

দ্রোণাচার্য্য ব্যাধ বালকের কথায় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গুরু-দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন, একলব্য গুরুকে কি দক্ষিণা। তাঁহার অভিপ্রেত জিজ্ঞাসা করিল দ্রোণাচার্য্য কিন্তু স্বীয় প্রাণাধিক শিষ্য অর্জ্জুনের হিত কামনায় এবং নিজের কথা বজায় রাখিতে একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। একলব্য দুঃখিত মনে গুরুকে স্বীয় অঙ্গুলিদ্বয় প্রদান করিয়া চির-জীবনের জন্য বাণ নিক্ষেপে অক্ষম হইয়া রহিল।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে দ্রোণ কেন এমন জঘন্য কাজ করিলেন। কিন্তু তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "আমি তোমাকে আমার শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান করিব।" এখন একলব্যও তাঁহার শিষ্য হইল, একলব্য অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, সুতরাং একলব্যের অঙ্গহীন করা তাঁহার নির্দ্দয় হৃদয়ের একমাত্র বাসনা হইল। দ্রোণাচার্য্যের নিন্দনীয় কার্য্যের সমালোচনা আমরা করিব না, আইস আমরা একলব্যের বিষয় একটু চিন্তা করি।

প্রথমতঃ—দেখ একলব্য ব্যাধের ছেলে, তবুও তাহার ব্যাধের মত স্বভাব ছিল না, সে জীব হিংসাকে মনের সহিত ঘৃণা করিত। পরমেশ্বরকে যে একবার অন্তরের ভিতর স্থান দিতে পারিয়াছে, সমস্ত কার্য্যে যে পরমেশ্বরের হস্ত দেখিতে পায়, সুখ-দুঃখ বোধ আমাদেরও যেমন ইতর প্রাণীরও তেমন ইহা যে একবার বুঝিয়াছে সে যেরূপ পরিবারেই প্রতিপালিত হউক তাহার পিতা মাতার স্বভাব যেমন হউক না কেন, সে কখনও নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—একলব্য স্বীয় অধ্যবসায়ের গুণে অন্যের নিকট সাহায্য না পাইয়াও কেমন ধনুর্ব্বিদ্যায় পটুতা লাভ করিয়াছিল। তোমরাও একলব্যের মত অধ্যবসায়-শীল হও। অধ্যবসায়ের নিকট অতি কঠিন কাজও খুব সহজ হয়, একাজ করিতে পারিব না যেন কখনও তোমাদের মনে না হয়, আর যাহা করিবে তাহা মন দিয়া খুব

যত্নের সহিত করিবে, প্রথমে হয়ত কঠিন বোধ হইবে কিন্তু যত কায়মনে চেষ্টা করিবে ততই সহজ হইবে।

তৃতীয়তঃ—একলব্যের গুরু-ভক্তি, গুরুর অনুচিত প্রার্থনাও সে পালন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তোমরা হয়ত মনে ভাবিতেছ একলব্য বোকা ছিল, নৈলে কে নিজের বুড় অঙ্গুলি দুটী গুরুকে প্রদান করে, যদি এমন মনে করিয়া থাক তবে তাহা উচিত হয় নাই। গুরুর প্রতি অটল ভক্তি না থাকিলে কখনও লেখা পড়ায় উন্নতি লাভ করা যায় না, গুরুমহাশয় যাহা বলিবেন তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিবে। আমরা আশা করি সখার পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে সকলেই একলব্যের মত গুরু-ভক্তি পরায়ণ হইবে।



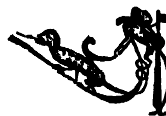
ভাল বাসা চাও যদি নিজে ভাল হও।

দাদা দিদি পাঠশালাতে মা নাইকো ঘরে।
আজ আমি দেখ্‌বো খুঁজে কে আছে ভিতরে॥
কাল আমাকে কীল তুলেছে আজ লইব শোধ।
এক কীলে তার নাক ছেঁচিব নাম তবে সুবোধ॥
ভাবিয়া সুবোধচন্দ্র টেবিলে উঠিল।
আয়না খানির সম্মুখেতে আঁটিয়া বসিল॥
এক কীলেতে সুবোধ যাই নাক ছেঁচিতে যায়।
দুষ্ট ছেলে কীল তুলিয়া কট্‌মটিয়া চায়॥
পেটের পীলে চম্‌কে উঠে সুবোধ সরে পাছে।
দেখে চেয়ে দুষ্ট ভয়ে চুপটি ক'রে আছে॥
ক্রোধেতে বীর চূড়ামণি চোখ রাঙিয়ে চায়।
নির্লজ্জ বালক সেও ক্রোধে চোখ রাঙায়॥
দাঁত খিঁচিয়ে সুবোধ যাই মুখভঙ্গি করে।
সে দুরন্ত দাঁত খিঁচিয়ে তেম্‌নি ভাব ধরে॥
ক্রোধে বসা আর হ'লনা লাফ্‌ দে পড়ে বীর।
একবারেতে রান্নাঘরে মার কাছে হাজির॥
"মা, মা, মা দৌড়ে এস কে এসেছে ঘরে।
মারিতে চায় আরো আমায় মুখ ভঙ্গি করে॥
আয়না খানির আড়ালেতে লুকিয়ে আছে সে।
দৌড়ে এস নইলে পরে পালিয়ে যাবে যে॥"
আদরে মা কোলে লয়ে মিষ্ট স্বরে কয়।
কে এসেছে কইরে বাছা কেহই তো নয়॥
তোরি ছায়া দর্পণেতে পড়েছিল অই।
যা করেছ তাই দেখেছ কে এসেছে কই॥
ভাল যদি বাস্‌তে তারে সেও ভাল বাসিত।
হাসি পেলে হাসিমুখে সেও কথা কহিত॥
পরের বিরাগ কেন কোলে টেনে লও।
ভালবাসা চাও যদি নিজে ভাল হও॥



সাপ।

(গোখুরা)

রতবর্ষে যত প্রকার সাপ আছে তাহার মধ্যে গোখুরাই ভয়ানক। কেউটে ও গোখুরা একই জাতীয়। অন্যান্য সাপে ও গোখুরা সাপে শারীরিক গঠনে এই প্রভেদ যে ইহাদের মাথার নিকটে গলার কাছে প্রায় গোটা কুড়ি পাঁজর

খুব লম্বা, এবং সেই পাঁজরের আবরণ মাংস ও চর্ম্ম খুব বিস্তৃত। এই বিস্তৃত চ্যাটাল অংশকে ফণা বলা যায়। গোখুরা ইচ্ছামত এই ফণা কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। এই ফণার উপর দিকে গোরুর খুরের মত বা একজোড়া বড় চসমার মত দাগ আছে, এই দাগ হইতেই ইহার নাম গোখুরা হইয়াছে।



বিখ্যাত ডাক্তার স্যার জোসেফ বলেন, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ২০,০০০ লোক সাপ, কুম্ভীর ও বন্য জন্তুর হাতে মারা যায়, ইহার মধ্যে কেবল সর্পাঘাতেই ১৭,০০০ লোক মারা যায়। ইহার অর্দ্ধেক আবার শুদ্ধ গোখুরা সাপের কামড়েই মরে।

হিমালয় হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্রই গোখুরা সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক স্থানে এত অধিক পরিমাণে থাকে, যে লোকের বিছানার লেপের মধ্যে, জুতার ভিতরে, এমন কি ভাতের হাঁড়ির মধ্যেও পাওয়া যায়।

গোখুরাকে সকলেই ভয় করে। ঘোড়া স্বভাবতঃই গোখুরা হইতে দূরে থাকে। একটা গোখুরা দেখিলে দলকে দল গোরু বা মহিষ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে থাকিবে। এমন কি ব্যাঘ্রও ইহার ভয়ে ভীত। কোন ভদ্রলোক খাঁচার ভিতর একটা বড় বাঘ পুষিয়াছিলেন, সেই বাঘটা মাঝে মাঝে এমন চীৎকার ও লম্ফ ঝম্ফ করিত যে, সময়ে সময়ে তাহাকে খুব প্রহারের আবশ্যক হইত। একদিন কেহ একটা মৃত গোখুরা বাঘের খাঁচার ভিতর ছুঁড়িয়া ফেলে। সাপটা খাঁচার শীকে বাধিয়া ঝুলিতে থাকে। বাঘটার ভয়ে আপাদমস্তক কাঁপিতে থাকে। তখন সে এক কোণে জড়সড় হইয়া কপালের উপর একখানি পা তুলিয়া যেন মাথাটা রক্ষা করিতেছে এইরূপ ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যতক্ষণ সেই মরা সাপটা ঝুলিতেছিল ততক্ষণ বাঘের সব প্রতাপ ও বীরত্ব ঘুরিয়া গিয়াছিল।

একবার এক সাহেব তাঁহার পালিত বাঁদরের গলায় একটা মরা গোখুরা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, ইহাতেই বাঁদরটা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

সকল সময়েই গোখুরার জিত হয় না। এক জন ইন্দুর ও গোখুরার যুদ্ধ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঘরের জানালা হইতে এই যুদ্ধ দেখিতে পান। সাপটা বড় আস্তে আস্তে ঘোরা ফেরা করিতেছিল। ইন্দুরটা খুব চালাক চতুর চট্‌পটে। ইন্দুরটা যেখানে সেখানে সাপটাকে কামড়াইতেছিল। সাপটার ঘুরিতে ফিরিতেই যেন ছয় মাস যায়। সাপ যেই কামড়াইতে আইসে ইন্দুরটা অমনি লাফ দিয়া অপর দিকে পড়িয়াই সাপের গায়ে কামড় মারে। অনেকক্ষণ পরে সাপটা একটা ছোঁ মারিতে পারিয়াছিল। তখন ইন্দুরটা যেন নিশ্চয় বুঝিতে পারিল তাহার মৃত্যু নিকটে, অমনি নির্ভয়ে সাপের কাছে গিয়া তাহার গলা কামড়াইয়া ধরিল আর ছাড়িল না,

সাপটা কত চট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল ইন্দুর কিছুতেই ছাড়িল না। অবশেষে উভয় যোদ্ধাই মরিয়া রহিল।

গোখ্‌রা এত ভয়ানক সত্ত্বেও অথবা এত ভয়ানক বলিয়া আমাদের দেশের সাপুড়েরা সাপের খেলা দেখাইবার জন্য গোখ্‌রা সাপই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। অবশ্য অন্য কোন সাপের "বাজি" করিবার ক্ষমতা নাই। গোখ্‌রা কেমন ফণা ধরিয়া বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দুলিতে থাকে, অন্য কোন সাপ এরূপ করে না। সাপুড়েরা সাপকে মন্ত্র দ্বারা বশীভূত না করুক সাপের বিষ যেখানে থাকে সেই দাঁত ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করে।

সব বিষধর সর্পের বিষ উপরের চোয়ালে বড় বড় দুইটা দাঁতের গোড়ায় থলিয়ার ভিতর থাকে। এই থলিয়ার ভিতর বিষ জন্মায়। দাঁতে লম্বালম্বি এপার ওপার সরু ছিদ্র আছে আর সেই ছিদ্র বিষের থলিয়ার সহিত সংযুক্ত. সাপ যখনই ক্রুদ্ধ হইয়া কামড়ায়, তখনই থলিয়ার মধ্য হইতে বিষ দাঁতের ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া ক্ষত স্থানে প্রবেশ করে।

সকল সাপের বিষ সমান তীব্র নহে। গোখ্‌রা সাপের বিষ ভয়ানক তীব্র। ইহার কামড়ে ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ৫।৬ সেকেণ্ডের মধ্যেই মরিয়া যায়। মানুষ ৫ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়। ইহার বিষ ছুঁচের মাথায় করিয়া গায়ে প্রবেশ করাইয়া দিলেই মানুষ অজ্ঞান হইয়া যাইতে পারে।

বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ ফ্রাঙ্ক বক্‌লাণ্ড সাহেব বলেন "আমি এক দিবস জুলজিক্যাল্‌ গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়া দেখি একটা ইন্দুরে ও গোখুরায় খাঁচার ভিতর যুদ্ধ হইতেছে। সাপ ইন্দুরকে কামড়াইতে আসিলেই ইন্দুরটা সাপকে ডিঙ্গাইয়া অপর পার্শ্বে গিয়া পড়ে ও সাপকে দুই এক কামড়ও দেয়। খানিক পরে দেখিলাম ইন্দুরটা এককোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অল্পক্ষণ পরে মরিয়া গেল। ইন্দুর এরূপ হঠাৎ কেন মরিল, সাপটা ইন্দুরকে কোথায় কামড়াইয়াছে দেখিবার জন্য খাঁচা হইতে ইন্দুরটাকে একটা কাটি দিয়া টানিয়া বাহির করিলাম। চারিদিক নাড়িয়া চাড়িয়া কোথাও কামড়ের দাগ দেখিতে পাইলাম না। তৎপর উহার শরীরের ভিতরের অবস্থা কিরূপ হইয়া গিয়াছে, দেখিবার জন্য পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া উহার দেহ ছেদ করিতে লাগিলাম, সমস্ত চামড়া ছাড়াইলে দেখিতে পাইলাম উহার উরুর নিকট ছুঁচে ফুটানের ন্যায় কাল দুইটী কামড়ের দাগ আছে। তখন বুঝিলাম এই কামড়েই ইন্দুর মরিয়াছে, সাপটা কিন্তু ভাল করিয়া কামড়াইতে পারে নাই। ইন্দুরের শরীর শক্ত হইয়া আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইন্দুরের পেট চিরিবার সময়ে ছুরির দ্বারা আমার নখের আগা একটু ছড়িয়া যায়. তখন সে বিষয়ে অত মনোযোগ করি নাই কিছুক্ষণ পরে আমার আঙ্গুলটা বড় ব্যথা করিতে লাগিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল মাতালের মত টলিয়া পড়িতে লাগিলাম, আমার সঙ্গে আমার একজন বন্ধু ছিলেন তাঁহাকে বলিলাম আমাকে শীঘ্র নিকটস্থ কোন ঔষধালয়ে লইয়া চল, আমায় ঠেলিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইলে, আমি যাইতে অসম্মত হইলে বা টলিয়া পড়িলে, বা বসিতে বলিলে কোন মতেই ছাড়িবে না আমাকে দাঁড় করাইয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাইবে, যাহাতে আমি চলি তাহাই করিবে। ক্রমেই আমি চলিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলাম, আমার মাথা টলিয়া

পড়িতে লাগিল, আমার বন্ধুকে বলিলাম আর চলিতে পারিতেছি না। আমার বন্ধু অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং আমার এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার করুণা হইতে লাগিল, আমাকে টানিয়া হেঁচরিয়া লইতে তাঁহার দয়া হইতে লাগিল, তবে তাঁহার বুদ্ধিকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে বসিতে না দিয়া শীঘ্র শীঘ্র ঠেলিতে ঠেলিতে নিকটস্থ এক ঔষধালয়ে লইয়া গেলেন, সেখানকার ঔষধ বিক্রেতা আমাকে শোয়াইয়া কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন, সেরূপ করিলে আমার মৃত্যু নিশ্চয় হইত। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার ঔষধের আলমারি হইতে কোন তীব্র ঔষধ বাহির করিয়া তাহার এক গেলাস আমি খাইতে না পারিলেও বল পূর্ব্বক খাওয়াইতে বলিলাম আমার বন্ধু তাহাই করিলেন ও সেই ঘরে আমায় হাঁটাইতে লাগিলেন। সেই ঔষধ আরও দুই তিন বার খাওয়ার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। পর দিবস সমস্ত হাতখানি ফুলিয়া উঠে তারপর তিন সপ্তাহ পরে আরোগ্য লাভ করি।

এই বিষ কি ভয়ঙ্কর! সামান্য মাত্র বিষ ইন্দুরের দেহে সঞ্চালিত হইয়াছিল, আমার ছুরির দ্বারা আঙ্গুলে একটু ছড় যাওয়ায় ইন্দুরের রক্ত এক অনুমাত্র আমার শরীরে সঞ্চালিত হইয়াছিল তাহাতেই যমের দুয়ার দেখিয়া আসিলাম।

ইহাদের বিষ অত্যন্ত তীব্র হইলেও অনায়াসে খাইয়া ফেলা যায়। সাপের বিষ গিলিয়া ফেলিলে কোন ক্ষতিই হয় না। তবে রক্তের সহিত সঞ্চালিত হইলেই মারাত্মক হয়। সাপ যখনই কামড়ায় তখনই সেই স্থান নির্ভয়ে চুষিয়া ফেলিলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা। তবে মুখে বা দাঁতের গোড়ায় ঘা কিম্বা অন্য কোন ক্ষত থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা। ডাক্তার ফেরার মুরগী ও অন্যান্য পক্ষীর শরীরে সাপের বিষ সঞ্চালিত করিয়া বিষের তীব্রতা পরীক্ষা করিয়াছিলেন সেই বিষে মৃত মুরগীগুলি লইয়া তাঁহার খানসামারা আহার করিত, তাহাদের কিছুই হয় নাই।

সাপকে আত্মহত্যা করিতে দেখা গিয়াছে। কোন সাহেব আমেরিকার "র‍্যাটেল স্নেক্" নামক বিষধর সর্পের পৃষ্ঠে লৌহ সলাকা বিদীর্ণ করিয়া মাটির সহিত গাঁথিয়া রাখেন। সাপ ক্রোধে ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সলাকাকে বেষ্টন করিয়া নিজের শরীরে দন্ত প্রবেশ করাইয়া দিল। সেই স্থানটা আঠার ন্যায় বিষে চট্‌চটে হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার বেষ্টন শিথিল হইয়া গেল, নিস্পন্দ হইয়া দুই মিনিটের মধ্যে মরিয়া গেল। তাহার মৃত দেহ ছেদ করিয়া দেখা গেল যে, তাহার রক্ত জলের ন্যায় বর্ণ বিহীন হইয়া গিয়াছে। অনেকে বলে সাপের নিশ্বাসে বিষ থাকে সেটা বড় ভুল কোন সাপের নিশ্বাসেই বিষ থাকে না সাপের বিষ রক্তে সঞ্চালিত না হইলে কোন ক্ষতিই হয় না।

মানুষে সাপকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া নাচায়। সাপও সময়ে সময়ে মানুষকে ও পশুদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। তোমরা শুনিয়া থাকিবে সাপে গোরুর বাঁট হইতে দুধ চুরি করিয়া খায়। কোন বাবুর গোরু দুই বেলাই প্রচুর দুধ দিত। হঠাৎ এক দিন বৈকালে দুহিয়া তাহার দুধ পাওয়া গেল না। তাঁহারা মনে করিলেন গোরু যখন মাঠে চরিতেছিল তখন কেহ তাহার দুধ দুহিয়া লইয়া থাকিবে। পর দিবসও বৈকালে দুধ পাওয়া গেল না। তখন চোর ধরিবার জন্য তাঁহারা সতর্ক রহিলেন। বাড়ীর নিকটে যে মাঠে গোরু চরিত সেই খানে

তাঁহারা লুকাইয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে দেখিতে পাইলেন, গোরুটা মাঠে এক ধার হইতে অপর ধারে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে একটা প্রকাণ্ড সাপ বাহির হইয়া গোরুর পিছনকার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বাঁটে মুখ দিয়া দুধ পান করিতে লাগিল। সাপটা যতক্ষণ দুধ পান করিতেছিল, গোরুটা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল। বাবু এই ব্যাপার দেখিয়া আসিয়া পরদিন গোরুকে বাঁধিয়া রাখিলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে গোরুটা খুব ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, দড়ি ছিঁড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহারা গোরুটাকে ছাড়িয়া দিলে সে দৌড়িয়া সেই মাঠে সাপকে দুধ খাওয়াইতে গেল।

আমেরিকার মিস্থরি প্রদেশের ফ্রাঙ্কলিন্



কাউন্টি নামক স্থানে কোন গৃহস্থ সপরিবারে বাস করিত। তাহাদের এক কন্যা ছিল, ক্রমেই তাহার শরীর শীর্ণ হইতেছিল, অবশেষে অস্থিচর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে বাড়ীতে আহার করিত না, তাহার পিতা মাতাও কোন ক্রমে তাহাকে বাড়ীতে আহার করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারিতেন না। তাহার আহারের সামগ্রী রুটী মাখন বা যাহা কিছু হইত তাহা লইয়া নদীর তীরে যাইত ও তথায় দুই তিন ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিত। অবশেষে তাহার পিতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক দিবস সে নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া খাবার চাহিল। তাহাকে খাবার দেওয়া হইলে সে

তাহা লইয়া পুনরায় নদীর ধারে গেল। তাহার পিতা গুপ্তভাবে তাহার পিছনে পিছনে গেলেন। অত্যন্ত শঙ্কার সহিত দেখিলেন একটী প্রকাণ্ড সর্প তাঁহার কন্যার ক্রোড়ে মুখ বাড়াইয়া তাহার হাত হইতে রুটী ও মাখন খাইতেছে। কন্যা নিজে খাইবার চেষ্টা করিলেই সাপটা ফোঁস ফোঁস করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে থাকে, আর কন্যা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ সাপকেই সব খাইতে দেয়। পিতা ভয়ে স্পন্দহীন হইয়া অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সাপ সেই শব্দ শুনিয়া বনের মধ্যে পলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কন্যা পিতার কোন কথার উত্তর দিতে সমর্থ হইল না অথবা উত্তর দিতে পারিল না। তৎপরে গৃহের সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ করিল যে, পর দিবসও কন্যাকে নদীর ধারে যাইতে দেওয়া হইবে তাহা হইলে সাপ খাবার লোভে বাহির হইবে এবং সেই সুযোগে তাহাকে মারিয়া ফেলা যাইবে। পরদিবস কন্যা খাবার লইয়া নদীর ধারে গেল, যেই সাপটা বাহির হইল অমনি কন্যার পিতা তাহার মাথায় গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। কন্যা তাহা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলেও বারে বারে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল, অবশেষে দুই দিবসের মধ্যে সেও মরিয়া গেল।

ঠাকুরমার গল্প।

অনেকেই অবগত আছেন ছেলেবেলায় ঠাকুরমার রূপকথা কতদূর আনন্দদায়ক। সন্ধ্যার পর ঠাকুরমা যখন তাঁহার হাস্য ও কারুণ্য পরিপূর্ণ গল্পের ভাণ্ডার খুলিয়া বসেন, বালক বালিকারা তাহাদের গত সমস্ত দিবসের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়া একমনে সেই গল্পের মাধুর্য্যে ডুবিয়া থাকে। এখন সেরূপ প্রাচীনা ঠাকুরমার সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুর গল্পের ভাণ্ডারও ফুরাইতেছে। আমাদের শিশু পাঠক পাঠিকাদের এই অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন রূপকথা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে উপহার দিব এরূপ আমরা ইচ্ছা করিয়াছি। অদ্য সকলকে আমরা এক সাহসী ও চতুর দরজীপুত্রের গল্প শুনাইব।

একদা গ্রীষ্মকালে এক দিবস সকাল বেলায় এক দরজীপুত্র তাহার ঘরে বসিয়া অতি আগ্রহ সহকারে সেলাই করিতেছিল এবং নিজের মনে গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ সে শুনিতে পাইল রাস্তা দিয়া খাবার ডাকিয়া যাইতেছে। তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল; সুতরাং এই খাবারওয়ালার ডাক শুনিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত তাহার ঘরের ক্ষুদ্র জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া সেই খাবারওয়ালাকে ডাকিল। মিঠাই ইত্যাদি তাহার সম্মুখে আনিয়া নামাইলে, একটী সন্দেশ হাতে নিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কিহে বাপু, তোমার খাবার ভাল ত?" খাবারওয়ালা বলিল,—"ভাল না হয়ত দাম চাই না।" তখন দরজীপুত্র সমস্ত জিনিস বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল,—"আচ্ছা, আমায় এক পয়সার রসগোল্লা দিয়া যাও।" মিঠাই বিক্রেতা বিরক্তির সহিত এক পয়সার ছোট একটী রসগোল্লা দিয়া বক্‌বক্ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। এত বাকবিতণ্ডার পর সে মনে করিয়াছিল লোকটা না জানি কতই কিনিবে।

দরজীপুত্র মনে মনে বলিতেছিল,—"যাহা হউক রসগোল্লাটা খেয়ে ক্ষুধাটাত নিবৃত্তি করা যাবে এখন; হাতের কাজটুকু সেরে এখন উহা খাওয়া যাউক।" এই বলিয়া রসগোল্লাটী সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পাত্রে রাখিয়া হাতের শেলাই শেষ করিতে বসিল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক হইতে মক্ষিকার দল আসিয়া রসগোল্লাটী ছাইয়া ফেলিল। দরজীপুত্রের চক্ষু হঠাৎ সেদিক পড়াতে দেখিল যে, তাহার রসগোল্লায় মক্ষিকাগণ মহা মহোৎসব করিতেছে। তখন সে অত্যন্ত বিরক্তির সহিত চীৎকার করিয়া বলিল,—"আরে বেটারা, তোদের কে ডেকেছেরে? ভারি যে নিমন্ত্রিত কুটুম্বের ন্যায় আসিয়া বসিয়া গিয়াছিস্? পালা শীঘ্র, না হলে সব মারা যাবি।" মক্ষিকাগণের সে কথায় কি এসে যায়। তাহারা রসগোল্লার রসাস্বাদনেই রত ছিল। অতঃপর দরজীপুত্র তাহার আজ্ঞা পালন হইল না দেখিয়া অতিশয় ক্রোধ সহকারে সম্মুখে যে একটী কাপড়ের থলিয়া ঝুলান ছিল তাহা টানিয়া নিয়া সেই মক্ষিকাদলের উপরে সজোরে আঘাত করিল। থলিয়া উঠাইয়া দেখিতে পাইল যে দশটা মাছি মরিয়া আছে। তখন মনে মনে বলিতে লাগিল,—"বাবা,—কি বীর আমি; এক ঘায়ে দশটা মেরে ফেলেছি। বড় যে-সে লোকটাত নহি। সমস্ত নগরের মধ্যে যে একথা ঘোষণা হইবে; আর এ সমস্ত নগরেই বা শুধু কেন? এ বীরোপযোগী ঘটনা সমস্ত জগৎময় রাষ্ট্র হইবে। 'এক ঘায়ে দশটা।'" অনতিবিলম্বে সে তাহার নিজের জন্য একটী কোমরবন্ধ প্রস্তুত করিল এবং তাহার উপর জরির অক্ষরে খুব বড় বড় করিয়া লিখিল—'এক আঘাতে দশটা।' অতঃপর এখন আর এ ক্ষুদ্র দরজী দোকান তাহার উপযুক্ত স্থান নহে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া পৃথিবীতে কোথায় কি বীরোপযোগী কার্য্য আছে তাহার অনুসন্ধানে বাটী হইতে বাহির হইল। তাহার ক্ষুদ্র একটী পাখী ছিল এবং ঘরে ময়লা ধরা একখণ্ড পনির ছিল যাইবার সময় উহা পকেটের মধ্যে ফেলে বাহির হইল।

কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিতে করিতে একটী পাহাড়ের উচ্চ শিখরদেশে উপস্থিত হইল, এবং দেখিতে পাইল যে বৃহদাকার এক রাক্ষস তথায় বসিয়া আছে এবং স্থির ও প্রশান্তভাবে তাহার দিকে দৃষ্টি করিতেছে। দরজীপুত্র কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সেই রাক্ষসের নিকট অগ্রসর হইল এবং অত্যন্ত সাহসভরে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল,—"কিহে ভাই, এখানে এই উচ্চশিখরে বসে বসে নীচের ঐ পৃথিবীতে কি হইতেছে দেখিতেছ? আমিও বাহির হয়েছি, দেখি কোথায় কি আছে। আমার সঙ্গে যাবে?" রাক্ষস একটু ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল,—"কি বীরের বেটা বীর রে! হাওয়ার আগে পড়ে যায় তার আবার কথা শোন।" দরজী বলিল,—"কি,—কি বল্লে? এইটা একবার পড় দেখি, তাহা হইলেই বুঝ্‌বে আমি লোকটা কেমন।" এই বলে তাহার কোমরবন্ধের উপরের লেখা তাহাকে পড়িতে দিল। রাক্ষস মনে করিল যে, লোকটা এক ঘায়ে দশটা মানুষই মারিয়াছে বুঝি। তবেত এ লোকটা বড় কম নহে। কিন্তু তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এক খানি প্রস্তর খণ্ড হাতে নিয়া মুষ্টের মধ্যে চাপিয়া গুড়া গুড়া করিয়া বলিল,—"এইরূপ করত দেখি, তুমি কত বড় বীর।" দরজী হাসিয়া বলিল,—"ওত আমার কাছে খেলা বিশেষ।" এই বলিয়া পকেট হইতে সেই ময়লা ধরা কাল পনিরখণ্ড একখণ্ড প্রস্তর বলিয়া হাতের মধ্যে নিল এবং উহা সহজেই চাপিয়া গুড়া গুড়া করিয়া বলিল,—

"কেমন, তোমার অপেক্ষা আরও ভাল হয়েছে কিনা?" রাক্ষস দেখিয়া কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইল; এবং পুনরায় একখানি প্রস্তর খণ্ড হস্তে নিয়া সবেগে উর্দ্ধে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল,—"ছোড় দেখি কতদূর পার।" দরজী এবার অধিকতর হাসিয়া বলিল,—"রাম বল, তোমার পাথর ত ফিরে এসে ভূতলে পড়িল। আমি এমন ছুড়িব যে আকাশের সঙ্গে মিলাইয়া যাবে।" এই বলিয়া পকেট হইতে সেই ক্ষুদ্র পাখীটী প্রস্তরখণ্ড বলিয়া হাতে নিয়া ছুড়িয়া ফেলিল। পাখী বন্ধন মুক্ত হইয়া সবেগে কোথায় উড়িয়া গেল আর দেখা গেল না। রাক্ষস নির্ব্বাক হইয়া রহিল; কিন্তু তাহার মনের ধোঁকা গেল না। এই ক্ষুদ্র মনুষ্য বীর হইবে এ তাহার সম্ভব বলিয়া মনে হইল না। অতএব রাক্ষস তাহাকে আরও পরীক্ষা করিবার জন্য বলিল,—"এস দেখি তুমি, ঐ যে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ কাটা রহিয়াছে উহা আমার সঙ্গে লইয়া চলত?" দরজী বলিল,—"আচ্ছা, তুমি শুধু গোড়ার দিকে ধর, আর ডাল পালা যাহা কিছু আছে, সমস্ত আমি ধরিতেছি।" রাক্ষস বৃক্ষের গোড়ার মাঝামাঝি ধরিয়া তোলাতে সমস্ত বৃক্ষটাই ভূতল হইতে উথিত হইল এবং দরজী বৃক্ষের একখানি ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া রহিল। তাহার শরীরের ভারে বৃক্ষের ভার অধিক কিছু বাড়িল না। রাক্ষস বৃক্ষের গোড়া স্কন্ধে নিয়া পিছনে কিছুই দেখিতে পারিতেছিল না। সুতরাং সে মনে করিল দরজী ডালপালা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহন করিতেছে। কিছুকাল এইরূপ গিয়া রাক্ষস বৃক্ষ ভূতলে রাখিল; এবং সম্মুখে একটী আম গাছে বড় বড় আম পাকিয়া আছে দেখিয়া ঐ গাছের একখানি ডাল সজোরে টানিয়া নামাইয়া দরজীকে উহা হইতে আম খাইতে বলিল। দরজী ডাল ধরিয়া যেমন আম পাড়িতেছে, রাক্ষস ডাল ছাড়িয়া দেওয়াতে ক্ষুদ্রকায় দরজী ডালের সঙ্গে সঙ্গে সবেগে উর্দ্ধে উত্থিত হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় কোন আঘাত পায় নাই। রাক্ষস বলিল,—"কিহে বাপু, এত কল্লে, আর এই আমের ডালখানি টানিয়া রাখিবার শক্তি তোমার হইল না?" দরজী হাসিয়া বলিল,—"তোমার যেমন বুদ্ধি তুমি তেমনি মনে করিবে। আমি শক্তির অভাবে ডালের সঙ্গে উঠিয়া আসিয়াছি? দেখিতেছ না, ব্যাধগণ ঐ ঝোপের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতেছে, যদি তীর এসে গায়ে লাগে তাই উঠে এসেছি, ভাল চাও ত তুমিও ঐরূপ উঠে এস।" রাক্ষস চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার ভরে গাছের ডাল আরও নুইয়া পড়িতে লাগিল। এই অবকাশে দরজী সে যে ডালে ছিল উহা ভূতলের কাছে আসাতে নামিয়া পড়িল এবং রাক্ষসকে ঠাট্টা করিয়া বলিল,—"তুমি কোন কাজের নহ। চল এখন সরে পড়া যাক্। তীর এখানে এসে গায়ে লাগিতে পারে।" রাক্ষস দরজীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিল।

রাক্ষসের নিকট হইতে বিদায় নিয়া দরজী ভ্রমণ করিতে করিতে এক রাজভবনের নিকট উপস্থিত হইল, এবং শ্রান্তি দূর করিবার জন্য অট্টালিকার সম্মুখস্থ তৃণভূমিতে উপবেশন করিল। সে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল; সুতরাং অতি সত্বরই সেই তৃণভূমিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। অল্পকালের মধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে তথায় লোক সমাগত হইল। তাহার কোমরবন্ধের উপরের লেখা পড়িয়া সকলেই স্থির করিল সে একটী অদ্বিতীয় বীর। দেখিতে দেখিতে রাজার নিকট খবর গেল যে, এক অদ্বিতীয় বীর তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে

নিদ্রাভিভূত আছে। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ঐরূপ লোকের নিতান্ত প্রয়োজন; সুতরাং যাহাতে তাহাকে রাজকার্য্যে রাখা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। রাজা সমস্ত শুনিয়া মনে করিলেন যে, এক আঘাতে দশজন মারে এমন বীরকে হাত ছাড়া করা কোন মতেই উচিত নহে। অতি সত্বর কর্ম্মচারিবর্গের দ্বারা নিদ্রিত দরজীর নিকট রাজসরকারে যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। রাজকর্ম্মচারিগণ তথায় পৌছিয়া দেখিলেন দরজী নিদ্রা হইতে উঠিয়াছে এবং অবিলম্বে তাঁহারা তাহার নিকট রাজার প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। দরজী আহ্লাদ সহকারে প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল, এবং বলিল,—"যুদ্ধ বিগ্রহই আমার কাজ; এক আঘাতে আমি দশটা মারি; রাজার সমস্ত শত্রু আমি একা মারিব।" অতঃপর দরজী রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক তাহার বক্তব্য জানাইল। রাজা তাহার অবস্থানের জন্য একটী সুন্দর বাটী ও কয়েকজন অনুচর নিযুক্ত করিলেন।

দরজী সুখে কাল যাপন করিতেছে, এমন সময় সমস্ত অমাত্য ও কর্ম্মচারিবর্গ সমবেত হইয়া হিংসা প্রযুক্ত রাজসমীপে প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা আর রাজসরকারে কর্ম্ম করিবেন না। এক ঘায়ে দশটা মারে এরূপ লোকের সহিত তাঁহারা বাস করিতে ইচ্ছুক নহেন। বাস্তবিক রাজকর্ম্মচারিগণ ও অমাত্যবর্গ সকলেই এই বীরের প্রতি বড়ই হিংসাযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন,—"যুদ্ধে এক ঘায়ে যদি দশটা এ ব্যক্তি মারিয়া ফেলে, তা হলে আমরা আর কি মারিব। আমাদের জন্য কিছুই থাকিবে না; আমাদের নাম হবে কিসে?" রাজা দেখিলেন বিষম বিপদ; তাঁহার সমস্ত পুরাতন কর্ম্মচারী ও অমাত্যবর্গ তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তিনি আর কাহাকে নিয়া রাজ্যশাসন করিবেন। সেই দরজীকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে বড় ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং কি করিয়া তাহাকে তাড়াইবেন সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাকে অদ্বিতীয় বীর মনে করিয়াছেন; সুতরাং হঠাৎ কার্য্য হইতে বিদায় দিলে সে যদি শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। অনেক চিন্তার পর এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদিন সেই বীরকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার রাজ্যের কোন অরণ্যে দুই রাক্ষস বাস করে। তাহাদের অত্যাচারে ও দৌরাত্ম্যে লোকজন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত দুই রাক্ষসকে তাহার মারিতে হইবে। সাহায্যার্থ তাহার সঙ্গে এক শত অশ্বারোহী যাইবে। যদি সে মারিয়া আনিতে পারে তাঁহার একমাত্র কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন এবং তাঁহার অর্দ্ধ রাজত্ব তাহাকে দিবেন। দরজী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া লোকজন সমভিব্যাহারে সেই অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিল। সঙ্গীদিগকে অরণ্য প্রান্তে রাখিয়া একাকী অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল কতকগুলি বৃক্ষতলে অতি বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট ভয়ঙ্করমূর্ত্তি দুই রাক্ষস নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদের নাসারন্ধ্র দিয়া যে বায়ু নির্গত হইতেছে তাহাতে সমস্ত অরণ্যে যেন ঝড় বহিতেছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া দরজী এক বৃক্ষের উপর উঠিল এবং তথা হইতে এক একখানি প্রস্তর খণ্ড ক্রমান্বয়ে রাক্ষসদ্বয়ের এক জনের বক্ষের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উক্ত রাক্ষস হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে অপরকে বলিল,—"কিহে, তুমি কেন আমাকে আঘাত করিতেছ?" অপর বলিল,—

"আমি আঘাত করিব কেন? তুমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখেছ।" তাহাই হইবে মনে করিয়া উভয়ে আবার নিদ্রা গেল। তখন দরজী বৃক্ষ হইতে পুনর্ব্বার প্রস্তর খণ্ড অপরের বক্ষের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবার দ্বিতীয় রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথম জনকে বলিল,—"তুই কেন আমায় মারিলি, আমি ত তোকে মারি নাই।" সে বলিল,—"কই আমি ত মারি নাই।" একথায় তাহার বিশ্বাস জন্মিল না। অতঃপর উভয়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সম্মুখের বৃক্ষাদি সমূলে উত্তোলিত করিয়া উভয় উভয়কে প্রহার করিতে লাগিল। তাহাদের বিকট চীৎকারে অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই প্রকার কিছুকাল ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর উভয়েই অত্যন্ত আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং সত্বরই প্রাণত্যাগ করিল।

দরজী এই বিষম ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল। রাক্ষসদ্বয় মরিয়াছে দেখিয়া আস্তে আস্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। ভূতলে নামিয়া মনে করিল,—"বাবা, কি বাঁচাই বেঁচেছি, যে বৃক্ষে আমি ছিলাম উহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া যদি যুদ্ধ করিত তাহা হলে ত আমি গিয়েছিলাম। বড় রক্ষা পাওয়া গেছে এ যাত্রা।"

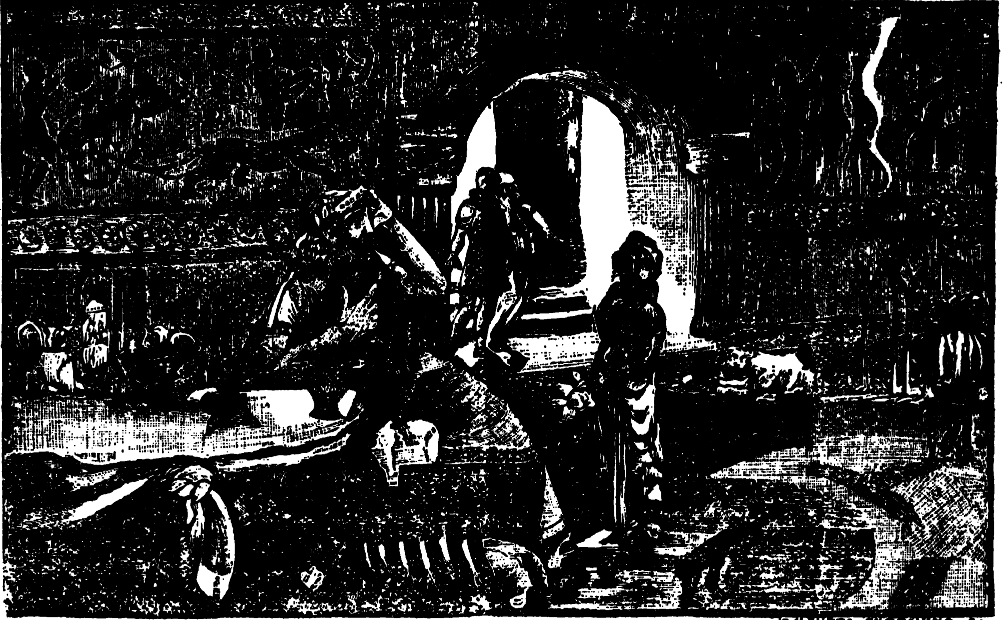
অতঃপর দরজী অতিশয় উল্লাসের সহিত তাহার সঙ্গীবর্গকে আহ্বান করিয়া সমস্ত দেখাইল এবং বলিল—"কি দেখ হে বাপুরা, আমি কি যে সে লোক? দু'টো একটা রাক্ষস মারাত আমার পক্ষে ছেলে খেলা। এক ঘায়ে দশটা মারি আমি।" সকলে দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল এবং অতি সত্বর সেই মৃত রাক্ষসদ্বয়কে রাজার নিকট নিয়া উপস্থিত করিল। দেখিয়া রাজার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন রাক্ষসের হাতে দরজী বীর প্রাণ হারাইবে। তাঁহার একমাত্র কন্যাকে তাহার সহিত বিবাহ দিতে হইবে এবং অর্দ্ধ রাজ্য তাহাকে দিতে হইবে একথা তাঁহার স্বপ্নেও মনে হয় নাই। দরজী স্পর্দ্ধার সহিত বলিল,—"মহারাজ, কি চিন্তা করিতেছেন, আমার বীরত্ব দেখিলেন, এখন আপনার অঙ্গীকার রাখুন; তাহা না হইলে আপনার অপযশ হইবে। রাজা কি করিবেন, বাধ্য হইয়া একমাত্র কন্যাকে এবং অর্দ্ধ রাজ্য দরজীর হস্তে অর্পণ করিলেন। বুদ্ধি ও চতুরতার বলে দরজীপুত্র এখন রাজজামাতা হইয়া এবং রাজার অর্দ্ধ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সুখে কাল হরণ করিতে লাগিল।

এইজন্যই বলে "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।" বুদ্ধি যার বল তার।

মিডাস্।

পূর্ব্বকালে 'এসিয়া মাইনরে' ফ্রীজিয়া নামে একটী প্রদেশ ছিল। মিডাস নামে ফ্রীজিয়ার একজন রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সোণা ভাল বাসিতেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদের নীচে ভূগর্ভে অন্ধকার কুঠরীতে বসিয়া প্রায়ই তাঁহার অগণ্য উজ্জ্বল স্বর্ণমুদ্রা গণনা করিতেন ও আরও অধিক লাভের অভিলাষ করিতেন। সূর্য্যাস্তের সময়ে আকাশের উজ্জ্বল বিচিত্র মেঘমালাও তাঁহার মনোমুগ্ধকারী ধাতু নির্ম্মিত নহে বলিয়া তাঁহার নিকট কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হইত।

তাঁহার একটী ছোট কন্যা ছিল, তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। অবশ্য পিতার নিকট সন্তান যেরূপ স্নেহ ও আদরের বস্তু



স্বর্ণমুদ্রা তাঁহার অর্দ্ধেকও নহে। বাগান হইতে সুন্দর সুন্দর ফুল তুলিয়া আনিয়া কন্যা যখন পিতাকে দেখাইবার জন্য নাচিতে নাচিতে তাঁহার নিকট আসিত, তিনি তাহাকে স্নেহ পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিয়া বলিতেন "বাছা, এই হরিদ্রা বর্ণের ফুলগুলি দেখিতে যেমন সোণার মত, তেমনি প্রকৃতই যদি সোণার হইত, তবে ফুল তোলা আরও কত সুখকর হইত।"

এক দিবস তিনি সেই অন্ধকার নির্জ্জন কুঠরীতে তাঁহার ধন-রত্ন দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ঘরের জানালা দিয়া একটী উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি আসিয়া ঘরে পতিত হইল। রাজা সূর্য্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন ও মনে মনে বলিতে লাগিলেন "আহা! প্রকৃতই যদি' সুবর্ণ হইত।" এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে এক অলৌকিক দীপ্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার মুখকান্তি গৌরবর্ণ, নয়নদ্বয় উজ্জ্বল ও কমনীয় ও বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। মস্তকে পক্ষযুক্ত শিরাভরণ, পদ-দ্বয়ের উজ্জ্বল রৌপ্যের ক্ষুদ্র পক্ষ দুইটি বায়ুতে সঞ্চালিত হইতেছিল।

সেই দিব্য পুরুষ অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন, "হে রাজন্! তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক। কল্য প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া যাহা স্পর্শ করিবে তাহাই তৎক্ষণাৎ সুবর্ণের হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান হইলেন।

সে রাত্রে রাজার আর নিদ্রা হইল না। আগন্তুকের এই আশ্চর্য্য অঙ্গীকার সফল হয় কিনা পরীক্ষার জন্য প্রভাতের অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইতে লাগিল। প্রত্যূষের প্রথম কিরণেই চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন তাঁহার কোমল শয্যার সুন্দর আবরণ বস্ত্রাদি সুবর্ণময় হইয়া প্রভাতালোকে ঝল্‌মল্ করিতেছে। রাজা এই দুর্ব্বহ সৌন্দর্য্যের ভিতর হইতে গাত্রোত্থানের

জন্য যাহা অবলম্বন করিলেন তৎক্ষণাৎ তাহা কঠিন ও ভারযুক্ত স্বর্ণ হইয়া গেল। প্রত্যেক পাদ বিক্ষেপে পদতলে ভূমি ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল, ও তাঁহার অঙ্গুলি স্পর্শ মাত্রে সমুদয় উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল।

প্রথমতঃ রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার আশঙ্কা জন্মিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা বোধ হয় কেবলই তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন সুখের জন্য নহে।

শীতল জলে স্নান করিবার জন্য স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন, জলে হাত দিয়াই চমকিত হইলেন। জলের মধ্যে হাত আর নিমজ্জিত হইল না। জল কঠিন ও সুবর্ণময় হইয়া গিয়াছে।

উদ্যানে সুন্দর সুন্দর নূতন নূতন ফুল ফুটিয়াছে, দেখিবার জন্য উদ্যানে প্রবেশ করিলেন বটে,কিন্তু যমের ছায়ার ন্যায় তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যম হস্তের স্পর্শে বৃক্ষের সজীবতা নষ্ট হইল। লতা সকল নীরস ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। গোলাপ কোমলতা পরিহার করিল। মালতী সৌরভ বিহীন হইল। পুষ্প ও পত্রে প্রভেদ রহিল না, সবই এক হরিদ্রা বর্ণে মণ্ডিত হইল।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভোজনে বসিলেন। খাদ্য দ্রব্য স্পর্শমাত্র স্বর্ণময় হইয়া যাইতে লাগিল। স্বীয় নূতন ক্ষমতার পরিচয়ে রাজা ভীত হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার কন্যা অশ্রুনয়নে ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল,"বাবা, ফুলের আজ কি বিষম ব্যাপার ঘটিয়াছে? তাদের আর সুগন্ধও নাই, কোমলতাও নাই, তাহারা কঠিন ও মৃতবৎ হইয়া রহিয়াছে।"

"বাছা, দুঃখিত হইও না, পূর্ব্বাপেক্ষা কি উহারা অধিকতর সুন্দর ও বহুমূল্য হয় নাই? ওগুলি সোণার, খাঁটি নিরেট সোণার।"

এই বলিয়া সস্নেহে কন্যাকে ক্রোড়ে উঠাইলেন, ক্রোড়ে লইয়াই রাজা যে কিরূপে ভীত হইলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাহার কোমল অঙ্গ তাঁহার হস্তে কঠিন হইয়া গেল তাহা অনুভব করিলেন তাহার চক্ষের জল গালের উপর সোণার দানা হইয়া ঝুলিতে লাগিল। তাহার নয়নদ্বয় নির্জ্জীব উজ্জ্বলতা লাভ করিল। সে স্বর্ণ নির্ম্মিত পুত্তলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজা গভীর নিরাশায় মগ্ন হইলেন। প্রথমতঃ কিয়ৎকাল হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার দুরাদৃষ্টের ভীষণতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। পরে সন্তান-শোকে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন। এত স্বর্ণ তাঁহার নিকট এখন আর কি? পৃথিবীর সমস্ত ধন রত্ন কন্যার এক চুম্বনের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। সমস্ত পৃথিবী শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

গভীর শোকের আবেগে যখন এইরূপ ক্রন্দন করিতেছিলেন সেই সময়ে শুনিতে পাইলেন "রাজা মিডাস্ তোমার অভিলাষ পূর্ণ হওয়াতে কি অধিকতর ধনী হইলে?" রাজা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন পূর্ব্বদিনের সেই মহাপুরুষ বিস্মিত মুখে রাজার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

রাজা বলিলেন,—"আপনার প্রদত্ত এই ভীষণ ক্ষমতা ফিরাইয়া লউন। ইহার প্রভাবে আমি মরণ ও শোক পাইয়াছি। পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণ অপেক্ষাও আমার প্রিয়তম কন্যাকে ফিরাইয়া দিন।"

দিব্য পুরুষ উত্তর করিলেন, "তোমার বুদ্ধি জন্মিয়াছে দেখিয়া আমি সুখী হইলাম। পুনরায় তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম, যাহা কিছু তোমার স্পর্শে বিকৃত হইয়াছে তোমারই স্পর্শে পুনরায় তাহা পূর্ব্ব প্রকৃতি লাভ করিবে।" রাজা কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। কন্যার শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল অনুভব করিলেন। তাহার গাল দুখানি গোলাপের কান্তিযুক্ত হইল, চক্ষু সজীবতা লাভ করিল। রাজা তাহাকে চুম্বন করিলেন; কন্যা পিতার গলা জড়াইয়া "বাবা, বাবা" বলিয়া আদর করিতে লাগিল। কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাজার আর সুখের সীমা রহিল না।



মে, ১৮৯০।



বিবিধ।

আমেরিকায় নিউইয়র্ক নগরের নিকট সাত মাইল বিস্তৃত একটী পোল নির্ম্মিত হইবে। পৃথিবীর মধ্যে এটী এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার হইবে। ইহাতে আমেরিকাবাসীদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্য কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহা নির্ম্মাণে ৮ কোটী টাকা ব্যয় পড়িবে। এই পোলের উপর লোকজন, গাড়ী ঘোড়া, ও রেল গাড়ী চলাচলের জন্য ৮টী রাস্তা থাকিবে।

* *
*

আমেরিকায় চিকাগো নগরে ১৪০০ ফীট উচ্চ একটা মনুমেণ্ট বা মন্দির নির্ম্মিত হইবে। এই মনুমেণ্ট আগা গোড়া লৌহ নির্ম্মিত হইবে। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্তম্ভ হইবে। এখন ফ্রান্সের রাজধানী পারীস নগরে ইফেল টাওয়ারই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্তম্ভ। ইহাও লৌহ নির্ম্মিত। চিকাগোর মনুমেণ্ট এক লক্ষ তাড়িতালোক দ্বারা আলোকিত করা হইবে।

* *
*

নিরামিষাশী জীব জন্তু অপেক্ষা মাংসাশী জীব জন্তুর ক্ষুধা সহ্য করিবার ক্ষমতা অধিক। গরু ছাগলেরা দুই দিন আহার না পাইলে অত্যন্ত কষ্ট পায়। তাহার কারণ বোধ হয় ঘাস পাতা পৃথিবীতে প্রচুর পাওয়া যায় ও তাহা পাইতে ইহাদিগকে প্রায় কোন ক্লেশ পাইতে হয় না; খাবার না পাইয়া অনাহারে থাকিবার অভ্যাস একেবারেই নাই। মাংসাশী জন্তুরা সবই শিকারী জন্তু। শিকার ধরিয়া তাহাদের উদর পূর্ণ করিতে হয়। বাঘ সিংহ প্রভৃতিরা একদিন শিকার পায় ত পাঁচ দিন পায় না। শিকার পাইবার জন্য বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। এক দিন আহার জুটিলে পর দিন যে আহার জুটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ক্ষুধা সহ্য করা ইহাদের এক রকম অভ্যাস। সিংহ, ব্যাঘ্র, কুকুর এক মাস অনাহারে থাকিয়াও বাঁচে। মানুষের মধ্যেও আমিষভোজীরা নিরামিষভোজীদের অপেক্ষা অধিক কষ্ট-সহিষ্ণু।

* *
*

আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মাঝে মাঝে বড়ই অসদ্ভাবের কথা শুনা যায়। দুর্গোৎসব ও মহরমের সময় কোথায়ও কোথায়ও হিন্দু ও মুসলমানে দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা সংবাদ পত্রে পাঠ করা যায়। সামান্য সামান্য বিষয়েও উভয়ের মধ্যে বড় একটা সৌহার্দ্দ্য দেখা যায় না। এটা বড়ই

নিন্দা ও দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। আবার অনেক সময়ে অনেক সৎকার্য্যে সকল প্রকার অসদ্ভাব ও মনান্তর ভুলিয়া গিয়া উভয়কে উভয়ের সাহায্য করিতে দেখা যায়।

মান্দ্রাজের একজন হিন্দু ধনী রায় বাহাদুর ধনপৎ মুদালিয়ার মান্দ্রাজের মুসলমানদিগের পুস্তকালয়ের উন্নতির জন্য সম্প্রতি ২০,০০০ বিশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। এই দানে তাঁহার মহানুভাবতার পরিচয় দিয়াছেন।

* *
*

তোমরা মুদ্রা যন্ত্রের উপকারীতা ও ইহার উন্নতির বিষয় পূর্ব্বে 'সখা'তে পড়িয়াছ। সম্প্রতি মার্কিন যুক্ত রাজ্যে কলে অক্ষর সাজান হইতেছে, ইহাতে খুব অল্প সময়ে অনেক অক্ষর সাজান হয়, একজন মানুষ ৪ দিনে যে কাজ করিতে পারে, কলে ১ দিনে তাহা হয়, অথচ খরচও খুব কম। আমেরিকার একখানা বিখ্যাত খবরের কাগজ কলে অক্ষর সাজাইয়া ছাপান হইতেছে।

* *
*

রোয়াঁ ফ্রান্স দেশের একটী নগর। সেখানে একটী আশ্চর্য্য ঘড়ি আছে। সেই দেশবাসী গ্রেনিয়ার নামক একজন ঘটিকা-যন্ত্র নির্ম্মাতা ইহা ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ করেন। একবার চাবি দিলে প্রায় এক বৎসর তিন মাস এই ঘড়িটী চলে। ইহা দেখিয়া সময়, বার, তারিখ এবং বৎসর জানা যায়। এই ঘড়িটীতে কখনও সময়ের গোলমাল হয় নাই।



বড়লোকের সামান্য বেশ।

(১)

বিখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিৎ অধ্যাপক সেজ্‌উইক্ কোন নগর হইতে কিছু দূরে কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে ভূ-তত্ত্বের অনুসন্ধানে সামান্য বেশে প্রস্তর খনন করিতেছিলেন। কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা গাড়ী চড়িয়া সেই পথ দিয়া নগরের দিকে যাইতেছিলেন। ঠিক পথে যাইতেছেন কি না জানিবার জন্য সেজ্‌উইকের নিকট আসিলেন। তিনি সেজ্‌উইককে রাস্তা মেরামতের জন্য পাথর ভাঙ্গিতেছে এইরূপ কোন মুটে মজুর মনে করেন। ভদ্রলোক ইতর লোকের সহিত যেরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা বলে, তিনিও সেই ভাবে সেজ্‌উইককে সম্বোধন করিয়া নগরে যাইবার এই ঠিক পথ কি না জিজ্ঞাসা করেন। সেই সামান্য মুটের উত্তরের ভাব, তাহার কথাগুলি ও শিষ্টাচার দেখিয়া মহিলা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ও তাহার সন্তান কয়টী এবং পরিবারাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—"তোমায় খুব বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এই সামান্য ও কঠোর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুটে অপেক্ষা অন্য ভাল কাযের চেষ্টা কর। পাথর-ভাঙ্গা কায কি তোমার কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় না?" সেজ্‌উইক বলিলেন,—"আজ পর্য্যন্তও আমার কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় নাই। আমি এই পাথর-ভাঙ্গা কাযেই নিযুক্ত আছি, অন্যের দ্বারা পাথর ভাঙ্গাইয়া লইলে আমার মনের মত হয় না বলিয়া নিজেই পাথর ভাঙ্গি।" মহিলা মনে করিলেন লোকটা কিছু পাগল গোছের। যাহা হউক তিনি লোকটার কষ্ট দেখিয়া দয়ার্দ্র

হইয়া একটী মুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে বলিলেন,—"আমার জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছি বলিয়া তোমার উপর প্রীত হইয়া এই মুদ্রাটি তোমায় উপহার দিলাম। আমি আর বিলম্ব করিব না অমুক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে যাইতে হইবে।" সেজ্‌উইক্‌ মৃদু হাসিয়া মুদ্রাটী বক্সিস্‌ লইয়া মহিলাকে ধন্যবাদ দিলেন।

সেই মহিলা যে সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে যাইতেছিলেন তাঁহার সহিত সেজ্‌উইকের খুব বন্ধুতা ছিল। পর দিবস সেই সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে মহিলা ও সেজ্‌উইক উভয়েরই নিমন্ত্রণ ছিল। সকলে একত্রে ভোজনে বসিবেন এমন সময়ে সেই মহিলার দৃষ্টি সেজ্‌উইকের দিকে পতিত হইল; তিনি বলিলেন,—"আপনাকে কোথায় দেখিয়াছি দেখিয়াছি বোধ হইতেছে কিন্তু নিশ্চয় কিছু স্মরণ হইতেছে না।" সেজ্‌উইক্‌ পকেট হইতে সেই মুদ্রাটী বাহির করিয়া বলিলেন,—"এই মুদ্রাটী কল্য যে মজুরকে পাথর ভাঙ্গিতে দেখিয়া দান করিয়াছিলেন আমি সেই মজুর।" তখন গৃহস্বামী সেই সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত অধ্যাপক সেজ্‌উইকের পরিচয় করাইয়া দিলেন। মহিলা পূর্ব্বেই অধ্যাপকের যশঃ ও খ্যাতির বিষয় অবগত ছিলেন, এখন নিজের ভ্রমবশতঃ তাঁহার প্রতি যে অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

(২)

কোন যুবক আমেরিকার আওয়া প্রদেশের সরকারী কাযের কোন উচ্চ পদের প্রার্থী ছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাহাকে সুপারিস পত্র দিয়াছিলেন। কোন উচ্চপদস্থ লোকের অনুরোধ-পত্র লইয়া আওয়ার শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে নিজ গ্রাম হইতে আওয়া নগরের প্রধান হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে হোটেলের দ্বারে গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়াই বাক্স গাড়ী হইতে নামাইয়া হোটেলের উপরের ঘরে লইয়া যাইবার জন্য 'কুলি' ডাকিতে লাগিল। সম্মুখে হোটেল হইতে সামান্য বেশের কোন লোককে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহাকে কোন 'কুলি' মনে করিয়া বাবুগিরি মেজাজে তাহাকে বাক্স নামাইয়া উপরে রাখিতে হুকুম করিল। লোকটা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর বাক্স বহন করিতে সম্মত হইল। যুবক তাহাকে ২৫ সেণ্ট অর্থাৎ আট আনা দিতে স্বীকার করিলে সেই লোকটী বাক্স কাঁধে করিয়া উপরে লইয়া গেল। উপরে গিয়া যুবক তাহাকে পকেট হইতে (আধুলির ন্যায়) একটা ২৫ সেণ্ট মুদ্রা বাহির করিয়া দিল। মুদ্রাটী কিন্তু একটু কাটা ছিল, ভাঙ্গাইলে পুরা ২৫ সেণ্টের পরিবর্ত্তে ২৩ সেণ্ট আন্দাজ পাওয়া যাইত। সেই মুদ্রা দিয়া তৎক্ষণাৎ একখানি চিঠী বাহির করিয়া বলিল,—"তুমি গবর্ণর (শাসনকর্ত্তা) গ্রাইমস্‌কে চেন?" সে বলিল,—"হাঁ।" "তবে এই পত্রটা তাঁহাকে দিয়া আইস ও বলিও আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহার কখন সুবিধা হইবে?" সে লোকটা বলিল,—"আমিই গবর্ণর গ্রাইমস্‌, পূর্ব্বে তোমার বিষয় অনেকের নিকট শুনিয়াছিলাম, ইতি পূর্ব্বেও তোমার প্রতি আমার একটা ভাল ধারণা জন্মিয়াছিল। তোমাকে সেই উচ্চপদের উপযুক্তও মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু দেখ যে একজন সামান্য গরিব কুলিকেও দুই সেণ্ট ঠকাইতে কুণ্ঠিত হয় না সে রাজকোষের ভার পাইলে যে দেশের লোককে যথেষ্ট ঠকাইবে তাহার আর বিচিত্র কি? আমি এমন লোককে ও পদের উপযুক্ত বিবেচনা করি না।"

কোলা ব্যাঙ।



উপরে যে ছবি দেখিতেছ উহা একটী রাক্ষস বিশেষের ছবি। ওটা একপ্রকার গায়ক জাতীয়। ইহারা বর্ষার গায়ক। ইহাদের মধুর কণ্ঠস্বরে কোকিল লজ্জা পায়. তাই ইহারা যখন গান করে তখন কোকিলেরা চুপ করিয়া থাকে, বড় একটা শব্দ করে না। ইহারা জলেও থাকে স্থলেও থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহারা রাক্ষস। জীবের প্রাণ সংহার করাই ইহাদের প্রকৃতি। এমন অসচ্চরিত্র হইলেও চিত্রকর ও প্রাণিতত্ত্ববিদেরা ইহার সংসর্গ ভালবাসে। প্রাণিতত্ত্ববিদের মধ্যে একজন ইহাদের একটা পুষিয়াছিলেন। তিনি বলেন ইহাকে একটা কাঁচের বাক্সে ২১ দিন অনাহারে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম; তার পর ইহার ক্ষুধা পাইয়াছে মনে করিয়া গোটা পঁচিশ বড় বড় মাছি ধরিয়া সেই বাক্সের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম। পেটুক ছেলেরা যেমন টপা টপ্ রসগোল্লা গিলে ফেলে ব্যাংটাও জিব বাহির করিয়া একে একে টপা টপ্ সব গিলিয়া ফেলিল। তার পর দিন ১৫টা মাছি, ২টা গুবরে পোকা ও দুটা ছোট কাঁকড়া গিলিয়া ফেলিল। ইনি আবার মরা জিনিস খাইতেন না। মাংসের টুকরা প্রথমতঃ

ছুঁইতও না, পরে সেগুলিকে পোকার মত সরু সরু লম্বা করিয়া কাটিয়া সূতায় বাঁধিয়া তার মুখের কাছে নাড়িলে জীবন্ত পোকা মনে করিয়া টপ্ করিয়া ধরিয়া গিলিয়া ফেলিত। মুখের 'হাঁ' টার মধ্যে যাহা আঁটে তাহাই খায় এমন কি নিজের বাচ্চাদের ধরিয়া খাইতেও বাধা নাই। একবার আমি একটা মরা ইন্দুর সূতায় বাঁধিয়া তাহার বাক্সের ভিতর নাড়িতেছিলাম ব্যাংটা খপ করিয়া ইন্দুরটাকে গিলিয়া ফেলিল। গিলিয়াই বুঝিল মরা ইন্দুর দ্বারা সে প্রতারিত হইয়াছে অমনি হাঁ করিয়া মুখের ভিতর সম্মুখের পা ঢুকাইয়া দিয়া ইন্দুরটাকে বাহির করিয়া ফেলিল। তার পর দিন হইতে তাহার বাক্সের ভিতর জীবন্ত ইন্দুর ছাড়িয়া দিতাম। সব সময়েই ইন্দুরের পিছন দিক্‌টা হইতে আরম্ভ করিয়া সবটা গিলিত। ইন্দুরের সহিত খুব যুদ্ধ করিতে হইত। ইন্দুরও মাঝে মাঝে খুব কামড়াইয়া দিত। অবশেষে পরাস্ত হইত। সেই বাক্সের নীচে একটু জল রাখিয়া দিয়াছিলাম, ইন্দুরকে ধরিয়াই সেই জলের মধ্যে চুবাইয়া ধরিত। ইন্দুর নিশ্বাস না ফেলিতে পাইয়া মৃতপ্রায় হইত। ব্যাং এই অবসরে গিলিবার সুবিধা পাইত। এক দিবস আর জল দিলাম না। সে দিন যুদ্ধটা কিছু ঘোরতর ও অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। ব্যাং জলে চুবাইয়া মারিবার সুবিধা পায় নাই। ইন্দুরের পিছন দিকটা গিলিলেও ইন্দুর ব্যাংএর হাতে খুব কামড়াইতেছিল। ব্যাং শেষে অন্য উপায় না পাইয়া দুই হাতে ইন্দুরের গলা খুব জোরে টিপিয়া ধরিল, সেই টিপনের চোটে ইন্দুরের চোখ বাহির হইয়া পড়িল। ব্যাং তারপর সহজেই ইন্দুরটাকে গিলিয়া ফেলিল।

কৃষক-পত্নী ও তাহার পালিত-পুত্র "হাবুল।"

(ঠাকুরমার গল্প।)

হাবুল বড় দুঃখী। ইহসংসারে তাহার দুঃখ কষ্ট দূর করিবার বন্ধু কেহই নাই। দুই বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। নিরাশ্রয়ে সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণ যায় দেখিয়া গ্রামের জমিদারী কাছারীর নায়েব মহাশয় হাবুলের লালন পালনের ভার গ্রামস্থ ধনী এক কৃষকের হস্তে প্রদান করেন। ঐ কৃষক অতিশয় কৃপণ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল। সে নায়েবের হুকুম ফেলিতে পারে না; নতুবা হাবুলের ভার গ্রহণ করিতে তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ছিল। কৃষকের পত্নী অত্যন্ত দয়ালু ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিল বলিয়াই হাবুল শিশুকালে রক্ষা পাইয়াছিল। হাবুল মরিলেই কৃষকের জঞ্জাল ফুরাইত; নিয়ত তাহার চেষ্টা ছিল কি করিয়া সেই জঞ্জাল দূর করিবে। কেবল তাহার স্ত্রীর যত্ন ও স্নেহের জন্যই তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এই জন্য সেই হতভাগিনী স্বামীর হাতে কত সময় কত দুঃখ ক্লেশই না পাইত! এমন কি সময় সময় প্রহার পর্য্যন্ত তাহার সহ্য করিতে হইত। যখন নিতান্ত অসহ্য হইত, সেই পাষাণ-হৃদয় স্বামীর চরণ ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিত,—"কেন তুমি এ দুঃখী বালকের উপর এত নিষ্ঠুর আচরণ করিতেছ? আমাদের কোন পুত্র সন্তান নাই; মনে কর না কেন, যে এ আমাদেরই ছেলে? এ বালক আমা-

দের এমন কি অন্ন ধ্বংশ করিতেছে যে, এর ভারে আমরা এত অস্থির হইব? এর জন্ত তোমার কত আর খরচ হয়? তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা রাখ, এই দুঃখী পিতৃমাতৃহীন বালকের উপর আর নিষ্ঠুরাচরণ করিও না।" পত্নীর মুখে এ সমস্ত কাতরোক্তি শুনিলে কৃষক অধিকতর রুষ্ট হইত এবং সেই দুঃখী শিশুর প্রতি অধিকতর অত্যাচার করিত। সেই কোমলহৃদয়া ধর্ম্মভীরু কৃষকপত্নী স্বামীর এই সমস্ত অত্যাচার দেখিয়া কেবল অশ্রু বর্ষণ করিত, এবং স্বামীর মনে যাহাতে দয়া মায়ার উদ্রেক হয় সেই জন্ত প্রতিনিয়ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত। প্রাণ যখন নিতান্ত ব্যাকুল হইত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিত,—"হা ঈশ্বর, আমায় নেও, আমি আর এ পাপজগতের অত্যাচার অনাচার সহ্য করিতে পারি না।"

এক এক করিয়া এই ভাবে ৪। ৫ বৎসর কাটিয়া গেল। দুঃখ কষ্টের প্রাণ সহজে যায় না। এত যন্ত্রণা ও অত্যাচার ভোগ করিয়াও হাবুল আট বৎসরের হইয়া উঠিল। এদিকে কৃষকও দিন দিন তাহার প্রতি অধিকতর নিষ্ঠুরাচরণ করিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় হাবুলের লালন পালনের ভার দিয়াছেন; সহজে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁহার বিরক্তিভাজন হইতেও সাহস হয় না, অথচ এখন সেই বালক যে বড় হইয়া দুই বেলা পূর্ণমাত্রায় তাহার অন্ন ধ্বংশ করিতেছে, ইহাও সেই পাষাণ-হৃদয় কৃপণের প্রাণে সহ্য হইতেছিল না। এই অবস্থায় তাহার মনের যত রাগ ও আক্রোশ সেই অনাথ বালকের উপর দিয়া যাইতে লাগিল। কৃষকপত্নী হাবুলের যে কিছু যত্ন করিতে পারিত সে অতি গোপনে; কারণ তাহার নির্দ্দয় স্বামীর চক্ষে তাহা পড়িলে অভাগিনীর আর ক্লেশের সীমা থাকিত না। যখনই হাবুলের জন্ত দু'টা কথা বলিত স্বামীর প্রহারে তাহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইত। হাবুল তাহার নিজের যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া সেই স্নেহময়ী মাতার যন্ত্রণা দেখিয়া অধিক অস্থির হইত। কৃষক কার্য্য কর্ম্মে গৃহের বাহির হইলে, কৃষকপত্নীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুনয়নে গদগদ স্বরে বলিত,—"মা, আমার জন্তই তোমার এত দুঃখ যন্ত্রণা। আমি মরিলেই আপদ যায়। মা, তুমি আমার আর কোন যত্ন নিও না। তাহা হইলেই আমি শীঘ্র মরিব। কর্ত্তা সুখী হইবেন, তোমার এ সব দুঃখ যন্ত্রণাও ফুরাইবে। কর্ত্তা যখন আমাকে মারেন, ওরূপ অল্পে অল্পে না মারিয়া যদি একেবারে মারিয়া ফেলেন, তাহা হইলেই সব চুকিয়া যায়।" হাবুলের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া কৃষকপত্নী আরও কষ্ট পাইত। হাবুলের মুখচুম্বন করিয়া বলিত,—"বাবা, ওসব কথা বলিও না, উহাতে আমি আরও কষ্ট পাই। পরমেশ্বরকে ডাক। তিনি ভিন্ন আমাদের আর কেহ নাই।" মাতার এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া হাবুল নিয়ত পরমেশ্বরের নিকট মৃত্যু কামনা করিত।

হাবুল এখন বড় হইয়াছে; সুতরাং তাহার এখন বাড়ীর অনেক কাজ করিতে হয়। অন্তান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে মেষ রক্ষা করা তাহার একটী প্রধান কাজ ছিল। অতি প্রত্যুষে মেষের পাল নিয়া মাঠে বাহির হইত, আর সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিত। কৃষকের এই ব্যবস্থায় সমস্ত দিবস হাবুলের সম্পূর্ণ অনাহারে কাটাইতে হইত। কৃষকপত্নী কখন কখনও মাঠে খাইবার জন্ত মুড়ি ইত্যাদি অতি গোপনে তাহার কাপড়ে বাঁধিয়া দিতেন; তাহা না হইলে সমস্ত দিবস উপবাসের পর সন্ধ্যাবেলা বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে পাইত। এই অবস্থায় হাবুল দিন দিন বড়ই দুর্ব্বল ও কৃশ

হইয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত দিন সে মাঠে মেষ চরাইত এবং অসহ্য ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিত। এক দিবস সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া হাবুল মেষপাল নিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, এমন সময় একটা ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার মেষপাল আক্রমণ করিল। হাবুল ছেলে মানুষ; নিজে ভয়ে অস্থির হইল, মেষরক্ষা করা ত দূরের কথা। ঐ ব্যাঘ্র দেখিতে না দেখিতে একটী মেষ মুখে করিয়া পলায়ন করিল। হাবুল নিরুপায় হইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল। গৃহে ফিরিয়া গিয়া কৃষককে সমস্ত জানাইলে কৃষক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। নির্দ্দয় চণ্ডালের প্রহারে সে দিবস হাবুলের পিঠ ফুলিয়া উঠিল। এখন হইতে মেষ রক্ষার ভার অন্য চাকরের হস্তে দিয়া কৃষক হাবুলকে অন্যরূপ অধিকতর কষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত করিল।

নায়েব মহাশয়ের সে দেশে প্রবল প্রতাপ। সকলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সর্ব্বদা ভেট ইত্যাদি পাঠাইত। এক দিবস কৃষক একটী চুপড়ীতে ৫০টি ভাল আম একখানি পত্রসহ হাবুলের মারফৎ নায়েব মহাশয়ের নিকট পাঠাইল। নায়েব মহাশয়ের কাছারী কৃষকের বাটী হইতে অনেক দূরে; সুতরাং সেই বোঝা মাথায় নিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের সেই ভয়ানক রৌদ্রের মধ্যে এত রাস্তা চলিয়া যাইতে হাবুলের প্রাণান্ত হইতেছিল। অধিকাংশ রাস্তা অতি কষ্টে চলিয়া গিয়া অবশেষে হাবুল ক্ষুধা তৃষ্ণায় বড় কাতর হইয়া পড়িল; তাহার আর চলিবার শক্তি রহিল না। একটী জলাশয়ের নিকট বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া ভাবিতেছিল যে, সেই দারুণ বোঝা নিয়া কি প্রকারে অবশিষ্ট রাস্তা চলিয়া যাইবে। এ দিকে ক্ষুধায় তাহার পেট জ্বলিতেছে, তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে। নিতান্ত কাতর ও অস্থির হইয়া ভাল মন্দ কিছু বিবেচনা না করিয়া চুপড়ী হইতে দু'টী আম নিয়া খাইল এবং সম্মুখস্থ জলাশয় হইতে জল পান করিয়া ঠাণ্ডা হইল। এই প্রকারে ক্ষুধাতৃষ্ণা কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিবৃত্তি করিয়া চুপড়ী মস্তকে তুলিয়া নায়েব মহাশয়ের কাছারীর অন্বেষণে রওনা হইল। অধিক রাস্তা আর বাকি ছিল না; সুতরাং অনতিবিলম্বেই হাবুল নায়েব মহাশয়ের নিকট পৌঁছিয়া আম্রপূর্ণ চুপড়ীটী নায়েবের সম্মুখে রাখিয়া চিঠীখানি তাঁহার হস্তে দিল। চিঠীতে লেখা ছিল ৫০টী আম পাঠান হইয়াছে; কিন্তু গণিয়া যখন ৪৮টী পাওয়া গেল, নায়েব মহাশয় হাবুলকে আম কম হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হাবুল ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—"মহাশয় দু'টী আমি খাইয়াছি। এই রৌদ্রের উত্তাপে চলিয়া আসিতে ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমি বড়ই কাতর হইয়াছিলাম, তাই দুইটী আম খাইয়া পথে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছি। আর তাহা না হইলে আমি আজ বোধ হয় এতদূর এই বোঝা নিয়া পৌঁছিতে পারিতাম না।" নায়েব হাবুলের হাতে একখানি চিঠী দিলেন, তাহাতে কৃষককে লিখিলেন যে, আম কম পড়িয়াছে; শীঘ্র যেন আরও আম পাঠান হয়। বলা বাহুল্য যে, হাবুল সে দিবস বাড়ী আসিয়া কৃষকের হস্তে বিলক্ষণ কিছু উত্তম মধ্যম পাইল।

পর দিবস হাবুল আবার আম নিয়া নায়েবের নিকট রওনা হইল। সেদিনও সে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, এবং পেটের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ব্ববৎ আম খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল। কিন্তু পূর্ব্ব দিবস এই অপরাধে কৃষকের হস্তে যে প্রহার ভোগ করিয়াছিল, তাহা যখন মনে পড়িল, ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আজ হাবুল স্থির করিল যে, চিঠীখানি পথে লুকাইয়া রাখিয়া যাইবে, তাহা হইলেইত নায়েব মহাশয়

কত আম পাঠান হইয়াছে জানিতে পারিবেন না। অতঃপর হাবুল পুনরায় রওনা হইয়া কাছারীর নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে চিঠীখানি লুকাইয়া রাখিয়া কেবল আম্রপূর্ণ চুপড়ীটী নায়েবের নিকট নিয়া উপস্থিত করিল। নায়েব মহাশয় কৌতুক করিবার জন্য হাবুলকে ধমক দিয়া বলিলেন,—"কি, আজ আবার আম খাইয়াছ?" তখন হাবুল কাঁপিতে কাঁপিতে সাশ্রুনয়নে বলিল,—"হাঁ মহাশয়, খাইয়াছি। আজও আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বড় কাতর হইয়াছিলাম। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়াই খাইয়াছি। কিন্তু আপনি আজ কি করিয়া জানিতে পারিলেন? চিঠীত আজ আমি পথে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি?" সরল বালকের সেই কথা শুনিয়া নায়েবের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি হাসিয়া হাবুলকে বলিলেন,—"খাইয়াছ বেশ করিয়াছ। কিন্তু বাড়ীতে কি তুমি কিছু খাইতে পাও না? তোমার শরীর এমন কৃশ কেন? এমন ধনী লোকের ঘরে থাকিয়া কি তুমি খাইতে পাও না?" হাবুল কোন উত্তর করিল না; তাহার নয়নদ্বয় হইতে কেবল অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। নায়েব মহাশয় বুঝিলেন কৃষক হাবুলকে ভালরূপ খাইতে পরিতে দেয় না এবং নানারূপ শারীরিক কষ্ট দেয়। তিনি কৃষককে খুব তিরস্কার করিয়া একখানি চিঠী লিখিলেন এবং তাহার মধ্যে জানাইলেন যে, ভবিষ্যতে যদি তিনি শুনেন যে অযথা সেই দুঃখী পিতৃমাতৃহীন বালক তাহার বাড়ীতে ক্লেশ পায়, এবং ভালরূপ খাইতে পরিতে না পায়, তাহা হইলে তাহার প্রতিবিধান করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

হাবুল গৃহে ফিরিয়া আসিয়া কৃষকের হস্তে নায়েব মহাশয়ের সেই চিঠী দিল। কৃষক পড়িয়া ক্রোধাগ্নিতে জলিয়া উঠিল। বজ্র মুষ্টিতে হাবুলের হস্ত ধরিয়া দন্ত কড়মড় করিয়া বলিল,—"তবে রে পাজি, তুই গিয়া এই সমস্ত লাগাইয়াছিস্?" হাবুল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমাকে মারিও না। আমার কোন দোষ নাই, আমি কিছুই তোমার বিরুদ্ধে বলি নাই। তুমি কেন আমাকে এত যন্ত্রণা দেও? তোমার অহিত হয় আমি এমন কিছু করি না। আমার মা বাপ নাই; তোমাকে আমি পিতার ন্যায় দেখি, তোমার পত্নী আমার স্নেহময়ী জননী। আমাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখ। আমি তোমাদের পুত্র।" কৃষক চীৎকার করিয়া বলিল,—"হাঁ হাঁ, আমি সব বুঝিয়াছি। বিটকেল, নেমকহারাম, তুই আমার খাইয়া আবার আমারই বদনাম করিস্। নায়েব তোকে ভাল খাইতে পরিতে দিতে লিখিয়াছে; আয়,—তোকে খাওয়াইতেছি।" এই বলিয়া হাবুলের হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া গৃহের প্রাঙ্গণের এক কোণে বসাইয়া দিল, এবং সম্মুখস্থ স্তূপীকৃত বিচালীখড় দেখাইয়া বলিল,—"আজ তুই কিছু খাইতে পাইবি না। আমি বাহিরে যাইতেছি, দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিব। আসিয়া যদি দেখি আমার গরু ঘোড়ার খাওয়ার জন্য এ সমস্ত বিচালি কাটা হয় নাই, তাহা হইলে তোর মাথা যদি আজ না ভাঙ্গি, আমার নাম মিথ্যা।" এই বলিয়া কৃষক গর্জ্জন করিতে করিতে বাটীর বাহির হইল। হাবুল তখন প্রমাদ গণিল। দুই ঘণ্টায় সে কখনই অত বিচালী কাটিয়া উঠিতে পারিবে না। প্রহারের যন্ত্রণা মনে করিয়া পাগল-প্রায় হইয়া উঠিল। তখন তাহার মনে এক নূতন চিন্তা দেখা দিল। ভাবিল,—"লোকে বলে বিষ খাইলে প্রাণ যায়; আমি কেন বিষ খাই না? তাহা হইলেত এরূপ অল্পে অল্পে জলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে না। কর্ত্তা বলিয়া থাকেন তাঁহাদের শুইবার খাটের নীচে

এক হাঁড়ী বিষ আছে। উহা আনিয়া কেন খাই না?” অতএব হাবুল আর বিলম্ব না করিয়া অলক্ষিত ভাবে শয়ন ঘর হইতে সেই হাঁড়ী আনিয়া তাহার মধ্যস্থ তরল পদার্থ গণ্ডূষে গণ্ডূষে পান করিতে লাগিল।

শয়নের খাটের নীচে হাঁড়ীতে মধু ছিল। পাছে হাবুল কখনও চুরি করিয়া খায় সেই আশঙ্কায় তাহাকে ভয় দেখাইয়া দূরে রাখিবার জন্য কৃষক সর্ব্বদা বলিত যে, খাটের নীচে হাঁড়ীতে বিষ আছে। হাবুল কখনও মধু খায় নাই; সুতরাং সে বিষ বলিয়া মধু খাইতে লাগিল আর মনে করিতে লাগিল,—“আমি ত এখনি মরিব; আহা, মৃত্যু কি মিষ্ট। এইজন্য মা, সর্ব্বদাই মরিতে চাহে। এত মিষ্ট মৃত্যু ছাড়িয়া লোকে কেন এত জ্বালা যন্ত্রণাময় জীবন বহন করে? এতদিনে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা আমার গেল। মাকে একবার বলিয়া মরিলে বড় ভাল হইত। মা আমাকে বড় ভালবাসে। আহা, আমার জন্য কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা ভোগ করে। মাকে একবার ডাকি, একবার তাঁহার চরণ দুখানি মস্তকে রাখি। আর বোধ হয় অধিক বিলম্ব নাই।” চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ মনে করিতেছিল; চক্ষু মেলিয়া দেখিল যে বাস্তবিকই সম্মুখে যম উপস্থিত। কৃষক হাবুলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাগে দন্ত কড়মড় করিতেছিল। সে মনে করিয়াছিল হাবুল চুরি করিয়া মধু খাইতেছে। হাবুল যেমন চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে চাহিল, রাগে অন্ধ হইয়া সেই পামর হাতের লাঠি দ্বারা সজোরে হাবুলের মস্তকে আঘাত করিল। হাবুল ছেলে মানুষ তাহাতে রুগ্ন ও কৃশ; সেই বিষম আঘাতে একবার চীৎকার করিয়াই তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

কৃষকপত্নী রন্ধনশালায় রাঁধিতে ছিল। ডাল সম্বার দিবে বলিয়া কড়াতে তৈল উঠাইয়া দিয়াছে। এমন সময় হাবুলের বিকট চীৎকার ধ্বনি তাহার কাণে গেল। দৌড়াইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যমসদৃশ স্বামীর সম্মুখে হাবুল অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। তখন পাগলিনীর ন্যায় দৌড়াইয়া গিয়া হাবুলকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে তুলিতে গেল। কৃষকের পাষাণহৃদয়ে তখনও কিছুই দয়ার সঞ্চার হয় নাই। স্ত্রীকে ঐরূপ যত্ন করিতে দেখিয়া বলিল,—“পোড়ামুখি, তুইই সব অনর্থের মূল। তুই এ পাজির আস্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছিস। তোকেও আজ রাখিব না।” এই বলিয়া স্ত্রীর মস্তকে হস্তস্থিত যষ্টির প্রহার করিল। কৃষকপত্নীর মাথা ফাটিয়া সবেগে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া হতভাগিনী শেষ সময়ে অতি কষ্টে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—“আমরা মায়ে পুতে চলিলাম। তোমার সব জঞ্জাল গেল। কিন্তু আমার বড় দুঃখ রহিল তোমার ও পাষাণহৃদয়ে একটুও করুণার রেখা একদিন দেখিলাম না। তোমার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে, জানি না। ভগবান করুন, আমাদের মৃত্যুতেই যেন তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।” এই বলিয়া হাবুলকে বক্ষে করিয়া অভাগিনী প্রাণত্যাগ করিল। অবশেষে স্বামীর কঠিন প্রহারেই সেই সতী লক্ষ্মী এত দিনে ভব যন্ত্রণার হাত এড়াইল।

এ দিকে রন্ধনশালায় কড়ার উত্তপ্ত তৈলে অগ্নি ধরিয়া গৃহে অগ্নি লাগিয়া গিয়াছিল। সে দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। যখন সমস্ত গৃহে অগ্নি ধরিয়াছে তখন কৃষকের হুঁস হইল; কিন্তু তখন তাহার কি সাধ্য যে, সে অগ্নি নির্ব্বাণ করে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গৃহ পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হইল। হাবুল ও তাহার স্নেহময়ী জননীর মৃতদেহ সেই ভীষণ চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

ভস্মে ভস্ম মিসিয়া গেল। প্রবল বাত্যা তখন সেই চিতার ভস্ম চতুর্দ্দিকে উড়াইয়া সেই পাষাণ-হৃদয় কৃষককে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এত চেষ্টায় এত আগ্রহে এতদিনে কৃপণ কৃষক যে ধন সঞ্চয় করিয়াছিল, যে ধনক্ষয় ভয়ে হাবুলকে সে এত জ্বালা যন্ত্রণা দিত, মুহূর্ত্ত মধ্যে আজ তাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এই প্রকারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কৃষক অনেক দিন বাঁচিয়াছিল; কিন্তু এক মুঠা অন্নের জন্য সামান্য কুকুর বিড়ালের ন্যায় তাহার দ্বারে দ্বারে লাথি ঝাঁটা খাইতে হইত। তখন তাহার হাবুলের সমস্ত যন্ত্রণা হৃদয়ঙ্গম হইত এবং অভাগা অনুতাপে দগ্ধ হইত।

ধনতৃষ্ণায় অন্ধ হইয়া দুঃখী গরীবকে যাহারা কষ্ট দেয় তাহাদের পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে।



আর আমি ধর্‌বো নাকো দুষ্ট প্রজাপতি।

ছুটী হ'ল হাড় জুড়ালো, দৌড়ে ঘরে যাই।
বই রেখেদে দেখি যদি খাবার কিছু পাই।
বারে বাহার এত খাবার কে গিয়াছে রেখে।
ভাগটা নিয়ে পরে খাব আগে দেখি চেখে।
এ দিকে যে খাচ্ছে খাবার দুষ্ট প্রজাপতি।
আর দেরি নাই একটু থাক শিক্ষা দিবে মতি।
মাঠে নাই ঘাস এত বড় আশ খাবার কেড়ে খাও।
যেমন আশা তেমনি দশা যমের বাড়ী যাও।
ব'লে মতি থাবা দিয়া যেই ধরেছে তায়।
ভীমরুলটা ভীমের মত হাতে হুল ফুটায়।
বিষের জ্বালায় হাত জ্বলে যায় বাপ্‌রে একি জ্বালা।
ছাদ ছাড়ায়ে উঠ্‌লো বেয়ে মতি বাবুর গলা।
মায়ের কাণে কান্না গেল দৌড়ে এলেন মা।
কোলে লয়ে বল্লেন বাছা কান্না কেঁদ না।
এই যে সোণা খাবার আছে আগে নিয়ে খাও।
তার পরে ধন এনে দিব যাহা তুমি চাও।
মতি বাবু আস্তে কেঁদে হাতটী ধরে কয়।
মাগো আগে বল কিসে জ্বালা ভাল হয়।
খাবার কেড়ে খাচ্ছিল সে দুষ্ট প্রজাপতি।
আরো আমার হুল ফুটা'য়ে করেছে দুর্গতি।
এতক্ষণে চিন্তা গেল সুস্থ হ'লেন মা।
কোলে লয়ে বল্লেন বাছা কথা শুন না।
কত দিন বলেছি আমি ওরে বাছা মতি।
ধরিস্ নারে ছেড়ে দেরে দুষ্ট প্রজাপতি।
আমার কথায় আরো হেসে পাখ ছিঁড়েছ তায়।
এখন বুঝ পাখা ছেঁড়ার জ্বালা কি প্রকার।
তোমার জ্বালা তুমি বুঝ তারা বুঝে না।
মনে কর এরা তো আর কথা বলে না।
কথার মাঝে নাই কিছু তো বোবা ছেলে যে।
কষ্ট পেলে মনে মনে কেঁদে মরে সে।
আজ হ'তে ধন শিখে রাখ কষ্ট কি প্রকার।
প্রজাপতির গায়ে তুমি হাত দিও না আর।
তা হলে ধন এমন জ্বালা পাবে না কখন।
এমন ক'রে কাঁদবে নাকো হয়ে জ্বালাতন।
লজ্জা পেয়ে হাড়ের জ্বালায় ব'লে উঠে মতি।
আর আমি ধর্‌বো নাকো দুষ্ট প্রজাপতি।

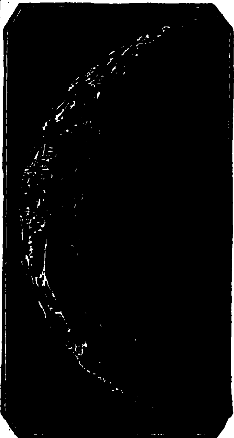


চাঁদ।


কাশে আমরা যত জিনিস দেখিতে পাই তাহার মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিতই আমাদের অধিক সম্বন্ধ। সূর্য্যের জন্যই আমরা প্রাণে বাঁচিয়া আছি; পৃথিবীও সুন্দর শ্যামল তৃণক্ষেত্রে আবৃত। সূর্য্য না থাকিলে পৃথিবীতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর নাম মাত্র থাকিত না। সমস্ত পৃথিবী বরফ অপেক্ষাও হিমপিণ্ডে পরিণত হইত।

সূর্য্যের সহিত আমাদের এমনি জীবন মরণের সম্বন্ধ। চন্দ্রের সহিত সেরূপ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। যেন একই রক্ত মাংসের সম্বন্ধ।

প্রাচীন কালে সকল দেশের লোকেরা সূর্য্য ও চন্দ্রকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। কবিরাও চন্দ্রের কমনীয়রূপে ও মধুর জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ হইয়া কতই না ইহার গুণগান করিয়াছেন।



সূর্য্যের গতি দ্বারা (বাস্তবিক পৃথিবীর গতি দ্বারা, কারণ সূর্য্য স্থির ভাবেই থাকে) যেরূপ সময় নির্ণয় করা হয়, সেইরূপ চন্দ্রের গতি দ্বারাও এক প্রকার সময় নির্ণয়ের প্রথা অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যেমন একদিন হয় তেমনি চন্দ্রোদয় হইতে পর দিবস চন্দ্রোদয় পর্য্যন্ত এক চান্দ্রদিন হয়। ইহাকে তিথি বলা যাইতে পারে। যে দিবস চন্দ্রোদয় হয় না সে দিন অমাবস্যা। অমাবস্যার পর দিবস বা তাহার দুই দিবস পরে, দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া তিথির সময়ে চন্দ্রকে বক্র শৃঙ্গের মত বা 'চন্দ্রপুলী'র মত দেখায়। চিত্র দেখ। এই চন্দ্র সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে থাকে এবং উহার বাহিরের ফুলা গোল দিকটা সূর্য্যের দিকে থাকে। এই শৃঙ্গের মধ্যস্থলের স্থূলতা ক্রমেই বাড়িতে থাকে, এবং ভিতরের দিকের গর্ত্তের বক্ররেখা ক্রমে সরল হইয়া যায়। তখন অর্দ্ধচন্দ্র হয়। এটা সপ্তমী বা অষ্টমীর সময়। তার পর দিন দিন এই সরলরেখা আবার অপর দিকে বক্র হইতে থাকে এবং ক্রমে সমস্তটা পূরিয়া আসিয়া একটা থালার মত আকার হয়। ইহাই পূর্ণচন্দ্র ও এই সময়কে পূর্ণিমা বলে। যে সময়টা চাঁদ শৃঙ্গের ন্যায় আকার হইতে ক্রমে থালার ন্যায় আকার ধারণ করিতে থাকে তাহাকে শুক্লপক্ষ বলে। শৃঙ্গের মত থাকিয়া পূর্ণচন্দ্র হইতে প্রায় চৌদ্দ দিন লাগে। শুক্লপক্ষে দেখিতে পাইবে চন্দ্র ক্রমেই সূর্য্য হইতে পশ্চাতে পড়িয়া যায়। উদয় হইতেও ক্রমে বিলম্ব হইতে থাকে। পূর্ণিমার পর হইতে আবার ইহার বিপরীত হইতে থাকে। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার সময়ে যে দিকটা আলোকিত ছিল এখন সেই দিকটা অদৃশ্য হইতে থাকে। থালাটা ক্রমে একধার হইতে ক্ষয় পাইতে থাকে অবশেষে সাত আট দিন পরে আবার অর্দ্ধচন্দ্র হয়। শুক্লপক্ষের অর্দ্ধচন্দ্রের সময়ে যে অর্দ্ধেক আলোকময় ছিল এবার সেই অর্দ্ধেক অন্ধকারময় হইল, ও অন্ধকার অর্দ্ধেকটা আলোকময় হইল। আবার কয়েক দিবস পরে শুক্লপক্ষের তৃতীয়াও দ্বিতীয়ার চাঁদের মত আকার হয়। এবারও গর্ত্ত দিকটা সূর্য্য হইতে দূরে ও গোল দিকটা সূর্য্যের দিকে ফিরান থাকে। যে সময়তে চাঁদ ক্রমাগত হ্রাস

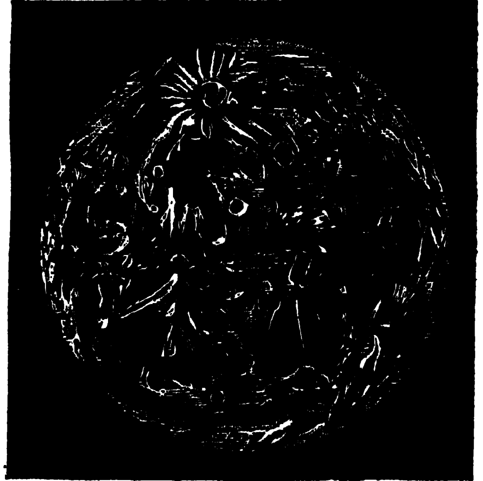
হইতে থাকে তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া বা দ্বিতীয়ার সময়ে চাঁদ সূর্য্যের আগে আকাশে উদয় হয়। অর্থাৎ শেষ রাত্রে উদয় হয়। তার কয়েক ঘণ্টা পরে সূর্য্য উদয় হয়। এই সময়ে চাঁদ সূর্য্যের পশ্চিম দিকে থাকে। যে সময়ে চন্দ্র একবারেই দেখা যায় না সে সময়কে অমাবস্যা বলে। চন্দ্রের এই হ্রাস বৃদ্ধিকে চন্দ্রের কলা বলে। এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা বা এক পূর্ণিমা হইতে অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এক চান্দ্রমাস হয়। ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ২ সেকেণ্ডে চাঁদের এক মাস হয়।

হিন্দু, মুসলমান ও ইহুদীরা চান্দ্র সময় ধরিয়া বা তিথি হিসাবে পূজা আদি ও অনেক সামাজিক ক্রিয়া কলাপ করিয়া থাকেন।

চন্দ্রের এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় যে, চাঁদ নিজে দীপ্তিমান নহে। চাঁদের যদি নিজের আলো থাকিত তবে সব সময়েই চাঁদকে সূর্য্যের মত গোল দেখিতে পাইতাম। চন্দ্রের এরূপ হ্রাস বৃদ্ধি কেন হয় তাহা বারান্তরে বুঝাইব। তবে এইটুকু জানিয়া রাখ যে, "চাঁদের" আয়তনের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তবে যখন যেটুকুর উপর সূর্য্যের আলো পড়ে তখন আমরা সেইটুকু দেখিতে পাই।

রাত্রে চাঁদকে খুব উজ্জ্বল দেখায়, কারণ আকাশে চতুর্দ্দিকই অন্ধকার কাযেই একটু আলোই খুব উজ্জ্বল দেখায়। দিনের বেলায় যখন আকাশে চাঁদ দেখা যায় তখন একখণ্ড সাদা মেঘ অপেক্ষা উজ্জ্বল দেখায় না।

চাঁদকে সূর্য্যের মত বড় দেখাইলেও বাস্তবিক সূর্য্যের মত বড় নয়। তোমরা জান নিকটের বস্তু অপেক্ষা দূরের বস্তু ছোট দেখায়। খুব দূরের একটা হাতীকেও নিকটের একটা ছাগলের অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখাইতে পারে। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন পৃথিবী হইতে চন্দ্র ১,১৯,৪১১ এক লক্ষ উনিশ হাজার চারি শত এগার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আর সূর্য্য ৪,৬০,০০,০০০ চারি কোটী ষাট লক্ষ ক্রোশ দূরে। এ যে কত দূর তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। পৃথিবী হইতে চাঁদ অপেক্ষা সূর্য্য প্রায় চারি শত গুণ দূরে। পৃথিবী হইতে চন্দ্র অনেক দূরে বটে, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে যতটা ব্যবধান কেবল সূর্য্যের এক ধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত অর্থাৎ এপার ওপার ইহা অপেক্ষা প্রায় চারি গুণ ব্যবধান। পৃথিবীই চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় উনপঞ্চাশ গুণ বড় হইবে। এই পৃথিবী আর চন্দ্রকে একত্র না করিয়াও যতটা দূরে আছে সেই দূরে রাখিয়া যদি সূর্য্যের উপর ফেলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও সূর্য্যের দেহের এক চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া পড়িয়া থাকে।



চাঁদে অনেক কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দাগ সম্বন্ধে অনেক দেশে অনেক 'গাঁজাখুরি' কথা প্রচলিত আছে। চীনেরা বলে চাঁদে খরগোস আছে তাই ওরূপ কাল কাল দাগ

দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক অসভ্য জাতি ও আমাদের দেশের অনেক লোকে বলে চাঁদে বুড়ি আছে সে 'চর্‌কা' কাটে।

তোমাদের কাহারও যদি দূরবীণ থাকে বা কোন বন্ধুর নিকট চাহিয়া লইয়া যদি তাহার ভিতর দিয়া দ্বিতীয়া বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখ তবে অনেকটা এই দুই চিত্রের মত দেখিতে পাইবে। একটা ছোট দূরবীণ দিয়া দেখিলেই ঐরূপ দেখা যায়। পূর্ব্বেকার লোকেরা বিশ্বাস করিতেন যে কাল অংশগুলি সমুদ্রের জল আর উজ্জ্বল অংশগুলি ভূমি। জল অপেক্ষা মৃত্তিকার আলোক পরাবর্ত্তনের ক্ষমতা অধিক বলিয়া চাঁদে সূর্য্যের আলো পড়িলে ভূ-খণ্ডগুলি জলাংশ অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল দেখায়। এখন পণ্ডিতেরা বলেন যে, কাল অংশগুলি নিম্নভূমি বা গর্ত্ত স্থান আর উজ্জ্বল অংশগুলি উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে চন্দ্রে অনেক ছোট গোল গোল আঙ্গটীর মত উজ্জ্বল দাগ দেখিতে পাইবে ঐগুলি পর্ব্বত, এক সময়ে আগ্নেয়গিরি ছিল। ঐগুলি যে পর্ব্বত তাহা শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে বুঝা যায়। পূর্ব্বের চিত্রে দেখ, চন্দ্রের ভিতর দিকের রেখা কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা। আর তার ধারে কাল অংশের মধ্যে দু চারিটা সাদা সাদা দাগ দেখিতে পাইবে। সেগুলি উচ্চ পর্ব্বত। শিখর দেশে অগ্রে আলোক পতিত হইয়াছে বলিয়া উজ্জ্বল দেখাইতেছে। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতের শিখরদেশ সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত হইলেও নিম্নদেশের নগর ও গ্রাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে।

ক্রমশঃ।

অজিত কুমার।

প্রথম অধ্যায়।

বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমে কতকগুলি পাহাড় ও গণ্ডশৈল দৃষ্ট হয়। ইহারই একটীর নিকট একটী পাথরিয়া কয়লার খনি। খনিতে বহু সংখ্যক শ্রমজীবী কার্য্য করিয়া থাকে। পাহাড়ের একটী ক্ষুদ্র উপত্যকায় তাহাদিগের বাস। পাঠক! চল আমরা একটী ক্ষুদ্র কয়লা খনকের বাড়ীতে প্রবেশ করি।

দূর হইতে দেখিলে বাড়ীখানি অতি সামান্য ও জরাজীর্ণ দেখায়। দুইখানি সামান্য কুটীর। একখানি রন্ধন ও একখানি শয়নের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতিবেশীদিগের ঘরের মধ্যভাগ যেমন বিশৃঙ্খল ও অপরিষ্কার, এ বাড়ী সেরূপ নয়। রান্না ঘরখানি ধূমে কাল হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার কোথাও ঝুল বা আবর্জ্জনা নাই। দেওয়ালগুলি ও মেজে পরিষ্কার ও খট্‌খটে। এক কোণে দুইটী মেটে কলসীতে জল রহিয়াছে। এক ধারে তিনখানি মেটে পাথর, একটী ঘটী, দুইটী গেলাস ও তিনটী বাটী সাজান রহিয়াছে। রান্নার জিনিসগুলি বেশ নির্ম্মল ও পরিষ্কার। অপর ঘরখানি আরও পরিষ্কার। ভিতরে তিনখান অপরিসর তক্তপোষ। বালিশ ও বিছানাগুলি সামান্য রকমের হইলেও বেশ পরিষ্কার। এক পাশে কাপড়গুলি গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। একখানি ধরিয়া টানিলে সকলগুলি পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। এক কোণে একটী ছোট কাঠের বাক্স। আর দুই একটী আবশ্যকীয় সামগ্রী

গৃহের অন্য পাশে সাজান রহিয়াছে। বাহিরে একটী ক্ষুদ্র উঠান—বেশ পরিষ্কার ও ধূলি বর্জ্জিত। দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র ফুলের বাগান। তাহাতে বেল, গোলাপ, যুঁই প্রভৃতি নানা জাতি ফুল ফুটিয়াছে। বাগানের এক পাশে বসিবার ও শুইবার জন্য এক বৃহৎ প্রস্তরফলক ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। উত্তর দিকে কয়েকটী তাল গাছ। অন্যান্য দিকে কয়েকটী ফলের গাছ বেশ শৃঙ্খলা মত শোভা পাইতেছে। বাড়ীতে দারিদ্র্যের অধিকার বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও সুরুচি ও শৃঙ্খলা ইহাকে বেশ দর্শনীয় করিয়া রাখিয়াছে। চল এই সন্ধ্যালোকে বাড়ীর অধিবাসীরা বাগানে বসিয়া কি করিতেছে একবার দেখিয়া আসি।

রামরূপ সর্দ্দার এই বাড়ীর অধিস্বামী। ইহার দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠের নাম অজিতকুমার। ইহার বর্ণ সুন্দর, অঙ্গ দৃঢ় ও সরল। চক্ষু বৃহৎ ও উজ্জ্বল। এক বার মাত্র দেখিলেই বুঝা যায় অন্যান্য বালকেরা সচরাচর যে সকল উপাদানে গঠিত হয় অজিতকুমার সে প্রকৃতির বালক নহে। মধ্যম পুত্রের নাম অরুণকুমার। ইহার অবয়ব প্রায় জ্যেষ্ঠের মত। তবে রং একটু ফরসা। মুখখানি সর্ব্বদা হাসিময়—অজিতকুমারের মুখের ন্যায় গম্ভীর নহে। কনিষ্ঠ কন্যা—আদরিণী। আদরিণীর জন্ম হইতেই বাক্‌শক্তি বর্জ্জিতা এবং কাণেও শুনিতে পায় না। কিন্তু আদরিণীর ন্যায় রূপ লাবণ্যময়ী কন্যা প্রায়ই দরিদ্রের কুটীর শোভিত করিতে দেখা যায় না। আদরিণীর বাক্‌শক্তি ও শ্রবণশক্তি না থাকিলেও তাহার অসাধারণ বুদ্ধি ও অনুকরণ ক্ষমতা তাহার সে অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে একবার যাহা দেখাইয়া দেওয়া যায় তাহা আর দেখাইতে হয় না। সে সকল রকমের সঙ্কেতই অতি সহজে বুঝিতে পারে। আদরিণীর বয়স এক্ষণে ৯ বৎসর—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে ৪ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইতে ২ বৎসরের ছোট। আদরিণীর ৫ বৎসর বয়সে মাতার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আদরিণীই সংসারের সকল কার্য্য করিয়া থাকে। কয়েক মাস হইল সে রাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে; এক্ষণে প্রায় সকল প্রকারের রান্নাই এক প্রকার শিখিতে পারিয়াছে।

রামরূপ সারাদিন খাটিয়া আসিয়া একটু জলযোগের পর বাগানে প্রস্তর ফলকের উপর শুইয়া পড়িয়াছে। অজিত ও অরুণ ফুলের গাছ সকল নিড়াইয়া দিতেছে। আদরিণীর কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য নাই। আকাশে একখান অগ্নিবর্ণের মেঘ হইয়াছে। আদরিণী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছে।

বালিকা অনেকক্ষণ ধরিয়া মেঘ দেখিল। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রশান্ত মুখশ্রী একটু বিবর্ণ ও মলিন হইয়া আসিল। অবশেষে অজিতকুমার যেখানে গাছ নিড়াইতেছিল সেখানে যাইয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিল এবং অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তাহাকে মেঘ দেখাইল। অজিতকুমার মেঘ দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—"বাবা, দেখ আগুনে মেঘ করিয়াছে। একবার এই মেঘে ঝড় বৃষ্টি হইয়া লোকের কেমন সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। এখন কি করা?"

রামরূপের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, পুত্রের চীৎকার শুনিয়া জাগিয়া উঠিল। এবং আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল "ভয় কি? আগুনে মেঘ হইলেই কি ঝড় হয়? আর হইলেই বা কি? আমাদিগের কেমন শক্ত ঘর! ঝড়ে কি করিতে পারে?" দিবসের খাটুনিতে রামরূপের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে আবার প্রস্তরফলকে শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

অজিতকুমার পিতার নির্ভয় ভাব দেখিয়া আবার নিড়াইতে লাগিল। আদরিণী এক দৃষ্টে আকাশ দেখিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মেঘখানি পাহাড়ের আড়াগে অদৃশ্য হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছে না। হুস্ হুস্ করিয়া ঝড় বৃষ্টি হইতেছে। মড়মড় শব্দে কি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অজিতকুমার সেই শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, ভয়ানক ঝড়। ঘরের মধ্যে জল আসিয়াছে। বাতাসে ঘর দুলিতেছে। গভীর নিদ্রা হইতে উঠিয়া এই ভয়ানক দৃশ্যে অজিত হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইল, বাহির হইয়াই অজিত বিদ্যুতালোকে দেখিল রান্না ঘর পড়িয়া গিয়াছে। কল্‌কল্ শব্দে পাহাড় হইতে জল নামিয়া আসিতেছে। অজিত বুঝিল আজ রক্ষা নাই। দৌড়াইয়া ঘরে প্রবেশ করিল,—দেখিল অরুণ বাহির হইয়াছে—আদরিণীর তক্তপোষ জলে ভাসিতেছে, তবু তাহার ঘুম ভাঙ্গে নাই। অজিত তাহাকে পাথালি কোলে লইয়া বাহিরে আসিল। এই সময়ে হুহু করিয়া বায়ু বহিল, কড়কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মড় মড় শব্দে রামরূপের শয়ন ঘর পড়িয়া গেল। সন্ধ্যার সময় রামরূপ যে ঘরের অহঙ্কার করিয়াছিল—এক্ষণে সে অহঙ্কার চূর্ণ হইল। কিন্তু রামরূপ কোথায়?

দিবসের পরিশ্রমে রামরূপ অসাড় হইয়া ঘুমাইতেছিল। ঝড় হঠাৎ এমন উঠিয়া আসিয়াছিল যে, কেহ সাবধান হইবার সময় পায় নাই। অজিত ও অরুণও জাগরিত হইয়া চীৎকার করে নাই। সুতরাং এ পর্য্যন্ত রামরূপের ঘুম ভাঙ্গে নাই। ঘর তাহার উপরই পড়িয়া গেল। রামরূপ চীৎকার করিয়া উঠিল। অজিত ও অরুণ আদরিণীকে প্রস্তরফলকে রাখিয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে রামরূপকে বাহিরে আনিল। তখন রামরূপ মূর্চ্ছিত। ঘরের একটী কাঠ রামরূপের এক বাহুর উপর পড়িয়া গিয়াছিল—হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্ধকারে অজিত ও অরুণ তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহারা পিতাকে আনিয়া প্রস্তরফলকে আদরিণীর পার্শ্বে রাখিল। পিতা মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে বুঝিতে পারিল না।

হায় মানুষের অদৃষ্ট! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহারা শান্তিপূর্ণ কুটীরে প্রশান্ত হৃদয়ে ঘুমাইতেছিল; এক্ষণে তাহারা গৃহহীন নিঃসহায় হইয়া পড়িল। এক্ষণে তাহাদিগের ঝড় বৃষ্টির আক্রমণ হইতে মাথাটি লুকাইবার স্থান নাই, পরামর্শ লইবার লোক নাই। অজিত ও অরুণ সেই অন্ধকার রজনীতে, সেই ঝড় ও বৃষ্টি মাথায় করিয়া পিতার মূর্চ্ছিত দেহ ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আর আদরিণী!—সেই বাক্‌শক্তি বিহীনা বালিকার অন্তর্যাতনা অন্তর্যামী ভগবানই জানিতে লাগিলেন। পাঠক পাঠিকাগণ! এই অনাথ বালক বালিকাগণের সেই সময়ের অবস্থা একবার অনুভব করিয়া দেখ।

ক্রমশঃ।



সাপ পূজা।

কোন ফরাসী প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আফ্রিকা দেশের সেনিগাল প্রদেশে নানা জাতীয় পক্ষীর বিষয় অনুসন্ধান করিতে গমন করেন। সেই প্রদেশের কোন প্রধান ব্যক্তির বাটীতে এক দিবস তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। বাটীর চতুর্দ্দিকে খুব বন ছিল। গৃহস্বামী সেই দেশের প্রথা অনুসারে অতিথির আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য কতকগুলি কাফ্রী স্ত্রী ও পুরুষের নাচ গানের আয়োজন করিয়াছিলেন। নর্ত্তক নর্ত্তকীরা নাচ গান করিতেছিল তিনি গৃহস্বামীর সহিত বসিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। হঠাৎ, সেই ঘরের খড়ের চাল হইতে একটী প্রকাণ্ড বিষধর সর্প নামিয়া আসিয়া ফরাসী পণ্ডিতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি ভীত হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন, এবং বাঁশের লাঠি লইয়া এক আঘাতেই সর্পের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অমনি দল সুদ্ধ লোক চীৎকার করিয়া তাহাদের ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং এই ভয়ানক অন্যায় কার্য্যের জন্য তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। গৃহস্বামী সেই দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই অতি কষ্টে তাঁহার অতিথিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নতুবা তাহারা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিত।

অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, কাফ্রীরা ঐ সর্পকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করে, গৃহে বাস করিতে দেয়, বিছানায় শুইতে আসিলে ও পালিত হাঁস মুরগী খাইলেও কোন আপত্তি করে না। আমাদের দেশেও মনসা পূজা অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। পশ্চিমে অনেক জাতি আছে যাহারা গোখুরা সাপ মারে না।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রী কুমারী বিধুমুখী বসু দ্বিতীয় এল. এম্. এস্ ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই পরীক্ষোত্তীর্ণা প্রথম স্ত্রী-ডাক্তার হইলেন।

বেথুন কলেজ হইতে এবার তিন জন বাঙ্গালী ছাত্রী বি, এ পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষার অনার বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইহাদের নাম :—কুমারী সরলা ঘোষাল, কুমারী শরৎ চক্রবর্ত্তী ও কুমারী এথেল রাফেল। শেষের দুই জন খ্রীষ্টিয়ান বালিকা।

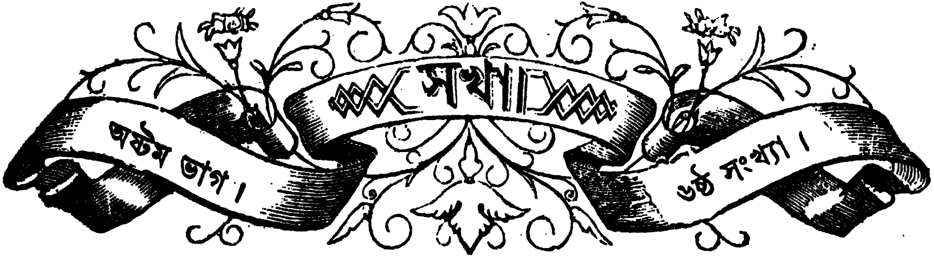
এফ, এ পরীক্ষায় বেথুন কলেজ হইতে কুমারী চারুপ্রভা বসু, কুমারী প্রিয়বালা বাগ্‌চী ও কুমারী যামিনী সেন উত্তীর্ণা হইয়াছেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কুমারী মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী অশোকলতা দে ও কুমারী এগ্‌নীস দত্ত।

মান্দ্রাজের শ্রীমতী জগন্নাথম্ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন দেশীয় মহিলা এডিনবরার উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ইনি বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তা দ্বিতীয় স্ত্রী-ডাক্তার হইলেন।

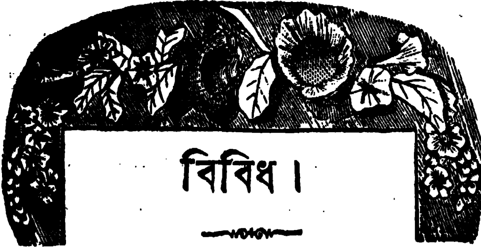
ধাঁধা।

১। আমার ভয়ে দুষ্ট লোকেরা অস্থির। অথচ আমার দা খানি কাড়িয়া লইলে আমাকে ভারি রোগা দেখাইবে। বল ত আমি কে?

২। মাটিতে রয়েছি আমি পৃথিবীতে নাই।
মাখনে খুঁজিলে পাবে ঘোলে দুধে নাই॥
বল দেখি স্থির করি কি নাম আমার।
আমারে জানে না যেই বৃথা জন্ম তার॥



জুন, ১৮৯০।



বিবিধ।

বালিকার সাহস।—বিহারের নীলকর মোরী সাহেব একজন বিখ্যাত শিকারী। তিনি একদিন শিকারে বাহির হইয়াছিলেন—সঙ্গে অনেকগুলি লোকজন ছিল, তাঁহার একটী অল্প বয়স্কা কন্যাও ছিলেন। ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহার কন্যাও পিতার পশ্চাতে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা দাঁতাল শূকর গভীর জঙ্গল হইতে বাহিরে আসিয়া মোরী সাহেবের ঘোড়ার সম্মুখে পড়িল। শূকরের গর্জ্জন শুনিয়া ঘোড়া ভয়ে চমকিয়া উঠিল, সাহেব ঘোড়া হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। যেই ঘোড়া হইতে পড়া, আর অমনি অচেতন। শূকর তখন ঘোড়া ছাড়িয়া মূর্চ্ছিত শোয়ারের উপর আক্রমণ করিতে ছুটিল। সঙ্গীর লোকজন তখন কেহই তাঁহার নিকট ছিল না। পিতাকে এরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া, কন্যা আপন জীবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, পিতার সাহায্যার্থ ছুটিলেন। হয়ত ভয়ঙ্কর দাঁতালের আক্রমণে পিতা পুত্রী উভয়েরই প্রাণ বিনষ্ট হইত; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে সেই বালিকার সঙ্গে তাঁহার একটা শিকারী কুকুর ছিল। কুকুরটা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিয়া শূকরের উপর পড়িল, এবং শূকর ও কুকুর পরস্পরের লড়াই করিতে করিতে দূরে সরিয়া গেল। ইত্যবসরে বালিকা তাহার টুপীতে করিয়া নিকটবর্ত্তী একস্থান হইতে জল আনিয়া অচেতন পিতার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তখন লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতৃ-বৎসলা কন্যার সৎসাহসে মোরী সাহেব প্রাণে রক্ষা পাইলেন। ইংরেজ বালিকার পক্ষেই এরূপ সাহসিকতা সম্ভবে। আমাদের দেশের বালিকার কথা দূরে থাকুক, বালকেরও এরূপ সাহস সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ইয়ুরোপের বালক বালিকাদের এরূপ সৎসাহসিকতার কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের এই সকল সৎগুণ ও সৎসাহস আমাদের দেশের বালক বালিকাদের অনুকরণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

* * *

রমণীর প্রতিভা।—অধ্যাপক ফসেট সাহেব ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্ট নামক মহাসভার একজন ক্ষমতাপন্ন সভ্য ছিলেন। সেই মহাসভায় তিনি ভারতবর্ষের অনেক হিতকর বিষয়ের আলোচনা উত্থাপন করিতেন,—ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর কল্যা-

ণের জন্য অনেক চেষ্টা করিতেন। তিনি বিলাতের ডাক বিভাগের কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার আমলে ডাকবিভাগের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তিনি এত কাজ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মহামতি ফসেট অন্ধ ছিলেন। তবে সৌভাগ্যগুণে তিনি পরম গুণবতী স্ত্রী পাইয়াছিলেন। যেমন স্বামী, তেমন স্ত্রী যুটিয়াছিল; সোণায় সোহাগা মিলিয়াছিল, মণি-কাঞ্চনের যোগ হইয়াছিল। স্বামী ব্যবহারদর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, স্ত্রী তাঁহার পাঠের সাহায্য করিতেন; রাজকীয় ও অপরাপর সকল কাজে লেখক ও পাঠকের কাজ নির্ব্বাহ করিতেন। ব্যবহার-দর্শন সম্বন্ধে বিবি ফসেটের একখানি গ্রন্থ আছে। আমাদের দেশের যে সকল ছাত্র বি, এ, পরীক্ষায় ব্যবহার-দর্শন পড়েন, তাঁহারা বিবি ফসেটের সেই বই আদরের সহিত পড়িয়া থাকেন। ফসেট সাহেবের ব্যবহার-দর্শনের যে গ্রন্থ বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য, তাহার ভূমিকাতে তিনি সেই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার স্ত্রীর সাহায্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই বইতে এখন যে সকল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন পড়ে, বিবি ফসেটই তাহা করিয়া থাকেন। স্বামীর সাহায্য ব্যতীত তিনি ইংলণ্ডের স্ত্রীজাতির উন্নতি কল্পে অনেক কাজ করিতেন। কয়েক বৎসর হইল অধ্যাপক ফসেটের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। স্বামীর মৃত্যুতে বিবি ফসেটের স্বামী-সেবার অপার সুখ ফুরাইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার জনহিতকর কার্য্য বন্ধ হয় নাই। ইংলণ্ডের ন্যায় সভ্য দেশেও অনেক জ্ঞানী, গুণী স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী ছিলেন,—এখনও অনেকে আছেন। কিন্তু এই দম্পতিযুগল আজীবন উচ্চশিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের কন্যা কুমারী ফিলিপা ফসেটকে উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন। কুমারী ফসেট কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত রেঙ্গলার পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থানীয়া হইয়াছেন। এই পরীক্ষা ইংলণ্ডের বিশ্বরিদ্যালয় সমুহের মধ্যে গণিত শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা। আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত একমাত্র বাবু আনন্দমোহন বসু এম, এ, বারিষ্টার, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। কুমারী ফসেট পরীক্ষায় শুধু সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন, তাহা নহে; তিনি এত নম্বর পাইয়াছেন যে, এই পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত আর কোন পরীক্ষার্থীই এত অধিক নম্বর রাখিতে সমর্থ হন নাই। যেরূপ গুণবান পিতা, গুণবতী মাতা,—তেমনি মনস্বিনী কন্যা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এ বৎসর আর একটী মহিলা প্রাচীন ভাষার পরীক্ষাতে সর্ব্ব প্রথম স্থানীয়া হইয়াছেন। আমাদের দেশের কোন কোন মহিলাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পুরুষদের সহিত প্রতিযোগীতা করিতেছেন। এখন আর স্ত্রীজাতির প্রতিভা সম্বন্ধে কাহার কোনও রূপ সন্দেহ করিবার যো নাই।

* *
*

ক্রীড়াক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষে প্রতিযোগীতা।—বোম্বের শাসনকর্ত্তা লর্ড হেরিস্ ইংলণ্ডের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যাট-বল খেলোয়ার। কয়েক বৎসর হইল, তিনি তাঁহার সহচরদের লইয়া অষ্ট্রেলিয়া দেশে দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। তথায় তিনি খেলাতে জয়ী হইয়া আইসেন। আমাদের দেশের বড় লোকেরা কোনও রূপ শারীরিক পরিশ্রমজনক খেলায় লিপ্ত হওয়া যেরূপ নিন্দনীয় বোধ করেন, ইয়ুরোপে সেরূপ নহে; তথাকার বড় লোকেরা সেরূপ ক্রীড়াতে লিপ্ত হওয়া বরং গৌরবের বিষয়ই মনে করেন। আমাদের দেশের পুরুষের সম্বন্ধেই যখন এ কথা, তখন স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ত আর কথাই নাই। ইয়ুরোপ-

খণ্ডেও স্ত্রীলোকেরা অন্যবিধ অল্প শারীরিক পরিশ্রম-জনক ক্রীড়াতে অভ্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রিকেট খেলা ইতিপূর্ব্বে কখনও খেলেন নাই; সম্প্রতি ইংলণ্ডে ও মার্কিনে রমণীগণ এই খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—পুরুষদের সহিত প্রতিযোগীতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ভারতবর্ষেও ইংরেজ রমণীগণ ব্যাটবল খেলা আরম্ভ করিয়াছেন। সেদিন বোম্বে নগরে এইরূপ এক খেলা হইয়া গিয়াছে। লর্ড হেরিস্ তাঁহার ১১ জন ক্রীড়া-সহচর সহ একদল রমণীর সহিত খেলাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুরুষদলে তিনি অধিনায়ক, আর স্ত্রীদলে তাঁহার পত্নী অধিনেত্রী। সবল পুরুষদের সজোর বল-নিক্ষেপে অবলা নারীগণের ভীতি-বিহ্বল চিত্র, "বলের" পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাদের ধাবন-দৃশ্য প্রভৃতি দর্শকবৃন্দের বড়ই নয়নরঞ্জন ও হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল। ক্রীড়াক্ষেত্রে রমণী খেলোয়ার দল অবশ্য হারিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা নিরাশ বা ভগ্নোৎসাহ হন নাই; লেডি হেরিস্ এবং অপর একটী মহিলা খেলাতে বেশ চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা নিয়মিতরূপে এই ক্রীড়া অভ্যাস করিতে সংকল্প করিয়াছেন। আগামী শরৎ ঋতুতে পুনার মহিলা ও বোম্বের মহিলাদের মধ্যে এই খেলার প্রতিযোগীতা হইবে। ক্রমে তাঁহারা পারদর্শিতা লাভ করিলে পুরুষ খেলোয়ারদের সহিত আবার প্রতিযোগীতায় প্রবৃত্ত হইতে সংকল্প করিয়াছেন।

* *
*

অনাহারে জীবন ধারণ।—সাক্কী নামে ইয়ুরোপের এক ব্যক্তি ক্রমাগত ১৫।২০ দিন অনাহারে থাকিয়া পৃথিবী শুদ্ধ লোককে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিতেছে। কত লোক তাহার এই বাহাদুরী দেখার জন্য তাহাকে দেখিতে আসিয়া থাকে এই উপায়ে সে বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। অনেকের ধারণা ছিল, সাক্কীই জগতে সর্ব্ব প্রথম এই অদ্ভুত কাণ্ড প্রদর্শন করিল; কিন্তু সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্ স্কট নামে একজন পাগলাটে রকমের পাদ্রি এক মোকদ্দমাতে জড়িত হইয়া খরচ বহনে অসমর্থ হন, এবং অবশেষে এক ধর্ম্মালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তথায় ৩২ দিন পর্য্যন্ত উপবাসে কাটাইয়াছিলেন। তার পর, তিনি ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় হেনরির স্ত্রী-পরিত্যাগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। এই অপরাধে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। কারাগারে তিনি ৫০ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে ছিলেন। তার পর তাঁহার কি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে পারে না। সম্প্রতি সুরাটে একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। তিনি আজ ১৫ বৎসর যাবৎ কেবল চা ও জল পান করিয়া জীবিত আছেন। তাঁহার পাকস্থলীতে অন্য কোনও জিনিস থাকে না, খাইলে অমনি বমি হইয়া পড়িয়া যায়। চা ও জল খাইয়াই তিনি নাকি বেশ সুস্থ ও সবল আছেন।

* *
*

ভারতবর্ষে রেলওয়ে।—১৮৮৮-৮৯ সরকারী সালের শেষ পর্য্যন্ত ১৫ হাজার ২ শত ৪৫ মাইল রেল-পথ খোলা হইয়াছিল, ১৮৮৯-৯০ সালে আর ৮ শত ৬৯ মাইল নূতন খোলা হয়; সুতরাং বিগত মার্চ্চ মাসের শেষ দিনে সমগ্র ভারতে মোট ১৬ হাজার ৯৫ মাইল রেল-পথে কার্য্য চলিয়াছে। তৎপর এই কয় মাসে আর ২ শত মাইল পথ খোলা হইয়াছে। এই ১৬ হাজার ২ শত ৯৫ মাইল রেল-পথে এবং আর যে সকল পথ প্রস্তুত হইতেছে, তদ্দরুণ বিগত ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২১ হাজার

২ শত ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এবং রেলওয়ে সংস্পৃষ্ট ষ্টিমারের আয় সহ তদ্দ্বারা ২১৷৷০ কোটি টাকা উপার্জ্জিত হইয়াছে। ১৮৮৮ সালে ১০ কোটি ৩১ লক্ষ ৫৬ হাজার ১৩ জন এবং ১৮৮৯ সালে ১১ কোটি ৪ লক্ষ ২ হাজার ৩ শত ৮৩ জন আরোহী এই সকল রেলপথে যাতায়াত করিয়াছে; তাহাদের ভাড়া বাবদে ১৮৮৯ সালে ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ৪৭ টাকা এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর ৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৩ শত ২১ টাকা আয় হইয়াছে। ভারতের মানচিত্র খুলিলে মনে হয়, সমগ্র ভারত যেন এক রেলওয়ে বর্ম্মে সংযোজিত হইয়া রহিয়াছে।



প্রকৃত সুহৃদ বড়ই বিরল।

ভবতোষ রায় কলিকাতার একজন ধনাঢ্য মহাজন। তাঁহার বিষয় কারবারাদিও অত্যন্ত বিস্তৃত। বয়স ষাটের কাছাকাছি হইয়াছে; বহুকাল পর্য্যন্ত বিষয় বাণিজ্যাদি করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বিষয়েই পরিপক্কতা লাভ করিয়াছেন। ঘরে গৃহিণী নাই। একমাত্র পুত্র আশুতোষ তাঁহার নয়নের মণি। আশুতোষের বিদ্যা শিক্ষার যাহাতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য ভবতোষ বাবু সর্ব্বদা ব্যস্ত। পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধী লাভ করিলে, এক দিবস ভবতোষ বাবু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাবা আশু, আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি; বিষয় কারবারাদি ভালরূপ দেখিয়া শুনিয়া চালাইবার শক্তি আমার এখন আর নাই। সমস্ত ভারই এখন তোমার স্কন্ধে নিতে হইবে। আমি এই শেষ কালে কিছুদিন বিশ্রাম করিব স্থির করিয়াছি। কিন্তু তোমার স্কন্ধে এই বোঝা চাপাইবার পূর্ব্বে তোমাকে কয়েকটী কথা বলিতে আমি ইচ্ছা করি; মনোযোগ পূর্ব্বক শুন। এ জীবনে আমাদের যত প্রকার অভাব আছে, তন্মধ্যে প্রকৃত সুহৃদের অভাবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অভাব। আজ তুমি মহা ধনীর সন্তান; কিন্তু ধনমদে মত্ত হইয়া কিছুদিন যদি তুমি তোমার আয়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বাহুল্য ব্যয় করিতে থাক, শীঘ্রই দেখিবে ফকির হইয়াছ। সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার মান সম্ভ্রম সকলই যাইবে; এবং তখন যদি তোমার ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকে, সেই বিষম অবস্থা-পরিবর্ত্তনে হয়ত তুমি পাগল হইয়া যাইবে অথবা নানা ধিক্কার ও দুশ্চিন্তাবশতঃ প্রাণ হারাইবে। কিন্তু তোমার কোন প্রকৃত সুহৃদকে একমাত্র মৃত্যুই কেবল তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া নিতে পারে। তুমি এতদিন শুধু লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছ; পৃথিবীর কিছুই জান না। আমার ইচ্ছা তুমি পৃথিবীর সমস্ত দেখ শুন। এ পৃথিবী একখানি বৃহৎ পুস্তক স্বরূপ। ইহাতে না লেখা আছে এমন কথা নাই। সুবুদ্ধি ও শিক্ষিত লোকেরা এই বৃহৎ পুস্তক হইতে জীবনে অনেক সুশিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। বিদেশ ভ্রমণ ব্যতীত লোকের চক্ষু ফোটে না। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর এবং কিছুদিন নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া আইস। আশা করি, তুমি যখন ফিরিয়া

আসিবে, অধিক না হইলেও অন্ততঃ একটী প্রকৃত সুহৃদ তোমার জুটিয়াছে ইহা আমি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পারিব।"

কয়েক দিবস পরে একদিন আশুতোষ পিতার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন; কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই বাটী ফিরিয়া আসিলেন। ভবতোষ বাবু পুত্রকে এত শীঘ্র প্রত্যাগত দেখিয়া আশ্চর্য্য সহকারে বলিলেন,—"একি বাবা আশু, তুমি এত শীঘ্র যে ফিরিয়া আসিলে? আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অনেক বহুদর্শিতা লাভ করিয়া আসিবে। এ অল্প সময়ের মধ্যে তুমি আর কি অধিক দেখিতে শুনিতে পারিয়াছ, আর কি-ইবা জ্ঞান লাভ করিয়াছ?" আশুতোষ বলিলেন,—"বাবা, আপনি যে আমায় বিদেশ পর্য্যটনে পাঠাইয়াছিলেন তাহার প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, নানা স্থান ও নানা আচার ব্যবহার দেখিয়া আমার চক্ষু ফুটিবে, আমি কে ভাল কে মন্দ সহজে বুঝিতে পারিব, এবং সহজে আমার প্রকৃত সুহৃদ নির্ব্বাচন করিতে পারিব। কিন্তু এই মহানগরীতে যে আমার ১০।১৫ জন সুহৃদ আছেন তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুহৃদ আমার আর বোধ হয় কোথায়ও মিলিবে না। সুতরাং আর অধিক দেশ পর্য্যটন বৃথা মনে করিয়াই আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি।"

পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভবতোষ বাবু ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন,—"বাবা আশু, তুমি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ বটে, কিন্তু এ পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ খুব কমই করিয়াছ। যাহাকে তাহাকে "সুহৃদ" নাম প্রদান করিয়া ও পবিত্র নামটী কলঙ্কিত করিও না। আজ তুমি যাহাদিগকে সহজেই সুহৃদ মনে করিতেছ, কাল তাহারা তোমাকে বিপদাপন্ন দেখিলে কোথায় পালাইবে খুঁজিয়াও পাইবে না; দেখা হইলেও হয়ত তোমায় চিনিতে পারিবে না; আর চিনিতে পারিলেও হয়ত তোমার প্রতি নিতান্ত শৈথিল্য প্রকাশ করিবে। এরূপ ঘটনা অহরহঃ হইতেছে। আমার এত বয়স হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত সুহৃদ দু'টী একটী বই কিছুতেই মিলিল না। ঐ যে তোমার পিতাম্বর খুড়াকে দেখ, ভগবান ঐ একমাত্র সুহৃদরত্ন আমায় দিয়াছেন। আর যাহারা জুটিয়াছিলেন সকলেই সময়ের সাথি, অসময় দেখিলেই পলায়ন করিয়াছেন।" আশুতোষ বলিলেন,—"বাবা, আপনার এ সন্দেহ ভ্রান্তিমূলক। আমি যে ১০।১৫ জন বন্ধুর কথা, বলিলাম ইহাঁরা সকলই আমার অত্যন্ত প্রিয় সুহৃদ, কেহই বিপদ আপদে আমাকে ছাড়িবার নহে। আপনি ওরূপ সন্দেহ করিয়া তাহাদের প্রতি অন্যায় করিতেছেন।" ভবতোষ বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি তোমার বন্ধুগণকে পরীক্ষা করিব। আমি যাহা বলিব, তোমার তাহা করিতে হইবে।"

এইরূপ স্থির করিয়া এক দিবস ভবতোষ বাবু একটী বৃহৎ মেষ বলিদান করিলেন; এবং তাহার রক্ত আশুতোষের পরিধেয় বস্ত্রের স্থানে স্থানে মাখিলেন। তৎপর সন্ধ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যখন একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, সেই মৃত মেষটীকে বস্ত্রে আবৃত করিয়া পিতা পুত্রে উহা স্কন্ধে বহন পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

এই অবস্থায় সুহৃদগণের বাটী উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা বলিতে হইবে ভবতোষ বাবু পথে পুত্রকে সমস্ত শিখাইয়া দিলেন। অতঃপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সুহৃদ সুরেন্দ্রনাথ বসুর বাটী উপস্থিত হইয়া আশুতোষ পিতার শিক্ষানুযায়ী অত্যন্ত কাতরস্বরে প্রিয়বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভাই সুরেন, আজ বড় বিপদে পড়িয়া তোমার দ্বারস্থ হইয়াছি, জানই ত কেশব হালদারের সঙ্গে আমার

অত্যন্ত মনোবাদ ছিল। আজ হঠাৎ তাহার সঙ্গে আমার বচসা উপস্থিত হয়; তৎপর বাদ প্রতিবাদ হইতে হইতে হাতাহাতি আরম্ভ হয়; শেষে রাগান্ধ হইয়া যষ্টি প্রহারে আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি; ভাই, এখন আমায় রক্ষা কর। এই শবটী তোমার বাটীর কোন স্থানে লুকাইয়া রাখ এবং আমি যাহাতে রক্ষা পাই তাহার চেষ্টা কর। তাহা না হইলে আমার এই বৃদ্ধ পিতা হয়ত আত্মঘাতী হইবেন। ভাই, আজ প্রিয়-সুহৃদের কাজ কর।"

সুরেন বাবুর মাথায় তখন যেন বজ্রাঘাত হইল। বস্ত্রাবৃত সেই মৃত মেষটীকে তিনি বাস্তবিকই কেশব হালদারের মৃতদেহ মনে করিলেন, এবং মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে আশুতোষকে বলিলেন,—"তাইত ভাই আশু, তোমার দেখিতেছি বিষম বিপদ। কিন্তু কি জান, আমার বাটীতে তোমাদের যদি রাখি তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা ধরা পড়িবে। তুমি যে আমার বন্ধু একথা সকলেই জানে। পুলিশ তোমাদের দেখা না পাইলে প্রথম আসিয়াই আমার বাটীর সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করিবে। বিশেষ আমার নিজের পরিবারের লোক থাকিবার স্থান ভালরূপ এ বাটীতে হয় না, তাহার মধ্যে আবার ও শবদেহ কোথায় রাখিব? তুমি ভাই, অন্যত্র চেষ্টা কর।" আশুতোষ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু সুহৃদপ্রবর সুরেন বাবু কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। এইরূপে একে একে সকল সুহৃদের বাটী গিয়া তাহার বিপদের কথা জানাইলেন, এবং উহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সকলের নিকটই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু স্থানের অনাটন, পিতা মাতার অনিচ্ছা, পুত্রকলত্রের ব্যারাম ইত্যাদি ওজর আপত্য করিয়া একে একে সকল সুহৃদই যখন আশুতোষের প্রতি বিমুখ হইলেন, তখন তিনি অবনত মস্তকে ও সাশ্রুনয়নে পিতার নিকট নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভবতোষ বাবু পুত্রকে মর্ম্মপীড়িত দেখিয়া বলিলেন,—"আশু, ইহাতেই এত ম্রিয়মাণ হইও না। জীবনে এরূপ মনোকষ্ট অনেক পাইতে হইবে, অনেক প্রতারণা সহ্য করিতে হইবে। তাই তোমাকে বলিয়াছিলাম দেশ পর্য্যটন করিয়া নানা বিষয় দেখিয়া শুনিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়া আইস। তুমি যাহাদিগকে সুহৃদ মনে করিয়াছিলে, আজ তাহারা তোমার এ কল্পিত বিপদের সময় তাহাদের বাটীতে তোমাকে স্থানটুকু পর্য্যন্ত দিল না। মনে কর, যদি এ বিপদটী যথার্থই ঘটিত, তাহা হইলে তোমার দশা আজ কি হইত? আচ্ছা, তোমার সুহৃদগণের ব্যবহারত এই দেখিলে, এখন আমার প্রিয় সুহৃদ তোমার পীতাম্বর খুড়ার নিকট এই অবস্থায় চল, দেখ তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন। অতঃপর সেই অবস্থায় পিতা পুত্রে পীতাম্বর মিত্র মহাশয়ের বাটী উপস্থিত হইলেন। পীতাম্বর বাবু অত্যন্ত সম্পন্ন ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ভবতোষ বাবু যখন পুত্রের সেই কল্পিত বিপদ প্রকৃত বলিয়া সুহৃদ পীতাম্বরের নিকট জ্ঞাপন করিলেন, পীতাম্বর বাবু নিতান্ত মর্ম্মক্লেশ পাইলেন, এবং কি করিয়া প্রিয়সুহৃদ ও তাঁহার একমাত্র পুত্রকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন তজ্জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। ভবতোষ বাবুকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—"ভাই ভবতোষ, তুমি আমার প্রাণাধিক সুহৃদ। আজ যদি এ বিপদ হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে না পারি তবে আমার জীবনই বৃথা। একটী কেন, তোমার ভালর জন্য দশটী শবও যদি এ বাটীতে লুকাইয়া রাখিতে হয় তাহাও করিতে হইবে। তোমরা পিতা পুত্রে আমার বাগান বাড়ীতে গিয়া কিছুদিন থাক; সেখানে আর কে তোমাদের অনুসন্ধান করিবে? সমস্ত

তদন্ত হইয়া চুকিয়া গেলে দেখা দিও। বাবা আশু, শীঘ্র এ রক্তমাখা বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান কর। ভাই ভবতোষ, আজ যেন সুহৃদের কার্য্যে অক্ষম না হই, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা কর। এখন বাটীর মধ্যে আসিয়া স্নানাদি করিয়া পরিষ্কার হও এবং কিছু আহার করিয়া ঠাণ্ডা হও। কোন ভয় নাই; তোমার পুত্র ইচ্ছা করিয়া এ কাজ করে নাই, দৈবাৎ এ বিপদ ঘটিয়াছে। হরি রক্ষা করিবেন।"

পীতাম্বর বাবুর এ মহৎ ও উদার ব্যবহারে ভবতোষ বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন। আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে প্রকৃত ঘটনা সমস্ত পীতাম্বর বাবুর নিকট প্রকাশ করিলেন এবং পুত্রকে প্রকৃত সুহৃদের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য যে তিনি এ ভাণ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই জানাইলেন। তখন পীতাম্বর বাবু আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিলেন,—"ভাই ভবতোষ, পরমেশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ যে, তিনি আজ তোমার এ পরীক্ষায় আমায় জয়ী করিয়াছেন।" আশুতোষকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"বাবা আশু, প্রকৃত সুহৃদ বাস্তবিক বড়ই দুর্ল্লভ; কিন্তু আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার পিতা যেরূপ আমার প্রিয়তম সুহৃদ, এইরূপ প্রিয়তম সুহৃদ তোমার বিস্তর হউক।"

এতদিনে আশুতোষের চক্ষু ফুটিল। অতঃপর আর অধিক কালক্ষেপ না করিয়া এক দিবস পিতার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক আশু বাবু পুনরায় দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন, এবং বহুদেশ পর্য্যটনে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতার হস্ত হইতে বিষয় কার্য্যাদির ভার গ্রহণ করিলেন। কালে আশু বাবু বিদ্যা বুদ্ধির জন্য বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং প্রকৃত সুহৃদের সংখ্যা যে অধিক হয় না জীবনে ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কোথা গেলে মা আমার!

কেন বাবা হেঁট-মুখে ছল ছল নয়নে,
উদাস বিরস-ভাবে বসিয়া কি কারণে?
বল বাবা কি হ'য়েছে তোল তোল মুখ-খানি!
কে ঢাকিল চারু-চাঁদ এ বিষাদ-মেঘ আনি?
একি দেখি—মা আমার এ ভাবে শুইয়া কেন?
মলিন নয়ন দুটী প্রভাতের তারা যেন!
এলো-থেলো চুল-গুলি-মুখ-খানি আভাহীন!
ধূলায়-ধূসর দেহ নিথর-শ্রীহীন-ক্ষীণ!
উঠ উঠ মা জননি—কও কথা একবার!
এ ভাবে শুইয়া কেন আছ ওগো মা আমার!
কি দোষ করিছি আমি বল না মা পায়ে ধরি!
কহিছ না কথা তাই—রহিয়াছ রাগ করি!
আর না করিব তাহা ক্ষমা কর এইবার;
প্রাণ যে কেমন করে মুখ দেখি মা তোমার!
ওমা ওমা কথা কও চাও গো আমার পানে,
হাস হাস একবার মধুর সোহাগ-দানে!
বুক ফেটে যায় মাগো একবার কথা কও!
তোমার জীবন-ধন ডাকে ওমা কোলে লও!
মা তোমার "শিখরিণী" সাধের দুধের মেয়ে,
কেঁদে কেঁদে হলো সারা দেখনা বারেক চেয়ে!
তুমি যারে বুকে ক'রে রাখ সদা মা আমার,
'মা' 'মা' বলে কাঁদে সেই ধূলায় লুটায় আর!
কেন মা দেখনা তারে-কোলে নাহি লও তুলে?
কি কারণে জননী গো স্নেহ মায়া গেলে ভুলে?
ওমা ওমা বুক ফাটে মুখ তুলে চাও গো!
মাথা খাও কথা কও পরাণ জুড়াও গো!
কার কাছে আমাদের রেখে যাও মা এখনি?
তোমা বই আমাদের আছে কে আর জননি!

এত ভাল বেসে মাগো শেষে তুমি কি করিলে,—
জনমের মত মোর "মা" বলাটী কেড়ে নিলে!



ঋণ শোধ।

(সত্য ঘটনা)।

বিলাতের কোন পল্লীগ্রামে কয়েকটী বালক খেলা করিতে করিতে ইট ছুড়িয়া নিকটস্থ কোন এক বাটীর জানালার সার্শি ভাঙ্গিয়া পালাইতেছিল। এমন সময় গৃহস্বামী বাহিরে আসিয়া একটী বালককে ধরিয়া ফেলিলেন। গৃহস্বামী বলিলেন, এ কাজ এই তোমাদের প্রথম নহে, আর একবারও তোমরা সার্শি ভাঙ্গিয়াছ; এবার তোমাদিগকে বিশেষ শাস্তি না দিলে, এই উৎপাতের আর শান্তি হইবে না। পরে তাহাকে বলিলেন "মার্ক! তুমি আমাদের বাড়ী বস, আমি আগে তোমার মাকে বলিয়া আসি। ছি ছি, বড় লজ্জার কথা! তোমরা এখনও শান্ত শিষ্ট হইতে শিখিলে না।"

গৃহস্বামী মায়ের কাছে যাইতেছেন শুনিয়া, মার্ক বলিল, "মহাশয়! সত্য সত্যই বলিতেছি, আমি কখনও জানালা ভাঙ্গি নাই।"

গৃহস্বামী—তোমরাইত ইট ছুড়িতেছিলে।

মার্ক—আমি ত আর জানালায় ইট ছুড়ি নাই।

গৃহস্বামী—অবশ্যই তোমাদের মধ্যে একজন ইট ছুড়িয়াছিল। তোমাকে ধরিতে পারিয়াছি। তুমি কি করিয়া প্রমাণ করিবে যে, তুমি জানালা ভাঙ্গ নাই?

মার্ক—তবে কিছুকাল অপেক্ষা করুন। মায়ের কাছে যাইবেন না। তিনি বড় অসুস্থ। আমার এই ব্যবহারের কথা শুনিলে তাঁহার অসুস্থতা আরও বাড়িতে পারে।

গৃহস্বামী—তা বাপু কি হবে—আমি না বলে পারি না।

মার্ক মায়ের অসুস্থতার বিষয় চিন্তা করিয়া বলিল, আমি যদি সার্শির মূল্য দি, তাহা হইলে কি আপনি সন্তুষ্ট হন? গৃহস্বামী প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। মার্ক যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করিলে পর, গৃহস্বামী এই স্থির করিলেন যে, মার্ক এই সপ্তাহ মধ্যে সার্শির দরুণ তিন শিলিং (দেড় টাকা) দিতে পারিলে, তিনি আর এই সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবেন না।

জন, জেমস্ ও আর কয়েকজন বালক মার্কের সঙ্গে খেলা করিতেছিল। মার্কের বিশ্বাস ছিল, তাহাদের মধ্যে যে বালক প্রকৃত পক্ষে জানালা ভাঙ্গিয়াছে, তাঁহার নিকট হইতেই সে মূল্য লইতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গীদের মধ্যে কে সার্শি ভাঙ্গিয়াছে, সে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু একে একে সকলেই অস্বীকার করিল। অবশেষে বালক মনে মনে স্থির করিল, যে কোনও উপায়ে হউক, তাহাকে তিন শিলিং সংগ্রহ করিতেই হইবে। মার্ক সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিত। ভাবিল, সে ছবি তুলিয়া সেই অর্থ উপার্জ্জন করিবে।

মার্কের পিতার এক দোকান ছিল। একদিন বালকেরা বিদ্যালয়ে যাইবার সময় সেই দোকানের

গায় মার্কের লিখিত একটী বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—"এই স্থানে প্রত্যহ সন্ধ্যা সাত ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত ছবি তোলা হয়, প্রত্যেক ছবির দাম দুই পেনী।"

সেই দিনই সন্ধ্যাকালে দোকানের কাছে বহুলোকের সমাগম হইল। কে ছবি তুলিবে, দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়াছিলেন। মার্ক প্রথমে কয়েক জন বালককে গৃহের মধ্যে লইয়া যাইয়া তাহাদের ছবি তুলিতে আরম্ভ করিল। বড় একখানি কাগজ দ্বারদেশে সংযোজিত করিয়া সম্মুখে একটি আলোক স্থাপন করিল। একটি বালককে দরজা এবং আলোর মধ্যে এরূপ ভাবে দাঁড় করাইল, যেন তাহার মুখের একপাশের ছায়া কাগজের উপরে পতিত হয়। পরে কয়লা দ্বারা কাগজের উপরে পতিত মুখচ্ছায়া স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করিয়া পেন্সিলের সাহায্যে সেই বালক-শিল্পী সুন্দর ছবি প্রস্তুত করিয়া লইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মার্কের চিত্র বিদ্যায় স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল; সুতরাং সে সহজেই সুন্দর প্রতিকৃতি তুলিতে সমর্থ হইল। বালকেরা তাহার এইরূপ নিপুণতা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। একে একে সকলেই দুই পেনী ব্যয় করিয়া আপন আপন ছবি তোলাইতে লাগিল। বালকদিগের ত কথাই নাই, বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত ছবি তোলাইবার জন্য মার্কের কাছে আসিতে লাগিলেন। সমাগতদিগের মধ্যে জন ও জেম্‌স্ ছাড়া একে একে আর সকলেরই ছবি তোলা হইল। জেম্‌সের সঙ্গে একটী পয়সাও ছিল না। জনের যখন ছবি তোলা হইতেছিল, তখন জেম্‌স্ বসে বসে ভাবিতেছিল, "আমি ত আর আমার নিজের ছবি তোলাইতে পারিব না, যদি কোন উপায়ে আমার কুকুরটার ছবি তোলাইতে পারিতাম, তাহা হইলে না আমার কত আনন্দ হইত!"

ইতিমধ্যে জনের ছবি তোলা শেষ হইলে, মার্ক জেম্‌স্‌কে ডাকিল। জেম্‌স্ বলিল,—"আমি ছবি তুলিতে চাই না।" তখন জন বলিল—তবে কি তোমার পয়সা নাই? জনের এই কথাতে জেম্‌স্ বিরক্ত হইয়া কুকুরটিকে সঙ্গে করিয়া প্রস্থান করিতেছিল। তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, মার্ক আদর করিয়া ডাকিয়া বলিল, "জেম্‌স্! এস তোমাকে বিনা মূল্যে ছবি তুলিয়া দিব, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমারও ভালরূপ শিক্ষা হইবে।" সে তাহাতে আরও বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি ছবি তোলা'তে চাই না, ছবি তুলিয়া কি হইবে?"

মার্ক ইহার মধ্যেই জানালার মূল্যের অপেক্ষা বেশী অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। তাই আবার বলিল, "জেম্‌স্! যদি তোমার ছবি তোলাইতে ইচ্ছা না হয়, এস তবে তোমার কুকুরের ছবি তুলিয়া দি।"

জেম্‌সের আর তখন আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মার্ক জেম্‌স্‌কে প্রফুল্ল দেখিয়া অতি সত্বর তাহার কুকুরের একখানা সুন্দর ছবি তুলিয়া দিল। ছবি তোলা হইলে জন ও জেম্‌স্ উভয়ে এক সঙ্গে বাড়ী যাইতেছিল। পথে জেম্‌স্ জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, বলিতে পার, মার্ক এইরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে কেন?" জন বলিল, "তুমি কি জান না, মার্ক সেই ভগ্ন জানালার মূল্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছে? সে তাহার অঙ্গীকার যেরূপেই হউক প্রতিপালন করিবে। কিন্তু ভাই, মার্ক জানালা ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া আমি কোনও মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই জন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, জেম্‌স্ তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া এক দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া যাইতেছে।

এ দিকে মার্ক শনিবারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। সপ্তাহ ভরিয়া ছবি তুলিয়া সে ১০ শিলিং

(৫ টাকা) সঞ্চয় করিয়াছিল। সে শনিবার দিন প্রতিশ্রুত তিন শিলিং লইয়া সানন্দ চিত্তে গৃহস্বামীর নিকটে উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী টাকা লইতে চাহিলেন না। তিনি মার্ককে বলিলেন, "আমি জানালার মূল্য পাইয়াছি, তোমার নিকট মূল্য চাহি না।" এই বলিয়া মার্ককে বিদায় দিলেন। মার্ক প্রকৃত ঘটনা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না, গৃহস্বামীও বেশী কিছু বলিলেন না।

মার্ক কুকুর লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে বড় ভালবাসিত। তাই অর্জ্জিত অর্থ দিয়া একটী মনোমত কুকুর কেনার জন্য বাজারে গেল। জেম্‌সের প্রিয় কুকুরটি বিক্রয়ার্থ তথায় রহিয়াছে দেখিয়া, মার্ক মনে মনে অতি বিস্মিত হইল। ভাবিল, বুঝি ইহা কেহ চুরি করিয়া বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই সব ঘটনা বুঝিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ কুকুরটি ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ী আসিয়া জেম্‌স্‌কে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "ভাই! আমি তোমার কুকুরের প্রতিকৃতি চিত্রিত করিতে চাই। তোমার কুকুরটি কিছুকালের জন্য কি আমায় দিবে?" তখন আর জেম্‌স্ চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। কাঁদ কাঁদ স্বরে সমস্ত ঘটনা তাহাকে আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল।

পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি জেম্‌সের চক্ষের জলের কারণ বুঝিতে পারিলে? জেমস্ জানালা ভাঙ্গিয়া সত্য কথা বলিতে ভীত হইয়াছিল। অবশেষে তাহার অপরাধে মার্ককে এত কষ্ট করিতে দেখিয়া ও মার্কের সত্যনিষ্ঠা মনে করিয়া গভীর কষ্ট অনুভব করিতেছিল। তাই নিজের অতি প্রিয় কুকুরটি বিক্রয় করিয়া পূর্ব্বেই জানালার মূল্য দিয়া আসিয়াছিল।

জেম্‌সের কথা শেষ হইতে না হইতেই মার্ক কুকুরটি আনিয়া তাহার নিকট উপস্থিত করিল। তখন উভয়েই আনন্দে উৎফুল্ল হইল,—তাহাদের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না।

জেম্‌স্‌ও কয়েকদিনের মধ্যে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মার্কের ঋণ শোধ করিল, এবং সাধু ও সত্যনিষ্ঠ বলিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইল।



চাঁদ।

(৭৭ পৃষ্ঠার পর।)

চাঁদে জলের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বাতাসও যে আছে, তাহা বোধ হয় না। চাঁদে জল ও বাতাস থাকিলে চাঁদে মেঘ হইত, ও চাঁদের মুখ মেঘের জন্য দাগযুক্ত হইত; কই আমরা চাঁদে সেরূপ মেঘের দাগ ত দেখিতে পাই না। চিরকাল একই রকম দেখিতেছি। মেঘের জন্য কাল কাল দাগ হইলে, সে দাগগুলির আকৃতি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইবে। মেঘগুলি কিছু চিরকাল একই ভাবে থাকিবে না। আমরা চাঁদে যে দাগ দেখি, সেগুলি চিরকাল একই ভাবে রহিয়াছে। এই এবং অন্যান্য কারণে পণ্ডিতেরা বলেন, চাঁদে জল বাতাস নাই।

চাঁদে জল নাই; সুতরাং মেঘ, বৃষ্টি, বরফ নদী, হ্রদ কিছুই নাই। সুতরাং আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জীব জন্তু নাই, গাছ পালা নাই। সর্ব্বত্র মরুভূমি। সমতল ভূমি—হয় কঠিন প্রস্তরময় প্রদেশ,

না হয় বিস্তৃত বালুকাক্ষেত্র। চন্দ্রে অনুর্ব্বরা গিরিদেহ মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে ; পর্ব্বতের মধ্যে ও প্রান্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর ও বিস্তৃত ফাট হাঁ করিয়া রহিয়াছে।

চন্দ্রে বায়ু নাই। মৃদু মৃদু বসন্তের বাতাসও বহে না, প্রবল ঝটিকাও উঠে না। বায়ু নাই, জলীয় বাষ্প নাই ; সুতরাং পৃথিবীর ন্যায় সন্ধ্যা ও প্রত্যূষ সময়ের প্রদোষ ও গোধূলির আলোক নাই। প্রখর সূর্য্য কিরণ ও গভীর অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী কিছু নাই। রাত্রের অন্ধকারের পর অল্পে অল্পে দিবালোক প্রকাশ পায় না। ঘোর অন্ধকার হইতে হঠাৎ প্রখর সূর্য্যালোক ও প্রখর সূর্য্যালোক হইতে হঠাৎ ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হয়। বায়ু নাই, সুতরাং শব্দ নাই। চতুর্দ্দিকে কি ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড উৎপাতে, প্রবল ভূমিকম্পের দুর্ব্বিসহ আন্দোলনে, চন্দ্রের উচ্চতম পর্ব্বত সকল চুরমার হইয়া ছারখার হইয়া যাইতে পারে ; তথাপি শব্দের লেশ মাত্র হইবে না। এরূপ অবস্থায় লোক থাকা সম্ভব হইলে, কেহ পরস্পরের কথা শুনিতে পায় না, এমন কি নিজের কথা নিজেই শুনিতে পায় না।

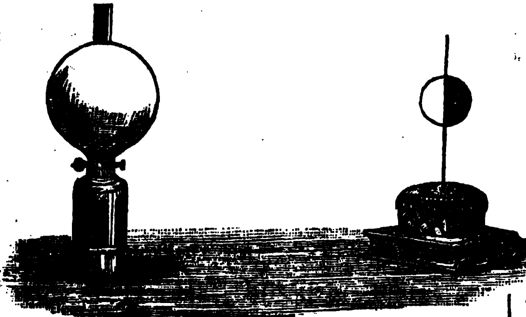
বায়ু ও বাষ্প নাই, সুতরাং উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা নাই। আমাদের বার ঘণ্টার রাত, চাঁদের প্রায় ১৫ দিনের রাত। এক স্থান ক্রমাগত ১৫ দিন সূর্য্যের উত্তাপ হইতে বঞ্চিত থাকে। পৃথিবীতে রাত্রের যে কয় ঘণ্টা সূর্য্যের উত্তাপ পায় না, তাহাতেই সন্ধ্যাবেলা অপেক্ষা শেষ রাত্রটা কতটা ঠাণ্ডা হইয়া আইসে। চাঁদে ১৫ দিনের রাত্রিতে সেই স্থানটা কত শীতল হইয়া যায়। তেমনই চাঁদের এক দিনও আমাদের ১৫ দিন ধরিয়া থাকে, সুতরাং ১৫ দিন ধরিয়া ক্রমাগত সূর্য্যের উত্তাপ পাইয়া সেই স্থান কত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ঠাণ্ডা ত বরফের মত ঠাণ্ডা, আর গরম ত আগুনের মত গরম। দিন ও রাত্রের কথা ছাড়িয়া দি ; সূর্য্যের আলোকে কোথায়ও হয় ত কোন পর্ব্বতের ছায়া পড়িয়াছে। রৌদ্রের স্থানে অসহ্য উত্তাপ, ছায়ার স্থানে অত্যন্ত শীত। এই ত চাঁদের প্রাকৃতিক অবস্থা।

পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্র আবার পৃথিবীর চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করে। লাটিম অথবা গাড়ীর বা ঘড়ির চাকা যেমন নিজের আল বা ধুরার চারিদিকে ঘুরে, পৃথিবীও সেইরূপ নিজের (মেরুদণ্ডের) চতুর্দ্দিকে ঘুরে। নিজের চারি দিকে একবার ঘুরিতে অর্থাৎ একে একে চারি দিক দেখিতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা লাগে। নিজের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে। সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন লাগে।

চাঁদের নিজের চারিদিকে একবার ঘুরিতে অর্থাৎ একে একে চারিদিক দেখিতে ২৯ দিন লাগে। আবার পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিতেও ২৯ দিন লাগে। অর্থাৎ পৃথিবীকে এরূপ ভাবে প্রদক্ষিণ করে যে, তাহাতেই তাহার একে একে চারিদিকে মুখ ফিরান হইয়া যায়। সেইজন্য আমরা চাঁদের এক দিকই দেখিতে পাই, অপর পিঠ দেখিতে পাই না। একটা উদাহরণ দিলে বুঝিবে। মনে কর, তুমি একটা খুঁটা, থাম, বা গাছ হাত দিয়া ধরিয়া থাকিয়া, তার চারিদিকে ঘুরিতেছ। (ছেলেরা যেমন প্রায়ই খুঁটী ধরিয়া তার চারিদিকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া ঘুরিতে থাকে)। তোমার মুখটা সেই থাম বা গাছের দিকেই ফিরান আছে। তুমি যতই কেন গাছের বা থামের যে দিকে ইচ্ছা যাও না, তোমার মুখ গাছের বা থামের দিকেই থাকে। অর্থাৎ গাছ বা থামটা তোমার সম্মুখ

দিকই দেখিতে পায়, তোমার পিছন দিক দেখিতে পায় না। চাঁদও পৃথিবীর চারিদিকে ঐ ভাবে ঘুরে, কাযেই আমরা চাঁদের সম্মুখ দিক ব্যতীত অপর দিক দেখিতে পাই না।

চন্দ্রের আকৃতির হ্রাস বৃদ্ধি কি করিয়া হয়? পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে যখন চাঁদ থাকে, তখন চাঁদের পৃথিবীর দিকের অংশে সূর্য্যের আলো পড়ে না, অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, আমরা চাঁদ দেখিতে পাই না। আবার চাঁদ যখন পৃথিবীর অপর ধারে থাকে অর্থাৎ পৃথিবী যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের মাঝে থাকে, তখন চাঁদের পৃথিবীর দিকের সমস্ত অংশে সূর্য্যের আলো পড়ে বলিয়া আমরা পূর্ণ চন্দ্র দেখি। আর পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য এক রেখায় না হইয়া যদি এই তিনটী এক ত্রিবাহুর তিন কোণে থাকে, তবে অমাবস্যা ও পূর্ণ চন্দ্রের মাঝা মাঝি অবস্থা দেখিতে পাইব।



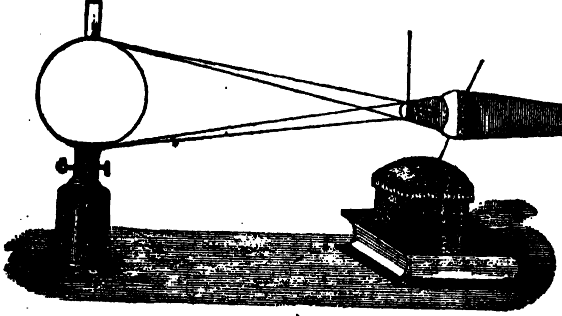
১ম চিত্র।

এই চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবে। ঐ ল্যাম্পটাকে সূর্য্য মনে কর। আর একটা সলাকায় বিদ্ধ বাতাবীনেবুকে চাঁদ মনে কর, আর তুমি যেন পৃথিবী। চিত্রে যেরূপ অঙ্কিত আছে এটা একটা ত্রিভুজের অবস্থা অর্থাৎ তুমি, ল্যাম্প ও নেবু এক রেখায় নহে। তোমার সম্মুখে ল্যাম্প বা সূর্য্য, তোমার ডান ধারে নেবু বা চন্দ্র। তুমি যেখানে আছ সেখান হইতে ল্যাম্পের আলোকে আলোকিত নেবুর অংশকে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার দেখিতেছ। নেবুটা সরাইতে সরাইতে যত তোমার ও ল্যাম্পের মধ্যে আনিবে, ততই ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধচন্দ্র হ্রাস হইয়া অমাবস্যার মত হইবে। আবার তথা হইতে যত ঘুরাইয়া তোমার বামদিকে আনিতে থাকিবে, ততই শুক্লপক্ষের ন্যায় আলোকাংশ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। তারপর যখন আরও ঘুরাইয়া তোমার পিছনদিকে লইয়া যাইবে, ততই পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইবে। চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধিও এইরূপে হয়। তারপর গ্রহণের কথা বলিতেছি।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ কি করিয়া হয়, তাহাও চিত্র দ্বারা বুঝাইতেছি। (প্রথমে বলিয়া রাখি, আলোকময় পদার্থ যথা ল্যাম্প কিছু বড় মত হইলে, তাহার সম্মুখে যে জিনিস থাকে, তাহার যে ছায়া পড়ে তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। রাত্রে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়ালের নিকট যদি একটা পেন্সিল ধর, তবে দেখিবে যে ছায়ার মাঝখানটা একটু গাঢ় অন্ধকার আর তাহার দুই ধারে তদপেক্ষা অল্প গাঢ় অন্ধকার। মধ্যের অংশকে 'পূর্ণচ্ছায়া' ও পার্শ্বের অংশকে 'অর্দ্ধছায়া' বলা যায়।)

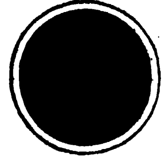
অমাবস্যার সময়ে চাঁদ, সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসে; চাঁদের একটা ছায়া হইবে, সেই ছায়া পৃথিবীর গায়ে আসিয়া পড়ে। পূর্ব্বের ল্যাম্প ও বাতাবীনেবুর কাছে যদি একটা ছোট কাপড়ের বল বা গোল-আলু ঝুলাইয়া দাও, তবে সেই বলের বা আলুর একটা ছায়া বড় নেবুর উপর পড়িবে; এই ছায়ার মধ্যস্থলে 'পূর্ণচ্ছায়া' ও চারি পাশে 'অর্দ্ধছায়া' হইবে। (পর পৃষ্ঠার ২য় চিত্র দেখ) এই পূর্ণছায়ায় যদি একটা পিপঁড়া থাকে, অথবা

তোমার চোখটা যদি সেখানে আন, তবে পিপঁড়া বা ল্যাম্পটাকে তুমি দেখিতে পাইবে না। ল্যাম্পের



২য় চিত্র।

পূর্ণ গ্রহণ হইবে আর যদি 'অর্দ্ধছায়ায়' পিঁপড়া থাকে বা তুমি চোখ দাও, তবে পিপঁড়া বা তুমি ল্যাম্পের 'অর্দ্ধগ্রাস' দেখিতে পাইবে। ঐরূপ সূর্য্য গ্রহণের সময়ে চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, আর সেই ছায়ায় যাহারা থাকে তাহারাই গ্রহণ দেখিতে পায়। যাহারা পূর্ণছায়ায় থাকে তারা পূর্ণ, আর যাহারা অর্দ্ধছায়ায় থাকে তাহারা অর্দ্ধগ্রহণ দেখিতে পায়। যেখানে পূর্ণছায়া পড়ে না, সেখানকার লোকেরা পূর্ণ গ্রহণ দেখিতে পায় না। আর চাঁদের ছায়া একেবারেই যে যে স্থানে পড়ে না সে স্থানের লোকেরাও গ্রহণ দেখিতে পায় না। আবার এক এক সময়ে এমন হয় যে, চাঁদের পূর্ণছায়া পৃথিবীতে পড়িল না, কেবল এক অংশে অর্দ্ধছায়া মাত্র পড়িল, সেবার সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস হইল না। অর্থাৎ সূর্য্য গ্রহণ হয়, সূর্য্য কেবল চাঁদের আড়ালে পড়ে বলিয়া। তোমরা শুনিয়াছ বা বইতে পড়িয়াছ যে, পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়িয়া চন্দ্র গ্রহণ হয়। তাই বলিয়া তোমরা সিদ্ধান্ত করিও না যে, সেইরূপ চাঁদের ছায়া সূর্য্যে পড়িয়া সূর্য্যগ্রহণ হয়। চাঁদের আড়ালে সূর্য্য পড়ে বলিয়া আমরা সূর্য্য দেখিতে পাই না। যদি সূর্য্যের এক অংশ চাঁদের আড়ালে পড়ে, তবে অর্দ্ধ-গ্রহণ, আর যদি সবটা আড়ালে পড়ে তবে পূর্ণগ্রহণ দেখি। আবার মাঝে মাঝে এমন হয় যে, দেখিতে চাঁদের আয়তনটা সূর্য্যের আয়তন হইতে একটু ছোট দেখায়; সে সময়ে সূর্য্যের একটা 'বালা' বা 'চুড়ির' মত গ্রহণ হয়। এবার ১৭ই জুন মুঙ্গের ও ভাগলপুরের লোকেরা ঐরূপ গ্রহণ দেখিয়াছিল। সূর্য্যের আকৃতি ৩য় চিত্রের মত হইয়াছিল।

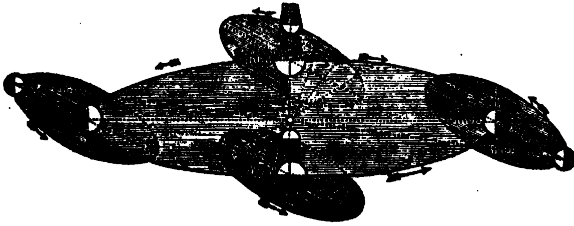


৩য় চিত্র।

কলিকাতা, যশোহর, মান্দ্রাজ, দারজিলিঙ্গের লোকেরা পার্শ্ব গ্রহণ মাত্র দেখিতে পাইয়াছিল। লুচি বা কচুরির মত সূর্য্যহইতে যেন কোন পেটুক ছেলে এক খাব্‌লা কামড়াইয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। সে সময়ে সূর্য্যের আকৃতি তৃতীয়া বা চতুর্থীর চাঁদের মত হইয়াছিল। ঠিক অর্দ্ধ গ্রাস হইলেও কিন্তু অর্দ্ধ চন্দ্রের মত আকৃতি হয় না; মনে করিয়া রাখিও, কামড়াইয়া লইলে যেমন দুধার সরু (ছুঁচল) মাঝখানটা পুরু হয়, তখনও সেইরূপ আকৃতির হয়।

চন্দ্র গ্রহণের সময়ে পূর্ণিমার রাত্র। সে সময়ে পৃথিবীর ছায়া চাঁদে গিয়া পড়ে। সমস্ত ছায়ার মধ্যে পড়িয়া যখন চাঁদ একেবারে ডুবিয়া যায়, তখন চন্দ্রের পূর্ণগ্রহণ হয়। আর যখন ছায়ার এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়, তখন আংশিক গ্রহণ হয়। ল্যাম্প, নেবু আর আলু দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখ। নেবুর এ ধারে আলু ঝুলাইয়া দাও। নেবুর ছায়ায় আলু সম্পূর্ণ পড়িলে, সবটা অন্ধকার হইয়া যাইয়া পূর্ণগ্রাস হইল। আর যদি ছায়ার এক ধারে থাকে, অর্থাৎ সবটা ছায়ার যদি ঢাকিতে না পায়, তবে অর্দ্ধগ্রাস হইল। ছায়ায় পড়িলেই গ্রহণ হইবে, না পড়িলে গ্রহণ হইবে না।

আমরা যখন চন্দ্রগ্রহণ দেখি, তখন চাঁদ সূর্য্য-গ্রহণ দেখে। কারণ পৃথিবীর আড়ালে সূর্য্য পড়ে। আর সূর্য্য দেখে, পৃথিবীর আড়ালে চাঁদ পড়িয়াছে। আর আমরা যখন সূর্য্যগ্রহণ দেখি, তখন সূর্য্য পৃথিবীর উজ্জ্বল গায়ে একটা ছোট গোল উজ্জ্বল কি রহিয়াছে তাই দেখে। আর চাঁদ দেখে, একটা ছোট কাল ছায়া পৃথিবীর গায়ে পড়িয়াছে। চাঁদ দেখে পৃথিবীর গ্রহণ, পৃথিবী দেখে সূর্য্য গ্রহণ। পৃথিবী যখন চন্দ্রগ্রহণ দেখে, তখন চন্দ্র সূর্য্য দেখিতে পায়। চন্দ্রগ্রহণে, চন্দ্রে পৃথিবীর ছায়া পড়ে; আর সূর্য্যগ্রহণে, সূর্য্য চন্দ্রের আড়ালে পড়ে। যদি বল, প্রত্যেক অমাবস্যা ও প্রত্যেক পূর্ণিমাতে কেন সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না, তার উত্তর এই, যদি চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্য একই ক্ষেত্রে থাকিয়া চলাচল করিত, তবে ঐরূপ সম্ভব হইত। কিন্তু পৃথিবী যে ক্ষেত্রে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে, চন্দ্র সে ক্ষেত্রে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে না। এই চিত্র দেখিলে



৪র্থ চিত্র।

বুঝিতে পারিবে। মনে কর, পৃথিবী যে মাঠের উপর হাঁটিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই মাঠ চন্দ্র যে মাঠের উপর হাঁটিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তাহা দ্বারা যেন খণ্ডিত হইতেছে। সুতরাং সব পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় পৃথিবীর ছায়া চাঁদে বা চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়িতে পায় না।



অজিত কুমার।

(৭৯ পৃষ্ঠার পর।)

তৃতীয় অধ্যায়।



রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে প্রকৃতির যে ভীষণতা ছিল, তাহা এক্ষণে সৌন্দর্য্যের মৃদু হাসিতে পরিণত হইয়াছে। যেন জগতের প্রাণীসকল ভয়ঙ্কর বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অযুত কণ্ঠে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঠক! আমরা এখন এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন পরিত্যাগ করিয়া বালক অজিত ও অরুণ কি করিতেছে দেখিয়া আসি।

রামরূপের বাড়ীর অনতিদূরে গণেশ নামক আর একটী কয়লা-খনকের আবাস ছিল। সে কয়লার খনিতে রামরূপের সহিত একত্র কার্য্য করিত। গণেশ, অজিত ও অরুণের চীৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। কারণ ঝড়ে তাহার কোন বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। গণেশ দেখিল রামরূপের অবস্থা খুব ভাল নহে, ডাক্তারের সাহায্য না লইলে আঘাত মারাত্মক হইতে পারে। অতএব সে অরুণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "অরুণ, নিকটেই খনির ডাক্তার বাস করেন। তুমি শীঘ্র তাঁহাকে ডাকিয়া আন।

তোমাদের ঘর দু'খানিই পড়িয়া গিয়াছে। এ বাড়ীতে আর বাস করিবার উপায় নাই। আমাদের ঘরেও আর স্থান নাই। তবে গোরুগুলিকে বাহিরে রাখিয়া অজিতের সঙ্গে চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি গোয়ালখানিতে তোমাদিগের বাসের স্থান হয়।"

অজিত কাল বিলম্ব না করিয়া ডাক্তার আনিতে ছুটিয়া গেল। আদরিণীর নিকটে আহত রামরূপকে রাখিয়া, অজিতের সহিত গণেশ তাহার নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেল। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গোয়ালখানি পরিষ্কৃত করিয়া রামরূপ ও আদরিণীকে তথায় লইয়া গেল। এদিকে ডাক্তার বাবুও রামরূপের পীড়ার সংবাদ পাইয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ, সচ্চরিত্র ও সাধুতার জন্য খনির সকলেই রামরূপকে অত্যন্ত ভালবাসিত। ডাক্তার বাবু দুইখানি কাষ্ঠ দিয়া রামরূপের হাত বাঁধিয়া দিলেন। এবং গণেশকে যাইয়া খাইবার ঔষধ আনিতে বলিলেন। গণেশ কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া ডাক্তারের সঙ্গেই ঔষধের জন্য চলিয়া গেল।

অজিত অরুণকে বলিল—"তুমি একটু বাবার নিকট বসিয়া থাক। আমি বাড়ীতে যাইয়া যে জিনিস পত্র পাই, লইয়া আসি; নতুবা জলে ভিজিয়া পচিয়া যাইবে।" এই বলিয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

অজিত দেখিল, বাক্সটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ কাপড় জলের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। যে দুই একখানি আছে, তাহাও জলে সিক্ত। ১৩ বৎসরের বালক সেই ধ্বংস রাশি ঠেলিয়া এক এক করিয়া জিনিস পত্র বাহির করিয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। বিপদে পড়িলে মানুষের উদ্যম, বুদ্ধি, উৎসাহ সকল চলিয়া যায়। কিন্তু অজিতকুমার বিপদে অভিভূত হইবার বালক নহে। তাহার গম্ভীর মুখখানি উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়াছে। মুখের উপর কি যেন এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভা পড়িয়াছে। ঘর্ম্মে সর্ব্ব শরীর ভাসিয়া যাইতেছে, সেদিকে লক্ষ্য নাই। বালক খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্রমে সমুদয় জিনিস পত্র একত্রিত করিল এবং সেগুলি গণেশের বাড়ীতে লইয়া যাইবার উপায় দেখিতে লাগিল। তখন বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, এবং শরীর বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এদিকে অরুণ পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে। এক্ষণে রামরূপ চেতনা লাভ করিয়া একটু সুস্থ হইয়াছে। কিন্তু নিজের দুরবস্থা ভাবিয়া এবং এই অসহায় পুত্র কন্যাগুলির কি করিয়া দিন যাইবে মনে করিয়া, তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তাই বালিশে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে রামরূপ কাঁদিতেছে। চক্ষুর জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে।

বালিকা আদরিণী গণেশের বাড়ী আসিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে সে ঘুম হইতে উঠিল। তাহার প্রশান্ত ও প্রফুল্ল মুখখানি গোবরে পদ্মফুলের ন্যায় গণেশের গোয়ালে শোভা পাইতে লাগিল। বালিকা ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল, নিকটে কোন জিনিস পত্রই নাই। তাহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল। সে অরুণের নিকট সংকেত করিয়া খাবার চাহিল। অরুণের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। সে আপনাদিগের দুরবস্থায় ভারি বিমর্ষ হইয়া এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল। এখন যখন আদরিণী তাহার নিকট খাবার চাহিল, তখন তাহার মুখ আরও বিমর্ষ হইল, এবং চক্ষু জলসিক্ত হইল। আদরিণী অরুণের মুখ কখনও বিমর্ষ দেখে নাই। ভ্রাতার চক্ষে জল দেখিয়া তাহারও চক্ষে জল আসিল। অরুণ তাহাকে বুঝাইয়া দিল, এক্ষণে তাহাদিগের খাইবার কিছুই নাই। গণেশ ফিরিয়া আসিলে তবে খাবার পাওয়া যাইবে।

ক্রমে গণেশ ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিল। অজিত

ক্রমে সমুদায় জিনিস পত্র গণেশের বাড়ীতে আনিয়া উপস্থিত করিল। গণেশের স্ত্রী প্রচুর খাবার প্রস্তুত করিয়া রামরূপের ও রামরূপের পুত্র কন্যাগণের আহারের জন্য উপস্থিত করিল। গণেশ এইরূপে অতিথি সৎকার করিয়া বৈকালে খনিতে কার্য্য করিতে গেল।

ঔষধ সেবনে বেশ সুস্থ হইয়া রামরূপ ঘুমাইতেছে। আদরিণী অজিতের আনীত জিনিস পত্র ঘরে গুছাইয়া রাখিতেছে, অরুণ ভগিনীর সাহায্য করিতেছিল। এমন সময় অজিত কহিল—"অরুণ একবার আমার সঙ্গে এস; তোমাকে কয়েকটী কথা বলিব।"

অজিত ও অরুণ অনতিদূরে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইল। অজিত বলিল—"দেখ ভাই অরুণ, বাবার হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বাবু বলিলেন তাঁহার হাত সারিবে বটে, কিন্তু হাতুড়ি দ্বারা কয়লা ভাঙ্গিতে যে বলের আবশ্যক তেমন বলবান হইবে না। তাহা হইলে সারিয়া উঠিলেও বাবা আর কাজ করিতে পারিবেন না। গণেশেরও এমন অবস্থা নয় যে, অধিক দিন আমাদিগের ভরণ পোষণ করে। আর দেখ আমরা পরের গলগ্রহ হইব কেন। আমাদের শরীরে যথেষ্ট বল আছে। আমরা দুই ভাই পরিশ্রম করিলেই বাবা যে কাজ করিতেন, তাহা করিতে পারিব। আর যদি সমান কাজ করিতে পারি, তবে সমান টাকাও পাইব। আমার ইচ্ছা যে, কাল হইতেই আমরা কাজের চেষ্টা দেখি। তুমি কি বল।"

ভ্রাতার কথা শুনিয়া অরুণের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। অরুণ কহিল—"তা পারিব না কেন? তুমি যখন সঙ্গে থাকিবে, তখন আর আমার ভয় কি? আমি কালই তোমার সঙ্গে যাইব।"

অজিত।—কিন্তু খনিতে গেলেই তো আর কাজ পাওয়া যাইবে না। কাজ যোগাড় করিয়া লইতে হইবে। চল কাল আমরা প্রাতঃকালে খনির সাহেবের কাছারিতে যাই। আমাদিগের দুরবস্থা জানাইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে কাজ দিবেন।

অরুণ।—যদি সাহেব আমাদিগকে মারেন। আমার সাহেব দেখিলেই ভয় হয়। আমি কিন্তু সাহেবের সম্মুখে যাইতে পারিব না।

অজিত।—অন্যায় কার্য্য না করিলে সাহেব মারিবেন কেন? আমাদিগের পিতা সাহেবের চাকর। তাঁহার বিপদ সাহেবকে জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিব। ইহাতে মারিবার কথা কি? তুমি এমন ভয় পাইতেছ কেন? বাবা বলিয়াছেন, যাহারা বিপদে পড়িয়া ঈশ্বরের শরণ লয়, ঈশ্বর তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন। তিনি দুর্ব্বলের সহায় ও আশ্রয় দাতা। তাঁহার আশ্রয় লইলে আর কাহারও ভয় থাকে না। আমাদিগের মত নিরাশ্রয় ও অনাথকে নিশ্চয়ই তিনি আশ্রয় দিবেন ও বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। তুমি এমন ভয় পাইতেছ কেন? তুমি কি পিতার সকল উপদেশ ভুলিয়া গেলে?

অরুণ লজ্জিত হইয়া কহিল—"আচ্ছা কাল আমি তোমার সঙ্গে সাহেবের কাছে যাইব। কিন্তু আমি কোন কথা কহিতে পারিব না।"

অজিত কহিল—"সে জন্য চিন্তা করিও না। যাহা বলিতে হয়, আমিই বলিব। তুমি কেবল সঙ্গে থাকিও।"

ধন্য অজিত কুমার! ১৩ বৎসর বয়সে যে পরের গলগ্রহ হওয়াকে এরূপ ঘৃণা করিতে পারে এবং ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংসারের সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে, তাহার জীবন ধন্য।

স্থানাভাব বশতঃ ধাঁধার উত্তর এবং নূতন ধাঁধা এবারে দেওয়া গেল না।



জুলাই, ১৮৯০।



বিবিধ।

বালকের সাধু দৃষ্টান্ত।—আমেরিকাতে চিকাগো দেশে এক রাত্রিতে একটী স্ত্রীলোক মদ খাইয়া রাস্তাতে মাতলামি করিতেছিল। পুলিশ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সেই রাত্রি কতুয়ালিতে আটক রাখে। পরদিন পুলিশ আদালতে তাহার বিচার হয়। বিচার কালে সেই স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে তাহার অল্প বয়স্ক একটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। দরিদ্রতাবশতঃ বালকটী অল্প বয়সেই পাকিয়া উঠিয়াছিল। বিচারক সেই স্ত্রীলোকটীর কয়েক টাকা অর্থ দণ্ড করেন,—অর্থ দণ্ডের টাকা দিতে না পারিলে তাহাকে কারাদণ্ড ভুগিতে হইবে বলিয়া আদেশ করেন। এই দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া বালকটী তাহার ভগ্নীর হাত ধরিয়া বলিল,—"চল, বোন, আমরা ভিক্ষা করিয়া দণ্ডের টাকা সংগ্রহ করি, নতুবা মাকে কারাগারে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া ভাই বোনে আদালতের বাহিরে যাইয়া লোকের নিকট ভিক্ষা মাগিতে লাগিল। মাতার জন্য বালক বালিকার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া, অনেকেই অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল। সে বড় হইলে তাহাদের অর্থ প্রত্যর্পণ করিবে বলিয়া দাতাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আসিল। অবশেষে আদালতে আসিয়া টেবিলের উপর কতকগুলি অর্থ রাখিয়া, বিচারককে বলিল,—"এই নিন, মহাশয়, আমি ভিক্ষা মাগিয়া এই টাকাগুলি আনিয়াছি। আমি আজও অর্জ্জনক্ষম হই নাই; সুতরাং দণ্ডের সমুদয় টাকা দিতে পারিলাম না। আমি বড় হইলে বাকি টাকা পরিশোধ করিব। এখন আমার মাকে ছাড়িয়া দিন—কারাগারে প্রেরণ করিবেন না।" বালকের এরূপ মাতৃভক্তি দেখিয়া একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রাণ গলিয়া গেল,—তিনি গদ-গদকণ্ঠে বালককে বলিলেন, "তোমার মাকে আর কারাগারে যাইতে হইবে না। আমি দণ্ডের বাকি টাকা দিতেছি।" এ দৃশ্য দেখিয়া বিচারকেরও প্রাণ গলিয়া গেল, বালকের ভাব দেখিয়া তিনি সেই স্ত্রীলোকটীকে বিনাদণ্ডে ছাড়িয়া দিলেন। পুত্রের ব্যবহারে মাতাল মার চেতনা জন্মিল, সেই স্ত্রীলোকটী আর মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না বলিয়া সেই মুহূর্ত্ত হইতে প্রতিজ্ঞা করিল। জানা গিয়াছে, বালক পুত্রের সেই সাধু দৃষ্টান্ত হইতে, সেই স্ত্রীলোকটীর জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে—নেশা করা ছাড়িয়া দিয়াছে।

* * *

বালিকা লেসির বিক্রম।—লেসি ও মেরি নামে দুটী বোন কুয়েটা নামক এক জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইতেছিল। লেসির বয়স ১৬, মেরির বয়স ১৩। কুয়েটা জাহাজ হঠাৎ জলমগ্ন পর্ব্বতে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। জাহাজ ডুবিতে দেখিয়া, লেসি দৌড়িয়া যাইয়া, মেরিকে তার ঘর হইতে জাহাজের পাটাতনের উপর ডাকিয়া আনিল। দুই বোন পাশাপাশি হইয়া জলে ভাসিবে, এই ইচ্ছা। এমন সময় তাহাদের অভিভাবক আসিয়া লেসিকে বলিল, "তুমি আপনার রক্ষার উপায় দেখ, আমি মেরির জন্য লইলাম।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই জাহাজ ডুবিয়া গেল—মেরি ও অভিভাবককে আর জলের উপর দেখা গেল না, লেসি ডুবিয়াই ভাসিয়া উঠিল। জাহাজের মেষপাল সাগর বক্ষে সাঁতরাইতেছিল—তাহাদের চাপা পড়িয়া লেসির প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এমন সময় একটা ভেলা ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহা ধরার জন্য লেসি প্রয়াস পাইল। জাহাজের এক জন কর্ম্মচারী সেই ভেলা ধরিয়া লেসিকে তাহার উপর চড়াইয়া দিলেন এবং নিজেও তাহাতে চড়িলেন। সমুদ্র স্রোতে তাঁহারা ভাসিয়া চলিলেন—কিন্তু কিছুতেই কূলের দিকে যাইতে পারিলেন না। অবশেষে লেসি সমুদ্রকূল হইতে দুই মাইল দূরে থাকিতেই ভেলা ছাড়িয়া কূল পাইবার জন্য সাঁতার দিলেন। কিন্তু কূলে পৌছিতে না পারিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এমন সময় আর একখানা ভেলা দেখিতে পাইয়া তাহাতে চড়িলেন; কিন্তু সেই ভেলার অপর লোকদের দুর্ব্ব্যবহারে তাহা ছাড়িয়া দিয়া আবার জলে ভাসিলেন। এইরূপে জলে ভাসিতে ভাসিতে আর এক ভেলা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সমুদ্র স্রোতে পড়িয়া সেই ভেলা কূলের দিকে না যাইয়া অপার সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছিল। লেসি সেই ভেলা টানিয়া তীরের দিকে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহার সমুদয় চেষ্টা, সমুদয় শ্রম ব্যর্থ হইতেছে, তখন ভেলা ছাড়িয়া দিয়া আবার তীরের দিকে সাঁতরাইতে লাগিলেন। কিন্তু ২০ ঘণ্টা কাল ক্রমাগত জলের উপর ভাসিয়া অবশেষে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন,—এমন সময় অপর একখানা জাহাজ আসিয়া তাঁহাকে সমুদ্রবক্ষ হইতে কুড়াইয়া লইল। ১৬ বৎসরের বালিকা লেসি শুধু আপন জীবন বাঁচাইবার জন্য নহে—জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারীর জীবন রক্ষার জন্য যে অপার বিক্রম দেখাইয়াছে, তাহা কয় জন পুরুষে পারে? তাঁহার এই বিস্ময়কর বিক্রম-কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে মানব মনে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে।

* * *

ভারত রমণীর বিক্রম-কাহিনী।—ইংরেজ বালিকার বিক্রম-কাহিনী বলিয়াছি, একজন ভারত রমণীর বিক্রমের কথাও তোমাদিগকে বলি। অল্প দিন হইল, এডওয়ার্ড উইলিয়াম মেকলিন নামে একজন সাহেব দাক্ষিণাত্যের এক জঙ্গলে পাহাড়ী লোকদের লইয়া শিকারে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কাইরমন নাম্নী এক আহিরিণী গোয়ালিনীও শিকারে গিয়াছিল। সাহেবের সঙ্গে এক গোয়ালিনীর শিকারে যাওয়ার কথা, আপাততঃ উপাখ্যান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এ উপাখ্যান নহে, সত্য কথা। সেই জেলার ডেপুটী কমিসনর একথা সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। সাহেব আর আহিরিণী লোকজনদের পিছনে ফেলিয়া আগিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা একটা নালার মধ্যে একটা বাঘ দেখিতে পাইয়া, তাহার উপর গুলি ছুড়েন। বাঘ

গুলি খাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, শিকারীরা এক গাছের আড়ালে আশ্রয় লইলেন। নালার পার খুব উচ্চ ছিল বলিয়া, বাঘ লাফাইয়া আসিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে পারিল না। সাহেব নালাতে নামিয়া যাইয়া বাঘের উপর গুলি ছুড়িতে ইচ্ছা করিলেন। আহিরিণী তাহাতে নিষেধ করিতে লাগিল। লোকে তাঁহাকে পাছে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে, এই আশঙ্কায় সাহেব তাহার কথায় কাণ দিলেন না। তখন পাহাড়ী লোকেরাও আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। সাহেবকে যাইতে দেখিয়া কাইরমনও বন্দুক হাতে তাহার পিছনে পিছনে চলিল। নালাতে নামিয়া বাঘের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই সাহেবের দিকে বাঘ ছুটিল, মেকলিন তাহার বুকে ও কাইরমন তাহার গলায় বন্দুক ছুড়িলেন। গুলি গ্রাহ্য না করিয়া বাঘ আসিয়া সাহেবের উপর পড়িল। আহিরিণী গোয়ালিনী হাতের বন্দুকের বাঁট দিয়া বাঘের মাথায় আঘাত করিতে লাগিল, বন্দুক ভাঙ্গিয়া গেল; বাঘ সাহেবকে ছাড়িয়া গোয়ালিনীকে ধরিল। সাহেব তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বাঘের উপর গুলি ছুড়িলেন—বাঘ গোয়ালিনীকে ছাড়িয়া আবার সাহেবকে ধরিল। তখন সাহেব নীচে, বাঘ উপরে; সাহেবের একখানা হাত বাঘের মুখের ভিতরে। বাঘের কাণের ভিতর গুলি করিতে সাহেব কাইরমনকে বলিতে লাগিলেন নতুবা তাঁহার প্রাণ যায় যায়। আহিরিণী পাহাড়ীর হাত হইতে বন্দুক লইয়া বাঘের কাণের মধ্যে গুলি ছুড়িল। বাঘ গুলি খাইয়া সাহেবকে ছাড়িয়া ছুটিয়া পালাইল। তখন সাহেব নিজের হাত পা্রি এবং কাইরমনের মাথা ও ঘাড়ের ক্ষতস্থানে পটি বাঁধিয়া বাঘের অন্বেষণে ছুটিলেন। যাইয়া দেখে আহিরিণীর গুলিতে বাঘ পঞ্চত্ব পাইয়াছে। অনেক মেম হাতীর উপর হাওদার ভিতর থাকিয়া বাঘ শিকার করিয়াছেন বলিয়া শুনা গিয়াছে, কিন্তু কাইরমন আহিরিণীর ন্যায় কোন রমণী সম্মুখীন ভাবে এরূপ নির্ভীক হৃদয়ে বাঘ শিকার করিয়াছেন বলিয়া, কখনও শুনা যায় নাই। ভারত রমণী আহিরিণীর এরূপ বিক্রম, গৌরবের বিষয় বটে।



বড় খুকী।

(পিত্রালয়ে বালিকা।)

হরদয়াল ঘোষ কলিকাতার একজন সম্রান্ত গৃহস্থ। ওকালতি তাঁহার ব্যবসায়। নিজ চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এবং লোকসমাজে বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। হরদয়াল বাবুর যেমন আয় বেশ ছিল, ব্যয়ও বিলক্ষণ ছিল। পরিবারে লোক অনেক। স্ত্রী, একটী পুত্র, দুইটী কন্যা, বৃদ্ধা মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন চারি পাঁচজন। ইহা ছাড়া চাকর চাকরাণী অনেকগুলি ছিল। আজ কাল এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে লোকের মত ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রাচীন হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রতি লোকের আস্থা বড় একটা দেখা যায় না। অধিকাংশ লোকই স্ব স্ব জ্ঞান ও বিশ্বাসানুযায়ী কাজ করিতে ইচ্ছুক; কেবল সমাজ-

শাসন ভয়ে প্রকাশ্যে কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। হরদয়াল বাবু এই দলের লোক ছিলেন। সভ্য ইংরাজদের অনেক আচার ব্যবহার তিনি ভাল মনে করিতেন। পুত্র কন্যারা সমান ভাবে শিক্ষা পাইবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, ভাল বসন ভূষণ পরিবে, স্বাধীনভাবে লেখাপড়া, রীতি নীতি সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষিত হইবে, এইরূপ তাঁহার মত ছিল। মতটী ভাল বটে, বলিতেও সহজ; কিন্তু কার্য্যতঃ বালক বালিকাদের এরূপ শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। ইংরাজেরা এ ভাবে শিক্ষা দিতে জানে, তাহাদের ছেলেপিলেও ভাল হয়; আমরা এ কঠিন শিক্ষায় দীক্ষিত নহি; কিরূপে বালক বালিকাদের শিক্ষা দিতে হইবে জানি না; সুতরাং আমাদের শিব গড়িতে বাঁদর হইয়া দাঁড়ায়,—আমাদের ছেলেপিলেরা অল্পেই জ্যেঠা হইয়া উঠে।

আমাদের হরদয়াল বাবুর ভাগ্যেও তাই ঘটিল। তিনি পুত্র কন্যার উন্নতির জন্য, তাহাদের সরল ও পবিত্র চরিত্র গঠনের জন্য, সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা প্রণালীতে এবং পারিবারিক জীবনে এমন অনেক বিষয় ছিল, যাহাতে তাঁহার শিক্ষার বিপরীত ফল ফলিত। পুত্র কন্যার কোনরূপ মনোকষ্ট তাঁহার প্রাণে সহ্য হইত না। সর্ব্ব বিষয়ে তাহাদের মন যোগাইয়া চলিতেন। তাহারা যখন যে জিনিস চাহিত, তখনই তাহা দিতেন। খোকা বলিল,—"বাবা আজ আমায় একখানি কলের গাড়ী দিতে হবে";—খুকীও সেই তানে যোগ দিয়া বলিল,—"বাবা আমার একখানা ভাল বম্বে সাড়ী"। হরদয়াল বাবু অমনি রাজী। তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, বিকালে কাছারী হইতে আসিবার সময় আনিব।" পুত্র কন্যা আহ্লাদে ডগমগ; কে তাহাদের পায়। খোকা খুকী এইরূপ যে দিনই যে জিনিস চাহিত সেই দিনই তাহা পাইত বটে, কিন্তু সে সমস্ত জিনিসের যত্ন জানিত না। যে দিন যাহা আসিত, পর দিবস আর তাহা থাকিত না। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চুরমার হইয়া যাইত। এমন কি ভাল ভাল বহু মূল্যের বস্ত্রগুলি তাহারা যেদিন পরিত, তাহার পরদিনই ছিঁড়িয়া অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলিত। পুত্র কন্যার এইরূপ অসাবধানতার জন্য হরদয়াল বাবুর স্ত্রী যদি তাহাদের কোনরূপ তিরস্কার করিতেন, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া ঠাকুরমার কাছে লাগাইত। বুড়ী তখন নাতিন নাত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া, পুত্রবধূকে আচ্ছা রকম কড়া দুকথা শুনাইয়া দিতেন। সুতরাং খোকা খুকী মনে করিত তাহাদেরই জিত।

হরদয়াল বাবুর পুত্র কন্যাত্রয়ের মধ্যে তাঁহার বড় খুকীরই কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। প্রথম সন্তান বলিয়া ছেলে বেলা হইতে বড় খুকী কিছু অধিক আবদারে ছিল। বড় খুকী সুন্দর; বাড়ীর সকলেই বলিত,—"বড় খুকীর মুখের মত মুখ কজনার আছে? কেমন সুন্দর চোক। বড় খুকীর বিয়ের বর পেতে আর কোন কষ্ট হবে না।" বড় খুকী তাহার এই সমস্ত প্রশংসা হা করিয়া শুনিত, আর মনে করিত, বাস্তবিকই বুঝি তাহার মত রূপসী আর জগতে কোথায়ও নাই। পাঁচ বৎসরের হইলেই হরদয়াল বাবু বড় খুকীকে কলিকাতার ভাল একটী বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তথায় ইংরাজী বাঙ্গালা দুইই রীতিমত শিক্ষা হইত। অল্পদিনের মধ্যেই বড় খুকী টোটাটুটি এ, বি, সি, ডি, বি এল এ ব্লে ইত্যাদি শিখিয়া ফেলিল। অমনি বাড়ীর সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল,—"বড় খুকী খুব শীঘ্র সব শিখিবে; বড় খুকীর বড় বুদ্ধি, বড় মেধা; কেমন শীঘ্র সব শিখিয়া ফিলিতেছে।"

বড় খুকীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সে মনে করিতে লাগিল, তাহার সব শিক্ষা বুঝি ইহার মধ্যেই হইয়া গিয়াছে, আর অধিক বাকী নাই।

ছেলেবেলা হইতেই এরূপ আদর ও আবদার পাইয়া পাইয়া এবং নানারূপ প্রশংসাবাদ শুনিয়া শুনিয়া আমাদের "বড় খুকীমণি" ভগবানের সৃষ্টির এক অপূর্ব্ব চিচ্ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। দিন দিন যেমন বয়স বাড়িতে লাগিল, পড়াশুনা চুলায় যাইতে লাগিল। ক্রমশঃই সে অধিক অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। কেবল নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা বুঝিত; অন্যের কষ্ট, অন্যের অভাবের প্রতি একবারও দৃষ্টি ছিল না। ঘরে মা তাহাদেরই সুখ ও আরামের জন্য খাটিয়া খাটিয়া মরিতেছেন বড় খুকী সর্ব্বদাই দেখিতে পাইত; কিন্তু তিনি কখনও পরিশ্রান্তা ও পিপাসার্ত্তা হইয়া এক গ্লাস জল চাহিলে, তাহা আনিয়া দিতে বড় খুকীর পা সরিত না; চাকর বাকরদের ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি আরম্ভ করিত; এবং মা বিরক্ত হইয়া হয়ত ইতিমধ্যে নিজে গিয়া জল খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন! ইহাতে বড় খুকীকে কোনরূপ লজ্জা বোধ করিতে কিম্বা অপ্রস্তত হইতে দেখা যাইত না।

বড় খুকী অলসের হদ্দ ছিল। আজ কোথায় বেড়াইতে যাইবে; বহুমূল্যের খুব ভাল একখানা কাপড় পরিয়া হয়ত গেল; বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যে সে কাপড় ছাড়িয়া রাখিবে, তাহাতেও বড় খুকীর আলস্য বোধ হইত। সেই বহুমূল্যের কাপড় খানি নিয়াই ধূলা মাটিতে গড়াইয়া গড়াইয়া তাহা ময়লা করিত, ছিঁড়িত, তবে তাহা ছাড়িত। ভবিষ্যতে আবার যখন কোথায়ও যাইবার দরকার হইত, ভাল কাপড় নাই বলিয়া নাকিস্বরে কাঁদিতে বসিত। হরদয়াল বাবুর বালক বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে ভাল মত থাকিলে কি হইবে; সে মত কার্য্যে পরিণত করিবার সময়ই তাহার মুস্কিল বাধিত। পুত্র কন্যার চক্ষে জল দেখিলেই তাঁহার মতামত চুলায় যাইত। আধ ঘণ্টা নাকিস্বরে কাঁদিয়া বড় খুকী পর দিবসই, আর সময় থাকিলে সেই দিবসই, বহুমূল্যের আর এক-খানি বম্বে কিম্বা অন্য কোন ভাল সাড়ী আদায় করিত। এইরূপে যখনই যাহা নাকিস্বরে চাহিত বড় খুকী স্নেহশীল পিতার নিকট তাহা পাইত। কোন জিনিসের অভাব কখনও জানে নাই; সুতরাং জিনিসের মূল্যাদি সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান ছিল না, উহার মায়া মমতাও জানিত না। অবুঝ ছেলেপিলের অভ্যাস এই প্রকারেই খারাপ হইয়া থাকে।

বড়খুকী অধৈর্য্য ও অসহিষ্ণুরও একশেষ ছিল। কোন একটী কাজ সহজে কিম্বা ইচ্ছামত না হই-লেই তাহার সহিষ্ণুতার লোপ হইত। চটিয়া বিরক্ত হইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিত। স্থির-ভাবে কোন কাজ করিবার চেষ্টা তাহার একবারেই ছিল না। যখন যাহা চেষ্টা করিত "ধর-মার-কাট" করিয়া শেষ করিতে চাহিত; সুতরাং তাহার কোন কাজই সুশৃঙ্খলায় হইত না। বাটীতে ক্লাশের পাঠ্যপুস্তকের সহিত সাক্ষাৎ খুকীর খুব কমই হইত। যাহা কিছু কেতাব নাড়াচাড়া করিত, সে সকাল বেলা ২০।৩০ মিনিটের জন্য। সন্ধ্যার পর উদর পূরিয়া খাইয়া সে আর মাথা তুলিতে পারিত না; যেখানে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলে বসিয়া সাংসারিক ও অন্যান্য আলা-পাদি করিতেন, কোন আসনেই হউক, কিম্বা মাটিতেই হউক, চিত হইয়া পড়িয়া হা করিয়া সেই সমস্ত গল্প গিলিত। যদি বিছানায় গিয়া শুইতে, কিম্বা তথা হইতে স্থানান্তরে যাইতে বলা হইত,

সে কথা সে শুনিয়াও শুনিত না; মুখ ফুলাইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া সেইখানেই পড়িয়া থাকিত।

পড়ার সময় বড়খুকী প্রায়ই বই খুঁজিয়া পাইত না; লেখার সময় তাহার দোয়াত কলম মিলিত না। বাড়ীর লোকগুলি এমন নচ্ছার, সকলেই তাহার জিনিস পত্র ফেলিয়া দেয়। খুকীমণির চীৎকারে বাড়ী ফাটিয়া যাইত। "কে আমার বই ফেলিয়াছ, দোয়াত কলম নিয়াছ, শীঘ্র দেও; তাহা না হইলে দেখিবে এখন।" এইরূপে ছোট ভাই বোনকে ডাকিয়া ধমকাইত; ঝিদের চুল ধরিয়া টানিত; তাহারাই যেন তাহার পুস্তকাদি ফেলিয়া দিয়াছে। খুঁজিতে খুঁজিতে পড়ার বই হয় ত টেবিলের নীচে পাওয়া যাইত; দোয়াত কলম পূর্ব্বের দিবস কোথায় বসিয়া লিখিয়াছিল, সেইখানে পাওয়া যাইত; কেহই কিছু ফেলিয়া দেয় নাই; নিজের রাখিবার অযত্নে তাহার জিনিসপত্র সময়মত মিলিত না। বহু অনুসন্ধানে যদিও কখনও কখনও সমস্ত মিলিত বটে; কিন্তু মিলিলে কি হইবে? দোয়াতে কালী নাই; কলম ভোতা হইয়া গিয়াছে, লেখা যায় না; পেন্সিল কাটা নাই;—কালী আন, কলম আন, ছুরী আন,—আবার খুকীমণির চীৎকারে বাড়ী কম্পিত হইত। অভিধান খুলিয়া কথার মানে লিখিতে বলিলে খুকীর মাথায় বজ্রাঘাত হইত। কি আপদ! অত বড় বই বরাবর খুলিয়া সে মানে বাহির করিতে পারে না। কেহ বলিয়া দেও ত দেও, আর তাহা না হইলে সে বই বন্ধ করিবে। "খুকী, এটাত সহজ অঙ্ক, নিজে একবার চেষ্টা কর না কেন?"—কি আপদ! সে তাহা পারে না—তার আবার চেষ্টা কি? ভাল উৎপাত।

বাস্তবিক চেষ্টা বড়খুকীর কিছুতেই ছিল না; সামান্য কিছু করিতে হইলেই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিত। এক দিবস খুকী রাত্রিতে সার্কাস দেখিয়া আসিয়াছে। ভাল কাপড় চোপড় পড়িয়া এবং পায়ে বুট ও মোজা আঁটিয়া পিতার সঙ্গে আমোদ দেখিতে গিয়াছিল। অনেক রাত্রি হইয়াছে; শুইতে যাইবে, বড় ঘুম পাইয়াছে। অন্যান্য কাপড় চোপড় ছাড়িয়াছে; কিন্তু পায়ে বুট জুতা ফিতা দিয়া বান্ধা; মাথা নোয়াইয়া আস্তে আস্তে সে ফিতা যে নিজে খুকীমণি খুলিবেন, তাহা আর তাঁহার হইয়া উঠিল না। মেদিনী কম্পিত করিয়া ঝিকে ডাকিতে লাগিলেন। ঝি আসিয়া জুতা খুলিয়া দিবে, তবে খুকীর শয়ন হইবে। ঝি আসিতে পারে না, ছুট্‌কী একা এক ঘরে; তাহার কাছে বসিয়া আছে। এদিকে বড়্‌কী ঠাকুরাণীর চীৎকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাতে তাহার মার বড় রাগ হইল,—তিনি গিয়া বলিলেন,—"হারে, বড় খুকী, তোর কি লজ্জা করে না? তুই এত বড় মেয়ে হতে চল্লি, আর পায়ের জুতা জোড়াটা খুল্‌তে শিখ্‌লি না? ছি ছি ছি, বড় লজ্জার কথা।" মায়ের কথায় লজ্জা হওয়া দূরে থাকুক, সে রাগে গড় গড় করিতে করিতে উত্তর দিল,—"তাত, আমি পারি না, তার কি হবে এখন? মাথা নীচে ক'রে অতক্ষণ ব'সে জুতোর ফিতে খুল্‌তে আমি পারি না; এতে আর লজ্জা বা প্রশংসার কি আছে?" মা বলিলেন,—"লজ্জা বা প্রশংসার এতে কিছু থাক আর নাই থাক, জুতো তোমায় নিজেই খুল্‌তে হবে, ঝিকে আমি আস্‌তে দেব না। ছি ছি ছি, এত বড় মেয়ে, ভাল কথা বলিলে তাহা বোঝ নাই, ফি'রে মুখে মুখে উত্তর?" মায়ের রাগে খুকীর কি আসে যায়। সে প্রত্যুত্তরে গলা সপ্তমে চড়াইয়া বলিল,—"আমিও ত নিজে জুতো খুল্‌ব না, জুতো নিয়াই আজ শোব।" হরদয়াল বাবুর স্ত্রী আর বেশী কথা কাটাকাটি না করিয়া,—"তোর যা ইচ্ছা তাই কর, তুই আমার



মা কি খিট্‌খিটে।

কুসন্তান,"—এই কথা কয়েকটি বলিয়া চলিয়া আসিলেন। বড় খুকী তখন রাগে মনে মনে বলিতেছিল,—"মা কি খিট্‌খিটে।" কিন্তু মায়ের ঐ সামান্য কয়েকটি বিরক্তির কথা যে তাহার খিট্‌খিটে প্রত্যুত্তরের কাছে কিছুই নহে, সে জ্ঞান তাহার ছিল না। রাগে রাগে সেদিন জুতা পায়ে দিয়াই শুইয়া থাকিল। খুকী ঠাকুরমার সঙ্গে শুইত; সে বুড়ী যখন জুতা খুলিতে চাহিল, তাঁহাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। রাত্রি ঘুমে কাটিয়া গেল বটে; কিন্তু পর দিবস বিছানা হইতে উঠিতে গিয়া দেখে যে, পা দুখানি ব্যথায় বিষ হইয়া আছে। বুট জুতা পায়ে ফিতায় শক্ত করিয়া বান্ধা ছিল; পা ব্যথা হইবারই কথা। আজ নিজে আস্তে আস্তে ফিতা দুগাছি খুলিয়া জুতা ধরিয়া টান দিতে জুতা সহজেই খুলিয়া আসিল। তখন খুকী মনে ভাবিল,—"কাল মার সঙ্গে ঝগড়া না করে যদি নিজে এইরূপ খুলতে চেষ্টা কত্তেম, তাহা হলে ত, আমার পা দুখানি এমন ব্যথা হ'ত না?" দায়ে পড়িয়া খুকী এরূপ অনেকদিন অনেক শিক্ষা পাইত; কিন্তু সে সব তাহার মনে থাকিত বড় কম।

ক্রমশঃ।

সত্যের জয়।

একদা প্রত্যূষে কোন কৃষক বালক গ্রাম হইতে কিয়দ্দূরবর্ত্তী নগরের বাজারে স্বীয় শ্রমজাত ফলমূল, শাকসবজি বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। এক ধীবর-পুত্রও তাহার সহিত সেই বাজারে মৎস্য

বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। উভয়ে একটি ক্ষুদ্র বিপণীতে স্বীয় স্বীয় দ্রব্য সজ্জিত করিয়া ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। একে একে উভয়ের বিক্রয় দ্রব্য বিক্রীত হইতে লাগিল এবং তদ্বিনিময়ে রৌপ্য মুদ্রাগুলি তাহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রাধারের উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিতে দেখিয়া বালকদিগের অতিশয় আহ্লাদ হইল।

বাজারের সময় অতীত প্রায়, কেবল একটি বৃহৎ তরমুজ অবশিষ্ট রহিয়াছে, একটি ভদ্রলোক নিকটে আসিয়া ঐ ফলের উপর হাতটি রাখিয়া বলিলেন, আহা! কি সুন্দর ও বৃহৎ তরমুজ! তুমি কত হইলে তরমুজটি আমাকে বিক্রয় করিতে পার? বালক বলিল,—"মহাশয় এই তরমুজটি শেষ পড়িয়াছে, ইহা দেখিতে সুন্দর বটে। কিন্তু ইহার এই অংশটা দাগী, এই বলিয়া তরমুজটা উল্টাইয়া ধরিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"তাইত, এ যে পচা দেখিতেছি, তবে ইহা লইব না।"

ইত্যবসরে ঐ ভদ্রলোক বালকের সুন্দর ও সরল মুখশ্রী নিরীক্ষণ করিয়া এবং তাহার অপূর্ব্ব সরল ও সত্য ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন,—"বিক্রেয় দ্রব্যের দোষ প্রদর্শন করা কি ব্যবসায়ী-সুলভ ব্যবহার হইয়াছে।" বালক সবিনয়ে উত্তর করিল,—"মহাশয়, অসৎ হওয়া অপেক্ষা ত ভাল।" "তুমি ঠিক বলিয়াছ।" সর্ব্বদা এই নীতি মনে রাখিবে, তাহা হইলে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও মানবের অনুগ্রহ লাভ তোমার চিরসহচর হইবে। আমি কখনও তোমার এই ক্ষুদ্র বিপণি ভুলিব না। তৎ-পরে ঐ ভদ্রলোক ধীবর-পুত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৎস্যগুলা কি জীবন্ত?" "জীবন্ত বৈকি। আমি আজ সকালে ধরিয়াছি।" তিনি বালকের কথায় বিশ্বাস করিয়া মৎস্য ক্রয় করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলে ধীবর-পুত্র কৃষক বালককে বলিল,—"তুমি তরমুজের দাগ দেখাইয়া কি মূর্খতাই করিলে? এখন বোঝা বহিয়া মর, কিম্বা উহা ফেলিয়া দেও। এই দেখ কালিকার ধরা মাছ আজিকার টাট্‌কা মাছের দরে বিক্রয় করিলাম। আমি বেশ বলিতে পারি তরমুজ কিনিয়া কিয়দ্দূর চলিয়া গেলে তবে তাঁহার তর-মুজের দাগটার প্রতি দৃষ্টি পড়িত।"

সত্যপ্রিয় সরল বালক মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ধীবর বালকের কথায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল,—"তুমি কি বলিলে? তুমি কি জান না আজ সকালে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি তাহার দ্বিগুণ লাভ হইলেও আমি কখনই মিথ্যা কথা বলিতে পারি না। অধি-কন্তু বল দেখি ঠকিল কে? ভাবিয়া দেখিলে তুমিই ঠকিয়াছ। তুমি কি মনে কর ঐ ভদ্রলোকটি তোমা কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া পুনরায় তোমার দোকানে আসিবেন? কখনই না। কিন্তু তুমি বেশ জানিও যে তিনি চিরদিনের জন্য আমার বাঁধা খরিদ্দার হইলেন। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা যদিও কখন কখন জয়লাভ হয়, কিন্তু সে জয় চিরস্থায়ী নহে। সত্যের জয়ই প্রকৃত জয় কেন না উহা চিরকাল স্থায়ী হয়।"

বাস্তবিকই তাহাই ঘটিয়াছিল। পরদিন ঐ ভদ্রলোক কৃষক বালকের নিকট হইতে প্রায় সমস্ত ফল ও শাকসবজি ক্রয় করিলেন, কিন্তু ধীবর বাল-কের নিকট হইতে এক পয়সারও মৎস্য ক্রয় করিলেন না। এইরূপে কিছুকাল গত হইল। ভদ্রলোকটি দেখিলেন যে কৃষক বালকের নিকট হইতে সর্ব্বদাই ভাল জিনিস পাওয়া যায়। তিনি তাহারই নিকট ফলমূল শাকসবজি ক্রয় করিতে লাগিলেন, কখনও বা কথা-প্রসঙ্গে বালকের ভাবী উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব করিতেন। ভদ্রলোকটি

সমৃদ্ধশালী বণিক ছিলেন। একজন বণিক হওয়া বালকের নিতান্ত অভিলাষ দেখিয়া তিনি তাহাকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। কৃষক বালক কর্ম্মস্থানের বিবিধ বিভাগে কার্য্য করিয়া পরিশেষে অংশীদার হইয়া সমৃদ্ধিশালী ও যশস্বী বণিক হইয়াছিলেন।



পেটুক দামোদর।

দশ বছরের একটি ছেলে, পাড়াগাঁয়ে ঘর।
খাবার নামে লাল পড়্‌তো নামটি দামোদর॥
কার বাড়ীতে শ্রাদ্ধ হবে, কার বাড়ীতে বিয়ে।
পাকা ফলার পট্‌বে কবে থাক্‌তো সে এই নিয়ে॥
আমড়া বকুল জাম কাঁচা কুল মিল্‌তো যখন যা।
ছাগল গরুর মত দামু গিল্‌তো তখন তা॥
নিমন্ত্রণের নাম শুন্‌লে নাচ্‌তো দামোদর।
খেতো এত, তার কাছেতে বস্‌তে হ'ত ডর॥
কেউ যদি তায় কর্‌তো বারণ খেতে বেশী এত।
চ'ড়ে উঠে মূর্খ যেন তাকেই খেতে যেত॥
পেট কন্‌কন্, অম্ল ঢেকুর, ভেদ, বমি সব রোগ।
কাজে কাজেই প্রায়ই হ'ত তার শরীরে ভোগ॥
কইলে মাতা কোন কথা দেখে তাহার ক্লেশ।
মুখের চোটে উড়িয়ে দিত, গুণটুকু তার বেশ॥
একদিন সে প'ড়েছিল কিন্তু বড়ই দায়।
গড় কর্‌তে হ'য়েছিল সেদিন খাওয়ার পায়॥
সে সব কথা শুন্‌তে যদি ইচ্ছা থাকে বড়।
পেটুক দামুর কথা তবে শেষ অবধি পড়॥
বিষ্ণু রায়ের শ্রাদ্ধ হ'ল জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে।
বগল বাজায় দামু, খাবে মণ্ডা লুচি ঠেসে॥
আঁবের দফা ক'র্‌বে রফা আস্থা বড় মনে।
ইস্কুলেতে গেল না সে, যাবে নিমন্ত্রণে॥
তাই ঘট্‌লো, শ্রাদ্ধ বাড়ী জুট্‌লো আগেই গিয়ে।
সময় হ'তেই বেশ গুছিয়ে বস্‌লো পাতা নিয়ে॥
যে দিকেতে আত্মীয় লোক ছিলেন কেহ তার।
সে দিকেতে গেল না সে বস্‌তে খবরদার॥
ভাব্‌তো দামু খাওয়ার সময় দেখ্‌লে তাঁদের পাপ।
মানা করেন খেতে শুধু, বাড়ান মনস্তাপ॥
এই রকমে জঞ্জাল সব এক পাশেতে ঠেলে।
দামু ব'সে আচ্ছা ক'সে মণ্ডা লুচি খেলে॥
সন্দেশ আঁব দৈয়ে মেখে তাবোল্ তাবোল্ ক'রে।
গরুর মত লাগ্‌লো খেতে পেটে যত ধরে॥
কোঁচার কসি ফেল্লে খুলে, চুষ্‌লে আঁবের আঁটি।
দৈ সন্দেশ খাওয়ার যেন বাড়্‌লো পরিপাটী॥
আঁব দৈ তার ভর্ত্তি হ'ল নাক মুখ গাল ময়।
হাঁফাতে সে লাগ্‌লো খেয়ে, ক্ষান্ত তবু নয়॥
বমি আসে তবু চোষে আঁবের আঁটি নিয়ে।
তবু দেখে সন্দেশ দই মুখের ভিতর দিয়ে॥
এই রকমে খাওয়ার আশা মিট্‌লো যখন তার।
ব্যস্ত হ'ল উঠ্‌তে তখন, কিন্তু ওঠা ভার॥
সাঙ্গ হ'ল খাওয়া সবার সবাই উঠে যায়।
বোবার মত দামু সবার মুখের দিকে চায়॥
দামুর দশা দেখ্‌তে তখন জম্‌লো কত ছেলে।
'সবাই বল্লে এ কেন ভাই এমন ক'রে খেলে॥
ছোট ছোট ছেলে এসে দাঁড়িয়ে কাছে কয়।
'দেখ্ ভাই এর পেট্‌টা কেমন! জালার মতন নয়?'
কেউ বা বলে; 'হাত নাড়্‌তে পারে না ত এ।
হেথা এনে মুখে তবে দৈ মাখালে কে!'

এই রকমে সবাই বলে, সবাই দেখে হাসে।
ব্যথার উপর ব্যথা, দামুর মুখ শুকিয়ে আসে॥
আত্মীয় চান এখন দামু, কিন্তু আসে পর।
পেট ফুল্‌চে আস্‌চে বমি, কে নে যাবে ঘর?
চিৎ হয়ে সে পড়্‌লো শুয়ে ব'স্‌তে নাহি পারে।
পেট-ফোলা গা-বমি-বমি তাতেও যে না সারে॥
তার পরেতেই হাতে হাতে খাওয়ার পুরস্কার।
নাক মুখ চোক ভ'রে গেল বমির চোটে তার॥
চোক চাইতে পারে নাক, নিশ্বাস না সরে।
ধূলায় লুটিপুটি দামু কেবল গোঁ গোঁ করে॥
দাঁড়িয়েছিলো সেথা যারা ফেল্‌লে তুলে তাকে।
মুখ দেখে তার ফেল্‌লে চিনে শ্রাদ্ধ বাড়ীর লোকে॥
নাক মুখ চোক ধুইয়ে তারা দামুকে তার পরে।
পৌঁছে দিয়ে এল ঘরে ধরাধরি ক'রে॥
পিতা তখন দেখে পেটুক দামোদরের কাজ।
মনে বড় বেজার হলেন, বড়ই পেলেন লাজ॥
মা বোন তার এসে সবাই ধ'রে নিয়ে গিয়ে।
বিছানাতে ধীরে ধীরে দিলেন শোয়াইয়ে॥
কিন্তু তাতে দামু ত কই সুখ পেলে না মূলে।
পেট ফাটে যার কি হবে তার বিছানাতে শুলে॥
মা যা করেন কিছুতে তার কিছু নাহি হয়।
শুয়ে করে ছট্‌ ফট্‌ আর কেঁদে কেঁদে কয়।—
"প্রাণ আইঢাই ক'চ্চে যে গো, বমি বমি গা।
এমন ক'রে কেন খেলুম—বাঁচ্‌ব ত গো মা!
পেট্‌ ফুল্‌চে গা জ্বল্‌চে, বুক যাচ্চে ফেটে।
ডাক্‌-না মা সব ঠাকুরদিকে, হাত বুলো-না পেটে॥
ডাক্তারকে ডাক্‌তে ছুটে যাক্‌-না আর এক জন।
পেটে না হয় তেলে জলে দাও-না ততক্ষণ॥
রাখ্‌তে যে আর পারি না মা, বড় বাজে পেটে।
ছুরি এনে দাও কোমরের ঘুন্‌সী আগে কেটে॥"
কতই কাঁদে, 'খাব না আর' ব'লে মাথা নাড়ে।
দামু এখন ছাড়্‌তে রাজি, দই তাকে কই ছাড়ে?
বমি টমি কর্‌লে কত, ওষুধ কত খেলে।
কষ্টের হাত হ'তে ত্বরায় নিস্তার কই পেলে!
দিন ফুরা'ল রাতও গেল ঘুম হ'ল না তার।
ভোরের বেলা একটু যেন কম্‌লো পেটের ভার।
পড়্‌লো তখন ঘুমিয়ে দামু, তার পরদিন উঠে।
অনেক বেলায় বস্‌লো যখন, সবাই এল ছুটে॥
মিছরি খেতে খেতে দামু ব'ল্লে মায়ের কাছে।
"যা ইচ্ছা ক'রো, এমন আর যদি হয় পাছে॥
খেতে যেতে বল্‌বে যেথা সেথাই শুধু যা'ব।
সহজে যা খেতে পারি তার বেশি না খা'ব॥"
মাও বল্লেন—"এ সব কথা মনে রেখ বাবু।
বাঁচাতে আর পারবো নাকো এবার হ'লে কাবু॥
জিনিস গুলি দেখ বটে পরের সমুদয়।
তাতেই বা কি হয় রে, বাপু? পেট ত পরের নয়!
নিজের যত কষ্ট তা ত দেখ্‌লে ভুগে বেশ।
কষ্টে তোমার হ'চ্চে সবার কষ্টের একশেষ॥
তবেই, খেয়ে কষ্ট পেয়ে উপোস দেওয়ার চেয়ে।
ভাল কি নয় তুষ্ট হওয়া নিয়ম-মত খেয়ে!"
সম্মুখেতে সবার দামু কর্‌লে তখন পণ।
এ কথা আর ভুল্‌ব নাক বাঁচ্‌ব যতক্ষণ॥
এখন, দামু বস্‌লে খেতে, গেলে নিমন্ত্রণে।
'বিষ্ণু রায়ের শ্রাদ্ধে খাওয়া' আগে ভাবে মনে॥

কাঠবিড়াল।

গৃহপালিত পশু পক্ষী ভিন্ন আমরা সচরাচর যে সকল জন্তু দেখিতে পাই, কাঠবিড়াল তাহাদিগের মধ্যে একটি। পল্লিগ্রামের ত কথাই নাই কলিকাতার মত মহানগরের স্থানে স্থানেও

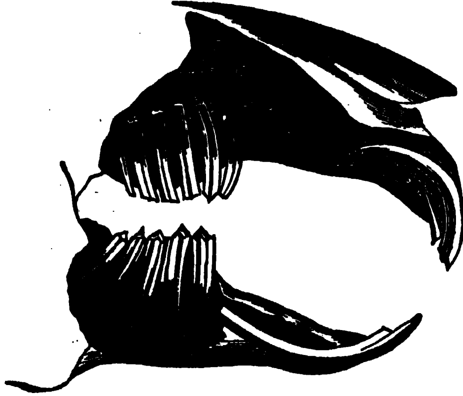




যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রকার কাঠ-বিড়াল আমরা সচরাচর এখানে দেখি তাহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার কাঠবিড়াল আছে। এক ভারতবর্ষেই প্রায় চৌদ্দ পনের বিভিন্ন প্রকার পাওয়া যায়, ইহা ভিন্ন পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রকার কাঠবিড়াল আছে। এখানে যে প্রতিকৃতি দেখিতেছ উহা ইউরোপ দেশীয় এক জাতীয় কাঠ-বিড়ালের, এখানকার কাঠবিড়ালের ন্যায় উহার পৃষ্ঠে ডোরা ডোরা দাগ নাই। ভারতবর্ষেও এমন অনেক প্রকার কাঠবিড়াল পাওয়া যায় যাহা-দিগের পৃষ্ঠে দাগ নাই এবং যাহারা এই সাধারণ কাঠবিড়াল অপেক্ষা অনেক বড়। মেদিনীপুর, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও মধ্য ভারতবর্ষের জঙ্গলে যে প্রকার কাঠবিড়াল পাওয়া যায় তাহাদিগকে দেখিলে হঠাৎ অন্য জন্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। ইহাদের একটি তিন ফুটেরও অধিক লম্বা হইয়া থাকে। কাঠবিড়াল সাধারণতঃ বনে জঙ্গলে বৃক্ষের শাখায় বাস করিয়া থাকে, আহারাদি অন্বে-ষণের নিমিত্ত মৃত্তিকাতেও অবতরণ করে, ইহাদের প্রকৃতি অত্যন্ত চঞ্চল, প্রায় এক স্থানে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকে না, আমরা সচরাচর যে প্রকার কাঠবিড়াল দেখিতে পাই তাহারা ত প্রায় লোকা-লয়ে বাস করে বলিলেই হয়, কিন্তু একবার তাহা-দের নিকটে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে দেখা যায় উহারা এতই সতর্ক যে, মানুষের পায়ের শব্দ পাইলেই দৌড়িয়া হয় কোন বৃক্ষে কিম্বা অন্য কোন উঁচু স্থানে আশ্রয় লয়।

আকরোট, বাদাম, নারিকেল এবং নানাপ্রকার ফল মূল আহার করিয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। আহারীয় বস্তুর অভাব হইলে গাছের ছাল পাতা ইত্যাদিও আহার করে। সখার পাঠক পাঠিকা! তোমরা কাঠবিড়ালকে কখনও আহার করিতে

দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক বারান্তরে সুবিধা হইলেই দেখিও। আহারীয় বস্তু কিছু পাইলেই ইহারা কেমন সম্মুখের দুই পায়ের থাবায় ধরিয়া পশ্চাতের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া বসিয়া কুট কুট করিয়া কামড়াইতে থাকে। জন্তুগুলি যদিও ছোট ছোট, কিন্তু ইহারা অতি কঠিন পদার্থ সকল অতি অল্প সময়ের মধ্যে দাঁতে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পারে। কি কারণে ইহারা কঠিন বস্তু সকল কাটিতে সমর্থ হয় তাহা ইহাদিগের দন্ত দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আহার করিবার সময় মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাদের সম্মুখের দাঁত দুইটী খুব বড় বড় এবং ধারাল, বাঁকা বাটালির মত।



এই চিত্রে ইহাদের দাঁতের গঠন এবং ভাব কতক পরিমাণে চিত্রিত হইয়াছে। কেবল যে কাঠবিড়ালের দাঁত এইরূপ তাহা নয়, আরও অনেক প্রকার জন্তুর সম্মুখের দাঁত এইরূপ বড় বড় এবং ধারাল। যে সকল জন্তুর সম্মুখের দাঁত এইরূপ বড় এবং তীক্ষ্ণ, প্রাণীবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতেরা ঐ সকল জন্তুকে তীক্ষ্ণদন্তি জন্তু বলিয়া থাকেন। ইন্দুর, খরা, শাজারু প্রভৃতিরা তীক্ষ্ণদন্তি জন্তু।

শীতপ্রধান দেশে কাঠবিড়াল প্রায় বৃক্ষের কোটরে থাকিয়াই শীতকাল কাটায় এবং পূর্ব্ব হইতেই এই কালের জন্য আহারীয় বস্তু সকল সঞ্চয় করিয়া রাখে। তোমরা যদি মনোযোগ করিয়া থাক তাহা হইলে বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে যে, ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহারা ঘাস, পাতা, তুলা প্রভৃতি কোমল পদার্থ কখন কখন মুখে করিয়া কোথায় লইয়া যায়। এই সকল পদার্থ দ্বারা ইহারা বৃক্ষের কোটরে কিম্বা দেওয়ালের ফাটালে বাসা নির্ম্মাণ করে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহাদের ছানা হয়, একবারে চারিটীর অধিক ছানা হইতে দেখা যায় না। এই জন্তু যদিও কাঠবিড়াল নামে পরিচিত, কিন্তু বিড়ালের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। বিড়াল জাতীয় জন্তুরা হিংস্রক, পশু পক্ষী বধ করিয়া আহার করে। কাঠবিড়াল নিরীহ, ফল মূল ইহাদের আহার। এইরূপ আহারের প্রভেদ বশতঃ ইহাদের শারীরিক গঠনও স্বতন্ত্ররূপ।

হিমালয় পর্ব্বতে, ভারত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের স্থানে স্থানে, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এক প্রকার উড্ডীয়মান কাঠবিড়াল পাওয়া যায়। ইহারা যে, পক্ষীর ন্যায় অনেক দূর উড়িয়া যাইতে পারে তাহা নয়, বড় গাছ হইতে ছোট গাছে নামিতে হইলে একেবারে পঞ্চাশ ষাট হাত লাফাইয়া নামিতে পারে।

মা।



আহা 'মা' শব্দটী কেমন মধুর! যতবার বল না কেন, আরও বলিতে ইচ্ছা হইবে; কিছুতেই যেন তৃপ্তিলাভ করা যায় না।

দারুণ রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে বলিবে 'মা গো মা'—এতেই যেন যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়। হঠাৎ পা পিছ্‌লাইয়া পড়িবার উপক্রম হইলে, বলিবে 'মা গো মা'—আহা! 'মা'ই যেন আসিয়া রক্ষা করিল। আবার কোথাও চলিতে চলিতে হঠাৎ কোন ভয় পাইলে বলিয়া বসিবে 'ওমা'। এইরূপ যখন যে কোন কষ্টে পড়া যায়, যখন যে কোন বিপদ উপস্থিত হয়, অমনি বিপদ ভঞ্জন 'মা' শব্দটী তোমার জিহ্বা হইতে বাহির হইবেই।

জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই ত মায়ের কষ্টের সৃষ্টি, আর তার শেষ হয় তাঁহার অন্ত হইলে। আজীবন কেবল কষ্টই ভোগ করেন। কোলে নিয়া আদর আহ্লাদ করিতেছেন, আর তুমি হয়ত হঠাৎ তাঁহার কোল ভাসাইয়া দিলে—তোমায় কোলে নিয়ে আহার করিতে বসিয়াছেন, অমনি তুমি হয়ত তাঁহার কাপড় নষ্ট করিলে—অন্যান্য সকলে ঘৃণায় অস্থির হইল, মায়ের মনে কিন্তু কোন ঘৃণা হইল না। রাত্রিতে তুমি অনবরতঃ বিছানা ভিজাইতে, আর মা সারারাত বিছানা বদলাইতেন। অবশেষে আর বদলাইবার বিছানা না পাইয়া তোমাকে শুষ্কস্থানে রাখিয়া তিনি নিজে ভিজা জায়গায় শয়ন করিতেন। অবশেষে সেস্থানটুকুও ভিজাইলে পর তিনি তোমাকে বুকে করিয়া রাখিতেন, তবুও যেন তোমার কষ্ট না হয়। ইহা ভিন্ন সারারাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া তুমি কি তাঁহাকে আর ঘুমাইতে দিতে? এই ত গেল নিদ্রার সময়; তারপর আহার করিতেই কি দিতে? মা খাইতে বসিলেন, তুমি কাঁদিয়া উঠিলে, আর কি মায়ের পেটে ভাত যায়, অমনি ভাত ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন।

তারপর তোমার ব্যারামের সময়; তখনকার মায়ের কষ্ট, কি আর বর্ণনা করা যায়! তোমার সামান্য একটু অসুখ হইলে, তোমার সামান্য একটু জ্বর হইলে, দুঃখিনীর আর আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকে না। পাগলিনীর ন্যায় আকুল হৃদয়ে কেবল দেবতার নিকট তোমার মঙ্গল কামনা করেন।

মায়ের স্নেহ জগতে অতুলনীয়, স্নেহ অনেকেই করেন বটে, কিন্তু মায়ের স্নেহের সহিত তাহা তুলনা হয় কি? ছেলেটি মূর্খ হইলেও মা কিন্তু মূর্খ দেখেন না! ছেলেটী কুৎসিৎ হইলেও মা কুৎসিৎ দেখেন না। ছেলেটি কাণা হইলেও মা কিন্তু আদর করিয়া তাহার নাম "পদ্মলোচন"ই রাখিয়া থাকেন! আবার পাঁচটি ছেলের মধ্যে একটী নিরেট বোকা হইলেও মা কিন্তু তাহাকেই অধিক ভালবাসেন।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। কথাটী বড়ই সুন্দর। নানাবিধ সুন্দর কারুকার্য্য সম্পন্ন, বহুল অট্টালিকা পরিশোভিত সুরম্য কলিকাতা নগরীও কিন্তু আমার সেই বন জঙ্গলময় কুটীর পরিপূরিত জন্মভূমির মত মনোরম নয়। যতই কেন মিষ্ট আম্র খাইনা, বাড়ীর সেই গাছের টক আম্রটী খাইয়াও কিন্তু অধিক তৃপ্ত হই। যত সুখে কেন থাকি না মাকে না দেখিলে কিন্তু মনটী কেমন করে। মায়ের সমান কেহ নয়। মাতৃস্নেহের সীমা নাই। তুমি শত সুখে থাক, মা নিজে তোমার যত্ন না করিলে কিছুতেই সুখী হন না। মা থাকিলেই খাবার সুখ। কিসে তুমি বেশী খাইতে পারিবে, কিসে তোমার তৃপ্তিলাভ হইবে; ইহা মায়ের যেমন চিন্তা, আর কাহারও তেমন নয়। মার কাছে সামান্য জিনিস যেমন তৃপ্তির সহিত খাইয়াছি, এখন ত তদপেক্ষা কত ভাল ভাল জিনিস খাইতেছি, কই সেরূপ তৃপ্তি ত হয় না। যার মা নাই, তার সংসারের সব সুখ উঠিয়াছে। এজন্যই কথায় বলে "কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন। এতদিনে জানিলাম মা বড় ধন॥"

অজিত কুমার।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেলা ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। এক বৃহৎ বাটীর দ্বারদেশে দুইটী বালক দাঁড়াইয়া ভিতরে প্রবেশের জন্য দ্বারবানের আরাধনা করিতেছে। দ্বারবান দ্বার ছাড়িতেছে না—এক একবার হিন্দুস্থানী ভাষায় বালকদিগকে গালাগালি দিয়া উঠিতেছে। পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন ইহারা আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত অজিত ও অরুণ।

অরুণ দ্বারবানের বিকট চেহারা ও তাহার আসুরিক গর্জ্জনে ভীত হইয়া কহিল "দাদা, চল ফিরিয়া যাই। আমরা এ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিব না।"

অজিত অবিচলিত স্বরে কহিল—"ভাই, অধীর হইও না। দ্বারবান ছোট লোক বোধ হয় পয়সার প্রলোভনে আমাদিগকে ভিতরে যাইতে দিতেছে না। আমি শুনিয়াছি বড় মানুষের দ্বারবানেরা অপরিচিত লোক আসিলেই তাহাদিগের নিকট পয়সা লইয়া ভিতরে যাইতে দেয়। আইস আমরা এই ছায়ায় বসিয়া থাকি; নিশ্চয়ই কোন সদাশয় ভদ্র লোক এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে আসিবেন। তাঁহার নিকট আমাদিগের দুরবস্থা জানাইলে তিনি আমাদিগকে ভিতরে লইয়া যাইতে পারেন।"

অজিত ও অরুণ প্রায় দুই ঘণ্টা সেই ছায়ায় বসিয়া রহিল। অরুণের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার ধারণা জন্মিয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই এবাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অজিতের কাছে ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। অজিতের মুখে একটুও হতাশার চিহ্ন নাই। কি এক দেব ভাবে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। অরুণ এক একবার সেই মুখের দিকে চাহিতেছে ও তাহার মনের বিষাদ ও নিরাশা একটু একটু করিয়া কমিতেছে। অজিতের মনে ফিরিয়া যাইবার চিন্তা আসিতে পারে না। পিতার রুগ্ন প্রতিমূর্ত্তি, অভাগিনী ভগিনীর সারল্যময়ী ছবি, ভগ্ন আবাস গৃহের দুর্দ্দশার চিত্র তাহার সম্মুখে রহিয়াছে—দারিদ্র্য ও উপবাস ভ্রূকুটী করিয়া তাহার সম্মুখে চাহিয়া রহিয়াছে। অজিত ফিরিবে না। বাড়ীতে যে প্রকারে হউক ঢুকিতে হইবে—যে প্রকারে হউক সাহেবের নিকট কাজ লইতেই হইবে, এই চিন্তা অজিতের মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার চাঞ্চল্য নাই। স্থির হইয়া পরিণাম অপেক্ষা করিতেছে

কিছুক্ষণ পরে একজন ভদ্রবেশধারী পুরুষ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অজিত দৌড়াইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং সংক্ষেপে আপনার অবস্থা বর্ণনা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার প্রার্থনা জানাইল। ভদ্রলোক অজিতের প্রার্থনা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল—এবং সত্বর চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু চলিয়া যাইবার সময় তিনি একবার অজিতের মুখের দিকে চাহিলেন। কি যেন একটী স্বর্গীয় তেজ তাহার অন্তরে যাইয়া আঘাত করিল। তিনি আপনার নির্ম্মম ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হইলেন; এবং ফিরিয়া কহিলেন—"আইস, আমি তোমাদিগকে ভিতরে লইয়া যাইতেছি।

অরুণ দৌড়াইয়া আসিল। এবং উভয় ভ্রাতাই ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহারা এত বড় বাড়ীতে জন্মিয়া অবধি প্রবেশ করে নাই। যখন অজিত ও অরুণ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ভদ্রলোকটীর পাছ পাছ উপরে উঠিতেছিল, তখন অরুণ ভয়ে থর থর করিয়া

কাঁপিতেছিল, ও এক একবার অজিতের হাত আঁটিয়া ধরিতেছিল। অজিতের মনেও মুহূর্ত্তের জন্য ভয়ের ছায়া পড়িয়াছিল, কিন্তু যখন রামরূপ ও আদরিণীর কথা তাহার মনে পড়িল, তখন সকল ভয় তাহার মন হইতে চলিয়া গেল এবং একটী অপার্থিব আগুন মনের ভিতর জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা সাহেব ও তাহার কর্ম্মচারিদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

ঐ দিবস একটী স্থানীয় জমীদার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। অজিত ও অরুণের পরিচালক ভদ্রলোক তাহার নিকট বালক দুইটীর বিবরণ বর্ণনা করিলেন। জমীদারবাবু তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি জন্য সাহেবের কাছারিতে আসিয়াছ ?"

অজিত। মহাশয়, কাল ঝড়ে আমাদের ঘর দোর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পিতা গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন; তাঁহার আর কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের আর কেবল একটী ছোট ভগিনী আছে—সে বধির ও বোবা। আমাদিগের পিতা খনিতে কাজ করিতেন, তাই সাহেবের নিকট অবস্থা জানাইতে আসিয়াছি।

হঠাৎ জমীদার মহাশয়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদিগের ভগিনী কি জন্মাবধিই বধির ও বোবা ?"

অজিত। আজ্ঞা, হাঁ ঐ প্রকার অবস্থায়ই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

পূর্ব্ব পরিচিত ভদ্রলোকটী অজিতের কাণে কাণে বলিয়া দিলেন ইঁহার নিকট আর তোমার ভগিনীর উল্লেখ করিও না।

সাহেব এতক্ষণ চুরুট টানিতেছিলেন। এক্ষণে খনির উল্লেখ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"টোমার পিটার নাম কি আসে ?"

অজিত। আজ্ঞা, রামরূপ সর্দ্দার।

সাহেব। রামরূপ সড্ডারের কি বিপড্ ঘটিয়াসে ?

অজিত। আজ্ঞা, ঝড়ে ঘর পড়িয়া তাহার হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার আর কাজ করিবার যো নাই। আমরা দুইজন তাহার পুত্র। আমাদিগের আর একটী বোন্ আছে, সে বোবা ও বধির। আমাদিগের ভরণপোষণের অন্য উপায় নাই। বাবা যাহা পাইতেন তাহাতে দিন যাইত। এক্ষণে আমরা দুই ভাই তাহার স্থানে কাজ করিতে চাই। তিনি যে বেতন পাইতেন তাহাতেই আমাদিগের সংকুলান হইতে পারে।

সাহেব। টোমরা সাঢ়ু ইচ্ছা করিয়াসে। আমি টোমাডিগকে টোমাদিগের পিটার পড্ প্রডান করিবে। কাল টোমরা খনিটে কাজ করিটে যাইবে।

দুই ভাই সেলাম করিয়া সাহেবের নিকট হইতে বিদায় হইল। এবং কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া ভারি উৎসাহে হাসিতে হাসিতে বাড়ী যাইতে লাগিল। পথে অরুণ অজিতকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, দাদা ঐ বড় লোকটী আদরিণীর কথা শুনিয়া অমন বিমর্ষ হইয়া ওপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল কেন ?" অজিত বলিল—"ভাই, আমিও তাই ভাবিতেছি; কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

এমন সময় কে আসিয়া অজিতের স্কন্ধের উপর হাত রাখিল। অজিত ফিরিয়া দেখিল সেই বড় লোকটী।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদিগের ভগিনীটী সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকে কি খেলিয়া বেড়ায় ? সে কোন কাজ করিতে শিখিয়াছে কি ? কি প্রকারে শিখিল ? তাহার বয়স কত ?"

অজিত। আজ্ঞা, আমাদের সে বোনটীর মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া আছে। সে একবার দেখা-

ইয়া দিলে সকল কাজই করিতে পারে। তাহার বয়স এখন ৯ বৎসর হইয়াছে।

জমীদার। ঝড়ে তোমাদের কি কি ক্ষতি হইয়াছে?

অজিত। আজ্ঞা, আমাদের দুইখানি ঘর ছিল, দুইখানিই পড়িয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া জিনিস-পত্রও কতক কতক নষ্ট হইয়াছে। জমীদার মহাশয় ৫০৲ টাকার একটী মোড়ক বাহির করিয়া অজিতের হাতে প্রদান করিলেন। বলিলেন—"ইহা দ্বারা তোমাদিগের যাহা যাহা প্রয়োজন হয় করিয়া লইও। কাল একবার তোমাদিগের ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া আমাদিগের বাড়ীতে যাইও। আমি বৈকালে তোমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিব। আমার নাম রাজেন্দ্র নারায়ণ মিশ্র। নাম বলিলে সকলেই বাড়ী দেখাইয়া দিবে।" এই বলিয়া তিনি দ্রুত পাদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন।

অজিত জমীদার রাজেন্দ্র নারায়ণের নাম ও সুখ্যাতি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার এই সৌজন্য ও দয়া দর্শনে মোহিত হইল। তাহারা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, দৌড়াইয়া রামরূপের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার হস্তে টাকার মোড়ক প্রদান করিল। এবং সমস্ত দিন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল বর্ণন করিল।

রামরূপ বাম হাতখানি দ্বারা অজিতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"ঈশ্বর, তুমিই ধন্য, তুমিই দরিদ্রদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কর ও তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান কর। তোমারই কৃপায় অজিত আমাদিগের এ দুর্দ্দশা মোচনে সক্ষম হইয়াছে।" রামরূপ আর কথা বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল এবং দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল।

চরিত্রের প্রভাব।

লণ্ডন নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে একদা কোন ভদ্রলোক বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি বক্তৃতাকালে বলিতেছিলেন,—"সকলেরই চরিত্রের প্রভাব আছে, কখন কেহ মনে করিবেন না যে তাঁহার কোন প্রভাব নাই, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আছে।"

এক নিরক্ষর অসভ্য লোক গৃহের অপর পার্শ্বে একটি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান ছিল।

বক্তা মহাশয় পিতা ও কন্যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"প্রত্যেকেরই চরিত্রের বিশেষ বিশেষ প্রভাব আছে, ঐ যে শিশুটি দেখিতেছ, উহারও চরিত্রের প্রভাব আছে।"

এই কথা শুনিয়া ঐ লোকটি বলিয়া উঠিল,—"মহাশয়, এ অতি সত্য কথা!"

অবশ্য শ্রোতৃবর্গের অনেকেই তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু ঐ লোকটি আর কিছু না বলায় বক্তা মহাশয় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

বক্তৃতা অন্তে ঐ লোকটি ভদ্রলোকটির অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বলিল,—মহাশয়, আমি ঘোর মদ্যপায়ী ছিলাম। শুণ্ডিকালয়ে একাকী যাইতে ভাল লাগিত না বলিয়া এই সন্তানটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। একদা রাত্রিকালে মদের দোকানে একটা বিকট শব্দ শুনিয়া কন্যা আমাকে বলিল,—'বাবা, ওখানে যেও না, উহার ভিতরে যেও না, বাবা।' আমি তাহাকে ধমকাইয়া চুপ করিতে বলিলাম। বালিকা আবার বলিল,—"বাবা, ভিতরে যেও না, তাহাতে পুনরায় তাহাকে ধমকাইয়া চুপ করিতে বলাতে তাহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, কিন্তু নীরব অশ্রুবিন্দু আমার গণ্ডস্থলে পতিত হইল। আমার হৃদয় বিগলিত হইল। আর একপদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা রহিল না, বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। তদবধি আমি আর মদের দোকানে যাই নাই। সকলের চরিত্রের যে প্রভাব আছে একথা অতি সত্য। এই ক্ষুদ্র বালিকা তাহার দৃষ্টান্ত।"



আগষ্ট, ১৮৯০।



বিবিধ।

আশ্চর্য্য সন্তরণ।—বিশপ বাক্‌ওয়ার্থ নামক জনৈক পরিব্রাজক হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একদিন তিনি একটী পার্ব্বত্য নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। নদীটী হাঁটিয়াই পার হওয়া যাইত। কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হওয়ায়, নদীর জল ও স্রোত বড় বাড়িয়া গিয়াছে। বৃষ্টি না থামিলে এবং জল না কমিলে, আর পার হইবার উপায় নাই। এই সময় একজন পাহাড়ী লোকও ঐ নদী পার হইবার জন্য উপস্থিত হইল। ক্রমে তিন দিন কাটিয়া গেল। বৃষ্টি থামিল না,—জলও কমিল না। পাহাড়ীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আপনার কটিদেশে একখণ্ড বৃহৎ পাথর বাঁধিল, এবং প্রবল স্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। পাথরের ভারে স্রোত তাহাকে সহজে ভাসাইয়া নিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে নদী পার হইয়া গেল।

* *
*

আশ্চর্য্য মোহ।—কয়েক জাতীয় সাপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী বা যে-কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর দিকে চাহিলেই, ঐ সকল প্রাণী মোহ প্রাপ্ত হয়, আর নড়িতে চড়িতে পারে না। ইহা তোমরা শুনিয়া থাকিবে। অত্যন্ত বিপদ বা ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে, মানুষেরও উক্ত প্রকার মোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু একটী গর্দ্দভের মোহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য। এই গর্দ্দভটী কয়েক দিন না খাইয়া বড় ক্ষুধিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহার দুই দিকে তাহা হইতে সমদূরে দুইটী উৎকৃষ্ট ঘাসের আঁটি রাখা হইল। উভয় দিকেই এইরূপ প্রলোভনের সামগ্রী দেখিয়া গর্দ্দভের এমন মোহ উপস্থিত হইল যে, সে কোন্ দিকে আগে যাইবে, তাহা আর স্থির করিতে পারিল না; জড়সড় হইয়া ঐ স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

* *
*

নিশ্বাসের উত্তাপ।—তোমরা অনেকেই তাপমান যন্ত্র দেখিয়াছ। ডাক্তারেরা জ্বর হইলে বগলের মধ্যে যে যন্ত্রটী দিয়া জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষা করেন, তাহাই তাপমান যন্ত্র। এই যন্ত্রটী কোন বস্তুর সহিত লাগাইলে, সে বস্তুর উত্তাপে যন্ত্রের পারদ যে পরিমাণে উঠিয়া বা নামিয়া পড়ে, সেই পরিমাণে সেই বস্তুর উষ্ণতা নিরূপিত হয়। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা ৯৮° ডিগ্রি। কিন্তু নিশ্বাসের

উত্তাপ ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। সময় বিশেষে উক্ত উত্তাপ ১০২° ডিগ্রি হইতে ১০৭° হইতে দেখা যায়। প্রশ্বাসের সহিত আমাদিগের শরীরের উত্তাপ সর্ব্বদাই বাহির হইয়া যাইতেছে; তজ্জন্য শরীরের উত্তাপ অপেক্ষা প্রশ্বাসের উত্তাপের আধিক্য দেখা যায়।

* *
*

বালিকার কৃতজ্ঞতা।—আমাদিগের ভারতেশ্বরী দরিদ্র বালক বালিকাদিগের বড়ই যত্ন লইয়া থাকেন। একদিন তিনি লণ্ডন-হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিবার সময় দেখিলেন, একটী বালিকা পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বড় কষ্ট পাইতেছে। তিনি অত্যন্ত স্নেহ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"অস্থির, হইও না। তোমার অসুখ শীঘ্র সারিয়া যাইবে।"

বালিকার অসুখ শীঘ্রই সারিয়া গেল। সে মনে করিল, মহারাণীর আশীর্ব্বাদেই তাহার অসুখ সারিয়াছে। সুতরাং মহারাণীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। সে আপনার পয়সা দিয়া একখানি টিকিট কিনিয়া আনিল, এবং একখানি ধন্যবাদ পত্র লিখিয়া তাহার খামের উপর টিকিটখানি আঁটিয়া দিল। মহারাণীকে কি শিরোনামা লিখিতে হয়, তাহা সে জানিত না। উপরে লিখিয়া দিল—" Lady Victoria" শ্রীযুক্তা ভিক্টোরিয়া।

ভারতেশ্বরীর নামে যে সকল চিঠী পত্র যায়, তাহা তাঁহার সেক্রেটরী খুলিয়া থাকেন। তিনি এই পত্রখানির সরলতা দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইলেন যে, উহা ভারতেশ্বরীর হাতে প্রদান করিলেন। ভারতেশ্বরী, বালিকার কৃতজ্ঞতা ও সরলতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে ৩ পাউণ্ড পাঠাইয়া দিলেন।

* *
*

আত্মবিস্মৃতি।—বিলাতের নিউবারী নগরে লং নামে একজন ইংরেজ বাস করেন। তাঁহার বাস গৃহের পাদদেশ বিধৌত করিয়া এক নদী প্রবাহিত। অল্পদিন হইল, একদিন তিনি দোতালা ঘরের জানালার নিকট বসিয়া নদীপ্রবাহ সন্দর্শন করিতেছিলেন। তখন হঠাৎ একটী বালক নদীতে পড়িয়া যায়। বালককে ডুবিতে দেখিয়া তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া, দোতালা হইতে নদীর জলে ঝাঁপিয়া পড়িলেন,—বালকের প্রাণ বাঁচাইলেন। পরের জন্য যাহারা এরূপ আত্মবিস্মৃত হইতে পারে, তাহারাই ত মানুষ।

* *
*

অন্ধের অসাধারণ শক্তি।—কলিকাতাতে পণ্ডিত গট্টোমল নামে এক জন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী লোক আসিয়াছেন। সেদিন শোভাবাজারে স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার পরীক্ষা হইয়াছিল। আমাদের কোন সম্ভ্রান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। নবরচিত শ্লোকের একটী পাদ বলিলে, তিনি অপর পাদ পূরণ করিয়া দেন;—আবার সেই পাদ পূরণ করিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে একজনে ঘণ্টা বাজায় এবং গ্রীক্, লাটিন, হিব্রু, পার্সি প্রভৃতি ১৪টী ভাষায় ১৪টী কথা বলে; শ্লোকার্দ্ধটী পূরণান্তর, এক একবারে কতবার ঘণ্টা ধ্বনি হইয়াছিল, এবং কোন্ ভাষার কোন্ শব্দটী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা তিনি ক্রম-পরম্পরা বলিয়া দেন। অন্ধত দূরের কথা, কোন চক্ষুষ্মানেরও এরূপ অসাধারণ ক্ষমতার কথা কখন শুনা যায় নাই।

অজিত কুমার।

পঞ্চম অধ্যায়।

(১১২ পৃষ্ঠার পর।)



এখনও সূর্য্য উদিত হয় নাই। দুই একটী পাখী ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনও খনির ঘড়িতে ৬ টা বাজে নাই। খনকেরা ঘুমাইতেছে। কিন্তু অজিত আজ অনেকক্ষণ হইল জাগরিত হইয়াছে। একটু ফরসা হইবামাত্রই সে খনির সর্দ্দারের বাটীতে উপস্থিত হইল। তাহাকে ঘুম হইতে তুলিয়া বলিল,—"সাহেব আমাদিগের দুই ভাইকে পিতার স্থানে কাজ করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। আজই কাজ আরম্ভ করিবার কথা ছিল। কিন্তু ঘর দুই খানিই পড়িয়া গিয়াছে, থাকিবার যায়গা নাই। জমিদার গজেন্দ্র নারায়ণ বাবু ঘর সারিবার জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তাই আপনার নিকট আসিয়াছি, যদি তিন দিনের ছুটি দেন, তবে বাড়ী ঘর এক প্রকার সারিয়া লইতে পারি।"

সর্দ্দার রামরূপের একজন বন্ধু। অজিতের কথা শুনিয়া বলিল,—"তোমাদিগের নাম রেজেষ্টারিভুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, তোমার প্রার্থনা মত তিন দিনের ছুটি দিলাম। ইহার মধ্যে ঘর দোর সারিয়া লও।"

অজিত সর্দ্দারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কুলীর অনুসন্ধানে গেল, এবং অবিলম্বেই ১৬ জন কুলী সংগ্রহ করিয়া বাড়ী সারিতে প্রবৃত্ত হইল। সমস্ত দিন পরিশ্রমে রান্না ঘরখানি সারা হইল। অজিত কুলীদিগের সঙ্গে একবার মাত্র সামান্য রকমের আহার করিয়াছিল। সারাদিনের পরিশ্রমে তাহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে গণেশের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া, সে কিছু আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। এমন সময়ে গজেন্দ্র নারায়ণ বাবুর বাড়ী যাওয়ার কথা মনে পড়িল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। শরীর বড়ই অবসন্ন। তখন অতদূর হাঁটিয়া যাওয়া সহজ-সাধ্য নয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, অজিত যাহা বলিয়া আসিয়াছে, তাহা করিবেই।

অজিত তাড়াতাড়ি আদরিণীকে ডাকিয়া আনিল এবং স্বহস্তে তাহার গা পরিষ্কার করিয়া চুল বাঁধিয়া দিল ও একখানি পরিষ্কার কাপড় পরাইল। তৎপর তাহাকে সঙ্গে লইয়া গজেন্দ্র নারায়ণ বাবুর বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। আদরিণী ভ্রাতার এত আদরের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইল, এবং কৌতুহলাক্রান্ত মনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

অল্প সময় মধ্যে তাহারা গজেন্দ্র নারায়ণ বাবুর সুবৃহৎ ত্রিতল বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সাহেবের বাড়ী হইতে আসিয়া অজিতের সাহস বাড়িয়াছে। এখন আর এত বড় বাড়ী দেখিয়া তাহার ভয় হয় না। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময় পাশের পুষ্পোদ্যান হইতে কে ডাকিল। অজিত ফিরিয়া দেখে, স্বয়ং গজেন্দ্র নারায়ণ বাবু। তখন তাহারা সেই পুষ্প বাটীকায় প্রবেশ করিল।

আদরিণী এমন সুন্দর ফুলের বাগান কখনও দেখে নাই। চারি দিকে নানা দেশী বিদেশী ফুল—নানা সুগন্ধি লতা—নানা প্রকার রঞ্জিত পত্রের গাছ। সুরঞ্জিত টবের উপর পরিষ্কার শ্বেত পাথরের কুচি, তাহার উপর কেমন সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। রাস্তাগুলি কেমন সমতল ও লাল পাথরে বাঁধান।

স্থানে স্থানে সবুজ ঘাস—ছাঁটিয়া ফেলায় ঠিক সবুজ গালিচার মত দেখা যাইতেছে। বাগানের এক দিকে একটী ক্ষুদ্র রকমের পাহাড় সাজান রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ময়ূর, সারস ও নানা রকমের পক্ষী বেড়াইতেছে। আদরিণী যে দিকে চাহিতে লাগিল, সেই দিকেই নূতন ও আশ্চর্য্য রকমের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার মুখে যেন কেমন একটী বিস্ময় ও আনন্দ মিশ্রিত ভাব শোভা পাইতে লাগিল।

গজেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"এই কি তোমার সেই ভগ্নি! আহা বেশ মেয়েটী; দেখিলেই কেমন আহ্লাদের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। তোমার ভগ্নীকে কি বলিয়া ডাক?"

অজিত—আজ্ঞে, আমার ভগ্নীর নাম আদরিণী।

গজেন্দ্র বাবু—দেখ অজিত, আমার একটী মাত্র কন্যা আছে। তাহার নাম মৃণাল কুমারী। সে তোমার ভগ্নীর সমবয়স্কা এবং সেও মূক ও বধিরা। বিধাতা আমার এই অতুল সম্পত্তি উপভোগের নিমিত্ত আমাকে সেই এক মাত্র কন্যাই প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমার কেমন অদৃষ্ট, আমার মৃণাল সর্ব্বদাই বিষণ্ণ মুখে বসিয়া থাকে, আমি এক-দিনও তাহার মুখে হাসি দেখিলাম না। সে আমা-দের কোন সঙ্কেতও বুঝিতে পারে না।

এই বলিতে বলিতে গজেন্দ্র বাবুর চক্ষু হইতে দুই একটী অশ্রুবিন্দু মাটিতে গড়াইয়া পড়িল, এবং তাহার মুখ বিষণ্ণ হইয়া গেল। এখন অজিত বুঝিতে পারিল, কেন তিনি খনির সাহেবের বাড়ীতে তাহার ভগিনীর কথায় অত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। গজেন্দ্র বাবু আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, আমি তোমার ভগ্নীকে এইজন্য আনিতে বলিয়া-ছিলাম যে; যদি সমান অবস্থাযুক্ত বলিয়া ইহার সহিত তাহার একটু ভাব হয়। আমার মৃণাল কাহাকেও নিকটে যাইতে দেয় না। আমি কত শিক্ষক রাখিলাম, কত কি করিলাম, কিছুতেই কোন ফল হইল না। আইস, তোমাদিগকে মৃণা-লের নিকট লইয়া যাই।"

গজেন্দ্র বাবু অগ্রে চলিলেন, অজিত ও আদ-রিণী নিঃশব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। বাগান ছাড়িয়া ভিতরের কয়েকটী প্রকোষ্ঠ পার হইয়া তাঁহারা একটী অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। গৃহের সবগুলি দরজা ও জানালা বন্ধ। গজেন্দ্র বাবু একটী জানালা খুলিয়া দিলেন। তখন অজিত ও আদরিণী দেখিতে পাইল, স্বর্গের অপ্সরার ন্যায় একটী পরমা সুন্দরী বালিকা গৃহের এক কোণে বসিয়া আছে। তাহার মুখখানি বিষণ্ণ ও গম্ভীর,—চক্ষু জ্যোতি শূন্য ও স্থির। পিতা কন্যার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া চুম্বন করিলেন। কন্যা একটী শুষ্ক প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল এবং এক দৃষ্টে মৃত্তিকা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আদ-রিণী কিছুক্ষণ মৃণাল কুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে অগ্রসর হইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। মৃণাল বিরক্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়া-ইল। আদরিণী আবার তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল,—তাহাকে চুম্বন করিল এবং কাণে ও মুখে হাত দিয়া সঙ্কেতে বুঝাইল, সেও তাহার মত বাক্ ও শ্রবণ শক্তি শূন্যা। তখন মৃণালের কি যেন ভাবা-ন্তর ঘটিল—তাহার মুখ একটু প্রফুল্ল হইল এবং আপনার সুকুমার হাত দুইখানি আদরিণীর দুই স্কন্ধের উপর স্থাপন করিল।

গজেন্দ্র বাবু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহি-লেন,—"অজিত, তোমার ভগিনী যথার্থই আহ্লা-দিনী। আহা! এই প্রথম দিন আমি বাছার মুখ-খানি প্রফুল্ল দেখিলাম।" দুই ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু টস্ টস্ করিয়া গজেন্দ্র বাবুর চক্ষু হইতে গড়াইয়া

পড়িল। আদরিণী ঘরের সকলগুলি জানালা খুলিয়া দিল। মুক্ত বাতায়ন পথে আলোক আসিয়া বালিকাদ্বয়ের উজ্জ্বল মুখ আরও উজ্জ্বল করিল। বায়ু তাহাদিগের অলকগুচ্ছ কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া খেলা করিতে লাগিল। মৃণাল তাহার মুক্তার বাক্স বাহির করিয়া আদরিণীর গলায় একছড়া মুক্তার মালা পরাইয়া দিল এবং আর এক ছড়া তাহার খোঁপার চারিদিকে জড়াইয়া দিল। তৎপর কত মূল্যবান পুতুল ও কত কি সাধের জিনিস আনিয়া আদরিণীকে দেখাইতে লাগিল। দরিদ্রা বালিকা আদরিণী এক একটী দেখিতে লাগিল আর অবাক্ হইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল। অজিত গজেন্দ্র বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভগিনীর সঙ্গে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিল। আসিবার সময় মৃণাল কুমারী সঙ্কেত করিয়া আদরিণীকে আবার প্রাতঃকালে আসিতে বলিয়া দিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অজিত ও অরুণ ঘর দোর সারিবার পর খনিতে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অজিত প্রাতঃকালে কাজে যায় এবং যতক্ষণ কাজ করিবার সময় ততক্ষণ প্রফুল্ল মনে এবং সমুদায় ইচ্ছা ও শক্তির সহিত কাজ করে। কিন্তু অরুণের দিন সে প্রকারে যায় না। অরুণ এতদিন আলোকে ও খোলা বাতাসে খেলা করিয়াছে, এখন অবরুদ্ধ ও অন্ধকারময় স্থানে কাজ করা তাহার ভাল লাগে না। তা ছাড়া, সে ঠিক করিয়া হাতুড়ি ফেলিতে পারে না। অনেক সময় হাতুড়ি বাঁ হাতের আঙ্গুলের উপর পড়ে। আঙ্গুল অবসন্ন হইয়া যায় ও সময়ে সময়ে রক্ত বাহির হইতে থাকে। তখন অরুণের চোখ হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে থাকে। অরুণ মনে মনে সংকল্প করে, সে কাল আর কাজে আসিবে না। কিন্তু সে যখন প্রাতঃকালে ভ্রাতার সাদর আহ্বান শুনিতে পায়—তাহার উৎসাহপূর্ণ প্রফুল্ল মুখখানি দেখিতে পায়, তখন সে কথা তাহার মন হইতে চলিয়া যায় এবং আবার খনির দিকে অগ্রসর হয়। অজিত যে ভ্রাতার অবস্থা বুঝিতে পারে না, তাহা নয়। কিন্তু বুঝিয়া উপায় নাই। তা ছাড়া, অরুণ কার্য্যভীরু বা অলস হয়, ইহাও অজিতের ইচ্ছা নয়।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। মাসান্তে যখন দুই ভাই বেতনের টাকা কটী লইয়া রামরূপের হস্তে প্রদান করিত, তখন রামরূপের দুই গণ্ড বহিয়া দুইটী অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত এবং তাহার চক্ষু দুইটী কিয়ৎ কালের জন্য উর্দ্ধ দিকে বিস্ফারিত হইয়া থাকিত।

একদিন অজিত খনিতে কাজ করিতে করিতে এক অন্ধকারময় গলির মধ্যে প্রবেশ করিল—এবং ক্রমে ক্রমে শেষ সীমায় যাইয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ অজিতের কুঠারে লাগিয়া একখান বৃহৎ কয়লা সরিয়া পড়িল, এবং তাহার অন্তরালে এক বৃহৎ ছিদ্রের মত দেখা যাইতে লাগিল। অজিত বহু চেষ্টায় আর একখানি কয়লার পিণ্ড সরাইয়া ফেলিল; তখন ভিতরে যাইবার উপযুক্ত একটী পথ হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকে অজিত দেখিতে পাইল, চারি দিকে রৌপ্যপিণ্ড সকল আলোকে ঝক্ মক্ করিতেছে। বালকের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। "আমি রূপার খনি আবিস্কার করিয়াছি, আমি রূপার খনি আবিস্কার করিয়াছি" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। নিকটে চারিজন লোক কার্য্য করিতেছিল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" "রূপার খনি আবিস্কার করিয়াছি"

বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বালক ইন্‌স্পেক্টরের গৃহাভিমুখে ছুটিয়া গেল। তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু আপনার কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন; তিনি বালকের চীৎকার শুনিয়া কহিলেন,—"কি হইয়াছে তোমার?" "রূপার খনি, আমি রূপার খনি আবিষ্কার করিয়াছি" বলিয়া অজিত অত্যন্ত অস্থির ভাবে উত্তর প্রদান করিল।

ইন্‌স্পেক্টর—তুমি পাগল হইয়াছ। পাথুরিয়া কয়লার খনির মধ্যে, মধ্যে মধ্যে রূপার খনি থাকে বটে; কিন্তু তাহা কি যেখানে সেখানে যে সে বাহির করিতে পারে?

অজিত—আজ্ঞে, আমি নিশ্চয়ই রূপার খনি বাহির করিয়াছি। এই দেখুন, সেই খনি হইতে আপনাকে দেখাইবার জন্য এক খণ্ড রৌপ্য আনিয়াছি।

এই বলিয়া অজিত ইন্‌স্পেক্টর বাবুর হাতে এক খণ্ড আকরিক প্রদান করিল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"হাঁ ইহা বিশুদ্ধ রৌপ্যপিণ্ড বটে। তুমি ইহা কোথায় পাইলে? রৌপ্যের খনি বাহির করিতে পারিলে কি পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহা তুমি জান? পুরস্কার পাইবার লোভে কোনরূপ প্রবঞ্চনা করিতেছ না তো?"

অজিত—আজ্ঞে না। আমি খনির মধ্যে বেড়াইতেছিলাম, আমার কুঠার লাগিয়া কয়লার একটী বৃহৎ পিণ্ড পড়িয়া গেল এবং আমি একটী বৃহৎ গহ্বরের মুখ দেখিতে পাইলাম। পরে মুখটী আরো প্রশস্ত করিয়া ভিতরে যাইয়া দেখি, এই প্রকার কত রৌপ্যখণ্ড চারি দিকে ঝক্ মক্ করিতেছে। আমি মিথ্যা কথা কহিব কেন? আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি যদি রূপার খনি বাহির করিতে না পারি, আমাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইন্‌স্পেক্টর—তুমি একটু অপেক্ষা কর! আমার হাতের কাজ সারিয়া লই। তারপর তোমার রৌপ্যের খনি দেখিয়া আসিব।

এই বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবু আরব্ধ কর্ম্ম তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অজিতও দাঁড়াইয়া রহিল না। চারি দিকে যে সকল আকরিক দ্রব্যজাত ছিল, ক্রমে ক্রমে সেগুলি তুলিয়া উপযুক্ত স্থানে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর অজিতের এইরূপ কার্য্যদক্ষতা, শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিয়া মনে মনে তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টার পরে ইন্‌স্পেক্টর বাবুর কার্য্য শেষ হইল। তখন অজিত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া খনির মধ্যে যাইতে লাগিল। কিন্তু অজিতের একটী ভুল হইয়াছিল। অজিত খনির কোন্ খানে গহ্বর পাইয়াছিল, তাহা চিহ্নিত করিয়া আসে নাই। খনির সবগুলি গলিই এক প্রকার। সে ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে একবার এ গলিতে, একবার সে গলিতে লইয়া যাইতে লাগিল। বাবু বড় বিরক্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে সকল গলিই তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। কোন গলিতেই গহ্বর পাওয়া গেল না। বাবু অজিতকে নানা রূপ ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। পরে বালকের কথায় বিশ্বাস করাই তাঁহার অন্যায় হইয়াছে বলিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। লজ্জা ও অপমানে অজিতের মুখ লাল হইয়া গেল। অজিত স্তম্ভিতের ন্যায় ঐ খানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ।



বড় খুকী।

(শ্বশুরালয়ে বধূ।)

(১০৩ পৃষ্ঠার পর।)

সময় কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না; কাহারও সুবিধা অসুবিধাও বোঝে না। কালস্রোত আপনার মনে বহিয়া যাইতেছে। কাহার সাধ্য তাহার গতিরোধ করে? বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই ইহার গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপন আপন কাজ সারিয়া লইয়া থাকেন। আমাদের বড়খুকী সময় অসময়ের ধার ধারিত না। সে মনে করিত, চিরকালই তাহার শৈশবের আমোদে আহ্লাদে কাটিয়া যাইবে; আয়াস কিম্বা পরিশ্রম কি, তাহা তাহার কখনও জানিতে হইবে না। কিন্তু এ বিশ্বাস যে তাহার ভ্রান্তিমূলক, তাহা বড়খুকী শেষে হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে, খুকীমণি বয়সের হইয়া উঠিলেন। মতি গতির কিন্তু তাঁহার বড় একটা শীঘ্র কিছু পরিবর্ত্তন হইল না। পড়াশুনার প্রতিও মন গেল না,—কোন জিনিসপত্রেও মায়া মমতা হইল না,—অথবা কাহারও সহিত অমায়িক ব্যবহার করিতেও শিখিল না। কাজের মধ্যে তাহার ছিল,—"খাওয়া আর শোয়া"; সুতরাং তাহাতেই সে সময় কাটাইয়া, দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠিল।

কন্যা যে লেখা পড়া কিম্বা অন্য কোন গুণগ্রামে প্রশংসা লাভ করিতে পারিবে না, তাহা হরদয়াল বাবুর স্ত্রী বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য সে সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া, এখন কন্যাকে যাহাতে গৃহকর্ম্মে ভালরূপ শিক্ষা দিতে পারেন, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করিলে কি হইবে? যাহার জন্য চেষ্টা, সে কাছে ঘেসিত না। যাহার শিখিবার ইচ্ছা নাই, তাহাকে ধরিয়া বান্ধিয়া কোন কাজ শিখান যায় না। দেখিয়া শুনিয়া গৃহকর্ম্মাদি শিখিবার জন্য বড় খুকীকে সর্ব্বদাই তাহার মাতা ডাকিতেন;—কোন্ জিনিস কিরূপে রান্ধিতে হয়, কিরূপে বাটনা বাটে, কোটনা কোটে, কোন্ জিনিস কি ভাবে রাখিলে ভাল থাকে;—ইত্যাদি, সমস্ত বিষয় তাহাকে শিখাইবার জন্য সর্ব্বদাই যত্ন করিতেন। কিন্তু বড়খুকী সে সমস্ত কাজে ঘেসিত না। বরং এই সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয় তাহাকে শিখাইবার জন্য তাহার মাতার অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও যত্ন, সে অত্যাচার বলিয়া মনে করিত। উহাতে সে বিরক্ত হইত, মুখ ফুলাইত, এবং মাতা যদি বিশেষ জেদ করিতেন, তাহা হইলে নাকিস্বরে কাঁদিতে বসিত; সুতরাং হরদয়াল বাবুর স্ত্রীকে শেষে হার মানিয়া সব চেষ্টায় নিরস্ত হইতে হইল।

হরদয়াল বাবু অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। সহজে তাঁহার কাহারও প্রতি রাগ হইত না, কিম্বা কোন বিষয়ে বিরক্তি জন্মিত না। কন্যা বড় হইয়া উঠিয়াছে, অথচ লেখা পড়া, আদব কায়দা, কিম্বা গৃহকর্ম্মাদি কিছুই শিখিল না দেখিয়া, মনে মনে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু প্রতিকারের উপায় বড় একটা কিছু অবলম্বন করিলেন না। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে বড়খুকী যাহাদের সঙ্গে পড়িত, তাহারা এখন তাহাকে ছাড়াইয়া ২।৩ শ্রেণী উপরে উঠিয়া গিয়াছে। শুধু তাহা নহে; তাহারা শিল্পকার্য্যাদি আরও কত কি শিখিয়াছে;—তাহারা গৃহকর্ম্ম জানে, ছোট ভাই ভগ্নীদের যত্ন নিতে জানে, সংসারে মা বাপের কত কাজে সহায়তা করে।

বড়খুকী এ সমস্ত স্বচক্ষে দেখিত; কিন্তু তজ্জন্য তাহার নিজের অকর্ম্মণ্য জীবনের উপর কোনরূপ ধিক্কার জন্মিত না। তাহার 'খাওয়া আর শোয়া' পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিয়া আসিতে লাগিল। আমোদ আহ্লাদ যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইত, স্নেহশীল পিতাকে ধরিলেই তাহা মিলিত। সার্কাস, থিয়েটার, ঘোড়দৌড়, যে দিন যাহা তাহার দেখিতে ইচ্ছা হইত, প্রায়ই তাহা দেখিতে পাইত। কোন দিন যদি কোন আমোদ প্রমোদ উপভোগে বাধা পাইত, তাহা হইলে পড়াশুনা করার যে একটু অভ্যাস ছিল, রাগে রাগে তাহাও করিত না।

এ দিকে বড়খুকী প্রায় ১২ বৎসরের হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু ঘরের মেয়ে। হরদয়াল বাবু যত দিন পারিয়াছেন, কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিয়াছেন; কিন্তু এখন সমাজ তাঁহাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। অত বড় মেয়েকে অবিবাহিতা রাখিতে দিতে, সামাজিক লোকেরা এখন আর প্রস্তুত নহে। হরদয়াল বাবুর মাতাও বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। সুতরাং অগত্যা হরদয়াল বাবুকে এখন কন্যার বর খুঁজিতে বাধ্য হইতে হইল। বর সহজে মিলিল না। নানা স্থান হইতে মেয়ে দেখিতে লোক আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু মেয়ে কাহারও ভালরূপ পসন্দ হইল না। বড়খুকী পূর্ব্বে দেখিতে যেরূপ সুন্দরী ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—জীবনে তাহার কাজ ছিল 'খাওয়া আর শোয়া'—কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রমের কাজ কিছুই করিত না; এবং চলা ফেরার জন্য অঙ্গ চালনাও এক দফা তাহার হইতই না; সুতরাং দিন দিন ফুলিয়া ফুলিয়া সে একটী মটকি বিশেষ হইয়াছিল। আত্মীয় স্বজন সকলে এখন আদর করিয়া তাহার দ্বিতীয় নাম রাখিয়াছিল—"জালা"। বিবাহের সম্বন্ধের জন্য যে সকল লোক বড়খুকীকে দেখিতে আসিত, তাহার অস্বাভাবিক স্থূলাঙ্গ দেখিয়াই সকলে "পিছপা" হইত। তাহা ছাড়া, বড়খুকীর গুণাগুণের কথাও প্রতিবাসীদিগের দশ-পাঁচ জনের নিকট গোপন ছিল না। সুতরাং যে সমস্ত লোক বড়খুকীকে দেখিতে আসিত, তাহাদের কাণেও সে সকল কথা পৌঁছিত। "মেয়ে বড় মোটা; লেখা পড়াও ভালরূপ কিছুই শেখে নাই; গৃহকর্ম্মাদি কিছুই জানে না; শুনিয়াছি বড় অলস, বড় স্বার্থপর,"—অধিকাংশ লোকই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বিবাহের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া যাইত।

হরদয়াল বাবু মহামুস্কিলের মধ্যে পড়িলেন। মেয়ের বিবাহের জন্য এত কষ্ট পাইতে হইবে, কখনই ভাবেন নাই। কিন্তু এখন লোকের মুখে কন্যার প্রতিকূলে নানারূপ কথা শুনিয়া, মনে মনে বড় দুঃখিত হইলেন। কতকটা তাঁহার নিজের অযত্নের জন্যই যে, তাঁহার বড়খুকীর বিপক্ষে এখন এত কথা শুনিতে হইতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। বড়খুকীও এখন নিতান্ত খুকীটি নহে;—বার বৎসরে হিন্দুর মেয়ে শ্বশুর ঘরে বউ, দশজনের মধ্যে একজন;—সুতরাং তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে যে বাপ মার এত বিড়ম্বনা পাইতে হইতেছে,—লোকে নানা কথা বলিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়া যাইতেছে,—তাহা দেখিয়া শুনিয়া তাহার মনেও বড় লাগিয়াছিল। এতদিনে বড়খুকীর মনে একটু অনুশোচনার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। তাহাকে যে লোকে এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেছে, সে যে শুদ্ধ তাহারই চরিত্র দোষে, এবং নিজের অযত্নের জন্য, এ কথা যেন তাহার এতদিনে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। আজ কাল বড়খুকীকে একটু স্থির ও গম্ভীর দেখা যাইত; তাহার মুখও সময়

সময় একটু বিষণ্ণ বলিয়া বোধ হইত। চিরদিন শৈশবের আমোদ প্রমোদ থাকে না, এতদিনে বড়-খুকী সে কথা বুঝিতে আরম্ভ করিল।

বহু চেষ্টা—বহু আয়াসে অবশেষে বড়খুকীর বর যুটিল। পাত্রটী বেশ সুশ্রী, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ছিল বটে; কিন্তু অনেক কারণে সম্বন্ধটী সকলের মনোমত হইল না। পাত্রের বিদ্যানুযায়ী উপার্জ্জন ছিল না, অথচ ঘরে পিতা কিম্বা অন্য কোন অভি-ভাবক বর্ত্তমান না থাকায়, সংসারের সমস্ত ভারই তাহার উপর ছিল। এই কারণে সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডা-ইবে? গরীব হইলেও এই পাত্রের সঙ্গেই বড়খুকীর বিবাহ দিতে হরদয়াল বাবু বাধ্য হইলেন। যথা সময়ে বহু জাঁকজমকে বড়খুকীর বিবাহ হইয়া গেল। হরদয়াল বাবুর স্ত্রী কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময় নানারূপ উপদেশ দিয়া দিলেন; বারংবার মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিলেন,—"মা আমি তোমায় গৃহকর্ম্মের কিছুই এ পর্য্যন্ত শিখা-ইতে পারি নাই; আমার কোন কথায়ই তুমি মনোযোগ কর নাই; কিন্তু শ্বশুরঘরে গিয়া শাশুড়ীর কথায় অবহেলা করিও না। এখন বাধ্য হইয়া সমস্ত গৃহ কর্ম্ম করিতে হইবে। চট্ পট্ সমস্ত কাজ কর্ম্ম শিখিয়া ফেলিয়া, যাহাতে শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া, তাঁহাকে সুখী করিতে পার, তাহা করিও; সকলের আরাম বিরাম দেখিয়া চলিও, আমার আর কিছু বেশী বলিবার নাই।"

শ্বশুরালয়ে বড়খুকীর আর সে আমোদ ও আবদারের দিন নাই। সংসারের অনেক কাজের ভারই এখন তাহার উপর পড়িয়াছে। শাশুড়ীর অনেক বয়স হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার কাছে গৃহ-কর্ম্মের বিশেষ আনুকূল্যের প্রত্যাশা করা অন্যায়। বড়খুকীকে প্রথম প্রথম ত মহা মুস্কিলের মধ্যেই পড়িতে হইয়াছিল। রান্না করা, দেওয়া থোয়া, থালা ঘটী বাটী মাজা, গৃহাদি পরিষ্কার করা,—সমস্ত কাজই এখন তাহার উপর পড়িয়াছে; অথচ ইহার কিছুই সে জানিত না। প্রথম সঙ্কট তাহার ছিল,—ঘুম হইতে সকাল সকাল ওঠা। পিত্রালয়ে ৭ টার পূর্ব্বে কখনও সে সকালে শয্যা ত্যাগ করে নাই। সুতরাং এখন প্রত্যূষে তাহার ঘুম ভাঙ্গিত না। বৃদ্ধা শাশুড়ী বড়খুকীকে খুব স্নেহ করিতেন। অধিক বেলা হইতেছে দেখিলেই, তিনি গিয়া পুত্রবধূকে মিষ্ট বাক্যে ঠেলিয়া তুলিতেন। কাজের ভার পুত্রবধূর উপর দিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই বুড়ীর নিজ হাতে করিতে হইত। বড়খুকী কিছুই করিতে পারিত না। কাজের কাছে গিয়াই সে কাঁদিতে বসিত। কোনদিন কিছু করে নাই, আদৌ কিছু জানে না, কি করিয়া করিবে? তাহার মা তাহাকে গৃহকর্ম্মাদি শিখাইবার জন্য যে কত যত্ন ও চেষ্টা করিতেন,—তখন সেই কথা তাহার মনে পড়িত, আর দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা বহিত। তাহার শাশুড়ী তাহাকে হাতে হাতে কাজ কর্ম্ম শিখাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে কি কিছু হইয়া থাকে? ভাত রান্ধিতে গিয়া বড়খুকী ভাত পুড়াইয়া ফেলিত; ডাল, মাছের ঝোল নূনকাটা করিয়া ফেলিত; এবং অন্যান্য যাহা কিছু রান্ধিত, সমস্তই প্রায় অখাদ্য করিয়া ফেলিত। কাজে কাজেই সেই শাশুড়ী বুড়ীরই বাধ্য হইয়া সমস্ত করিতে হইত।

একমাত্র পুত্রবধূ,—বড়ই স্নেহের পাত্রী। বড়-খুকীর শাশুড়ী বিরক্ত হইয়া তাহাকে কখন কিছু তিরস্কার করিলে, নিজেই মনে মনে কষ্ট পাইতেন। নিতান্ত যখন পারিয়া উঠিতেন না, তখন পুত্রবধূকে

কখনও কখনও দুই একটী শক্ত কথা বলিতেন; কিন্তু উপদেশচ্ছলে, স্নেহভরে। মায়ের কষ্ট দেখিয়া বড়খুকীর স্বামীও সময় সময় দুই এক কথা শুনাইতেন। "আমাদের ন্যায় গরীবের ঘরে তোমার বিবাহ দেওয়াই তোমার পিতা মাতার নিতান্ত ভুল হইয়াছে। তাঁহাদের বোঝা উচিত ছিল যে, এখানে তোমার সাংসারিক অনেক কাজকর্ম্ম করিতে হইবে, অনেক খাটিতে হইবে, এবং তাহাতে তোমার নিতান্ত কষ্ট হইবে। তুমি নিজে এত কষ্ট পাইতেছ দেখিলে যেমন আমার মনোকষ্ট হয়; মার এত কষ্ট হইতেছে,—তাঁহার যে কোন সেবা শুশ্রূষা হইতেছে না,—তাহা দেখিলে আমার ততোধিক কষ্ট হয়।" বড়খুকী এখন বড় হইয়াছে, ভাল মন্দ সব বুঝিত; সুতরাং স্বামীর এই সব কথা তাহার মনে বড়ই লাগিত।

অনেকদিন পরে বড়খুকী পিত্রালয়ে আসিল। এবার আসিয়াই সে মায়ের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মা, আমি তোমার কাছে বড়ই অপরাধ করিয়াছি। আমায় ক্ষমা কর। এবার আমায় কাজ কর্ম্ম সমস্ত ভালরূপে শিখাইয়া দেও। তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। গুরুজনের বাক্য অবহেলা করার ফল আমি হাতে হাতে পাইয়াছি।" কন্যার এই কথায় মাতার চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। বড়খুকীর মতি ফিরিয়াছে দেখিয়া, তিনি সুখী হইলেন। এবার যখন বড়খুকী শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া গেল, তখন সমস্ত কাজ সে সুন্দররূপ শিখিয়া ফেলিয়াছে। তাহার শাশুড়ীর এখন আর কিছুই করিতে হইত না। এতদিনে বড়খুকীর পিতা মাতা সুখী হইলেন, শাশুড়ী সুখী হইলেন, তাহার স্বামী আনন্দিত হইলেন, এবং সে নিজে প্রাণে আরাম পাইল।

অনেক ঘরে অনেক বড়খুকী আছেন। আমাদের বড়খুকীর কথা শুনিয়া তাঁহারা কে কি মনে করিয়াছেন জানি না; কিন্তু আমাদের অনুরোধ যে, কাহারও যেন আমাদের বড়খুকীর মত দায়ে ঠেকিয়া কাজকর্ম্ম শিখিতে না হয়। যাহার যাহা শিখিবার, সময় মতেই যেন তাহা শিক্ষা করিয়া গুরুজনকে সুখী করেন।



ছুটেছে আমার ঘোড়া।

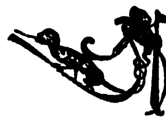
"বাহবা—বাহবা—বেশ,
দেখ-না কেমন মজা,
ছুটেছে আমার ঘোড়া,
চ'লেছি আমি রাজা!
মুখেতে লাগাম বাঁধা
ঘোড়া যেন ঝড় ছোটে,
চাবুক সপাং সপ্
সজোরে পড়্‌চে পিঠে।
টপাং টপাং লাফ্
তিন লাফে মাঠ ছাড়ে,
তফাৎ—তফাৎ সব,
এখনি পড়্‌বে ঘাড়ে।
ছুটেছে আমার ঘোড়া,
চ'লেছি আমি রাজা,



বাহবা—বাহবা—বেশ
দেখ-না কেমন মজা!"
বলিতে বলিতে বিধু
গাছের ডালেতে ব'সে
সপাং সপাং সপ্
চাবুক মারিছে ক'সে।
এমন সময়ে বিধু
দেখে তার ছোট ভাই,
স্থরেন দাঁড়ায়ে দূরে
হাসিতেছে দেখে তাই।
অমনি তাহারে বলে—
"ছুটে যা ঘরে ত্বরা,
পড়িলে সমুখে এর
এখনি যাইবি মারা।
উড়ে যেন চারি পায়
চ'লেছে ঘোড়া জোরে,
রাখিতে পারিনে রাশ,
কেমনে বাঁচাব তোরে?"
স্থরেন হাসিয়া বলে—
"দাদা, এ তোমার ঘোড়া
যে জোরে চ'লেছে ছুটে
মেলে না ত এর যোড়া!
চারিটা পায়ে যে ওড়ে—
সেই পা চারিটা কোথা?
মোটে ত এক পা দেখি—
তাও ত মাটিতে পোতা!
তু'লে না নাড়িলে ওরে
ক্ষমতা কি যে নড়ে,
তবুও পালাব ছুটে
পাছে ও ঘাড়ে পড়ে?
আস্থক্ তোমার ঘোড়া,
দেখি ওর বল কত,
দাঁড়ালাম এই পথে—
এক পা সর্‌বো না ত।"
স্থরেন এই-না ব'লে
সমুখে দাঁড়ায়ে নাচে,
বিধুও চালা'তে ঘোড়া
ছড়ি মারে শুধু গাছে!



হটু বিদ্যালঙ্কার।


রতের গৌরবস্থানীয়া প্রাতঃ-স্মরণীয়া সেই লীলা, খনা আজ অস্মরণীয় অতীত-যুগ যুগান্তরের স্মৃতি,—তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী কালমাহাত্ম্যে অধুনা

কিম্বদন্তিতে পরিণত! যে ভারত মৈত্রী, গার্গি, খনা, লীলা প্রভৃতি বিদুষী রমণীদিগের লীলাভূমি ছিল, আজ সেই ভারতে বিদুষী রমণী আকাশকুসুম! ভারতে রাজ্যবিপ্লবে সামাজিক অবনতি ঘটিয়াছে, সামাজিক অবনতিতে রমণীজাতির এই অধোগতি বা দুর্গতি সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে এই অধোগতির অন্ধকার মধ্যেও কোথাও খদ্যোতের ক্ষীণালোক দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আজ তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

রাঢ় প্রদেশে বর্দ্ধমান জেলাতে কলাইঝাটি নামে একটী পল্লীগ্রামে, বাঙ্গলা দ্বাদশ শতাব্দীতে, নারায়ণ দাস নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সুধামুখী নামে এক রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সকলেরই অকালে কালপ্রাপ্তি ঘটে। অবশেষে বাঙ্গলা ১১৮১ কি ৮২ সনে তাঁহাদের এক কন্যা সন্তান জন্মে। পিতা মাতা মড়াঞ্চে সন্তান বলিয়া কন্যাকে হটি বলিয়া ডাকিতেন--কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম রাখিয়াছিলেন রূপমঞ্জরী। রূপমঞ্জরী কিরূপ রূপবতী ছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না: কিন্তু তিনি যে গুণবতী ছিলেন, তাহা আমরা বেশ বলিতে পারি।

বালিকা বয়সে রূপমঞ্জরীর ওরফে হটির মাতৃবিয়োগ হয়। তখন নারায়ণ দাসই তাহার মাতৃ-পিতৃ উভয় স্থানীয় হইলেন। নারায়ণ দাসের ঘরে সুধামুখী গৃহিনী নাই,—বার্দ্ধক্যের অবলম্বন পুত্র সন্তান নাই। নারায়ণ দাস যেমন রূপমঞ্জরীর মাতৃ-পিতৃ স্থানীয় হইয়াছিলেন, রূপমঞ্জরীও তেমনি তাঁহার পুত্র-কন্যা স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইল। বৈষ্ণব নারায়ণ দাসের বিষয়কর্ম্ম কিছু ছিল না, তাঁহার অবসর কাল কাটে না। সংসারের একমাত্র বন্ধন কন্যাকে অবসর কাটানের উপায় করিয়া লইলেন,—হটিকে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। হটির বেশ প্রখরা বুদ্ধি ছিল; তিনি যা কিছু শিখাইতেন, সে তাই টপ্ টপ্ করিয়া শিখিয়া ফেলিত।* কন্যার এরূপ মেধা-শক্তি দেখিয়া পিতা অধিকতর আগ্রহের সহিত শিক্ষা দানে প্রবত্ত হইলেন,—প্রতিবেশী পরিজনেরা হটির বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাহাকে ব্যাকরণ অধ্যাপনার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিল। স্ত্রীলোকে বিদ্যা শিক্ষা করিলে বিধবা হয়, যেদেশে এরূপ কুসংস্কার, সেই দেশের লোকে হটির পিতাকে কেন এরূপ সদুপদেশ দিয়াছিল, বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, হটির যখন ১৬।১৭ বৎসর বয়স, তখন নারায়ণ দাস তাহাকে নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে এক বৈয়াকরণিকের গৃহে রাখিয়া আইসেন। বৈয়াকরণিক জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন,—তাঁহার এক টোল ছিল। ষোড়শ বর্ষীয়া রূপমঞ্জরী সেই টোলের ছাত্রদের সঙ্গে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। এখানেও আর এক দেশাচার বিরুদ্ধ ঘটনা দেখা যাইতেছে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী অবিবাহিতা রহিয়াছে,—পুরুষের সঙ্গে একই বিদ্যাগারে শিক্ষা লাভ করিতেছে! জানিনা, বৈষ্ণব-সন্তান বলিয়া এরূপ হইয়াছিল কি না। কিন্তু রূপমঞ্জরী কেবল এই গুরুগৃহে নহে,—আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন,—তিনি মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত কুমারী ছিলেন, অথচ নীচতম শত্রু পর্য্যন্তও তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন দিন একটি কথাও বলিতে অবসর পায় নাই।

তিনি যখন গুরুগৃহে ব্যাকরণ অধ্যয়ন জন্য বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু সংবাদ আসিল। তিনি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য স্বগ্রামে গমন করিলেন। পিতার সংকারান্তে

আবার গুরুগৃহে ফিরিয়া গেলেন। ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ হইলে, তিনি গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কার নামক এক অধ্যাপকের নিকট সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। সাহিত্য অধ্যয়ন শেষ হইলে, তিনি পিতামাতার প্রেতঃকৃত্য সম্পন্ন জন্য গয়াধামে গমন করেন,—তথা হইতে কাশীধামে যাইয়া কিছুকাল বাস করেন। কাশী বাস কালে তিনি দণ্ডীদের নিকট নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যাপকেরা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে আগ্রহের সহিত শিক্ষা দিতেন। এইরূপে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি জন্মভূমি রাঢ়দেশে প্রত্যাবৃত হইলেন,—দেশে আসিয়া "হটু বিদ্যালঙ্কার" নামে অভিহিত হইলেন।

কিন্তু কেবল বিদ্যালোচনাতে তাঁহার প্রাণে শান্তি দিতে পারিল না;—নারীর কোমল হৃদয়ের স্নেহধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণে জন-সেবা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন মানসে সরগ্রাম নিবাসী সাহিত্য-গুরু গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের নিকট আবার গমন করিলেন। তাঁহার নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি এরূপ সুখ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, অনেকে আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, চড়ক, নিদান প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে আসিত;—অনেক খ্যাত-নামা কবিরাজ চিকিৎসা সম্বন্ধে সময় সময় তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

দু একটী বিষয়ে ইহাঁর একটু ক্ষেপামি ছিল। তিনি বেশ ভূষা অনেকটা পুরুষের মত করিতেন। রমণী-সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ কেশের উপর তাঁহার তত শ্রদ্ধা ছিল না,—মাথা মুড়াইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত শিখা রাখিতেন; পুরুষের মত করিয়া উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন!

বাঙ্গলা ১২৮২ সনের ১৫ই পৌষ তারিখে প্রায় এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাধারমণ দাস নামে এক ব্যক্তিকে তিনি পালকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। তিনি আজও জীবিত আছেন,—আমাদের এই "হটু বিদ্যালঙ্কারের" গৃহেই তিনি বাস করেন। সুতরাং কাল্পনিক গল্প বলিয়া চিরকুমারী রূপমঞ্জরীর কথা উড়াইয়া দেওয়ার যো নাই। বঙ্গদেশের—বাঙ্গালীর অধঃপতনের চূড়ান্ত সময়ে রূপমঞ্জরীর ন্যায় বিদূষী রমণীর ইতিবৃত্ত শুনিলে প্রাণে কতই না আনন্দ হয়! পাঠিকাগণ, তোমাদের মধ্যে কাহারও কি কুমারী রূপমঞ্জরীর ন্যায় জ্ঞানবতী, গুণবতী হইতে সাধ যায় না?—এরূপ রমণী যে সমাজে—যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সমাজের ও সেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়। ভারতের ঘরে ঘরে কবে এরূপ রমণী জন্মগ্রহণ করিবেন!

পুরাতন কথা।



রিষ্কার আকাশ হইলে ক্রমাগত চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। চিলগুলি ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ কত উচুতে উঠিতেছে। দু একটা শকুন আবার এর চাইতেও কত উপরে উঠিয়া গিয়াছে। নীল আকাশে তাহাদিগকে এক একটী কাল বিন্দুর মত দেখায়। কত দিন দেখিয়াছি, আকাশের এক স্থানে কোথা হইতে একটী অতি হাল্কা শাদা মেঘ আসিয়াছে। কোথা হইতে আসিল কিছুই বলিতে পারিতেছি না। মুহূর্ত্তেক আগে সেটী সেখানে ছিল না; অন্য কোন দিক

দিয়া কখনই আসে নাই—তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম।

মেঘটা কোথা হইতে আসিল? আবার ঐ দেখ সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরমা বলিয়াছিলেন "পাহাড়ে গাছের কচি পাতা খাইবার জন্য অভ্রেরা দল বাঁধিয়া শূন্য পথে চলিয়া যায়, আমরা তাহাদিগকে মেঘ বলি; কিন্তু পাহাড়ের লোকেরা বল্লম হাতে লইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহাদের অপেক্ষা করিতেছে। এরা যাই পাহাড়ে পৌঁছাইবে, অমনি ইহাদিগকে বধ করিয়া বাজারে বিক্রী করিতে আনিবে।"—কিন্তু ঠাকুরমার কথাত দেখিতেছি এখানে খাটিতেছে না।

মেঘেরা তবে কে? মেঘেরা অতি সূক্ষ্ম জলকণার সমষ্টি। গরম বাতাসের ভিতরে জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে; তখন আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না। বরং শুষ্ক বায়ুর ভিতর দিয়া দূরের জিনিস যেমন দেখিতে পাইতাম, জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকার দরুণ তার চাইতে পরিষ্কার দেখি। ঠাণ্ডা লাগিলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলের কণা সকল বায়ু হইতে পৃথক হইয়া পড়ে; তখন তাহাদিগকে আমরা মেঘ বলি। ইহারা যখন আরো ঘন হইয়া মাটীতে পড়িবে, তখন বৃষ্টি হইবে। নদী পুকুর ইত্যাদিতে জল দাঁড়াইবে। ঠাণ্ডা দেশে আবার কত জায়গায় এই জল জমিয়া বরফ হইবে।

এ সকল কথা তোমরা অনেকেই 'সখা'তে পড়িয়াছ। ভুলিয়া গিয়া থাকিলে, আমার আজিকার সকল কথা তোমাদের বুঝিতে কষ্ট হইবে, তাই মনে করিয়া দিলাম।

মেঘের বেলায় যাহা হইয়াছে, পৃথিবীর বেলায়ও বিস্তৃত আকারে কতকটা তেমনি হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী এক কালে বাষ্পের আকারে ছিল, ক্রমে শীতল হইয়া তরল হয়, শেষটা তাহার বর্ত্তমান কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও পৃথিবীর সমস্তটা কঠিন হয় নাই। আগ্নেয়গিরি হইতে মাঝে মাঝে অতিশয় গরম গলান জিনিস সব বাহির হয়, একথা তোমরা জান। ঐ গুলি পৃথিবীর ভিতরকার জিনিস। ঘি জ্বাল দিয়া রাখিলে যেমন প্রথমে তাহার উপরে খানিকটা জমে, কিন্তু ভিতরটা তরল অবস্থায়ই থাকে, পৃথিবীরও এখন সেই অবস্থা। আর কয়েক শত কোটী বৎসর পরে পৃথিবী এত ঠাণ্ডা হইবে যে, তাহার ভিতর অবধি জমিয়া যাইবে। তখন শীত এত বাড়িবে যে, পৃথিবী আর জীব জন্তুর বাসের উপযোগী থাকিবে না। চন্দ্র বেচারীর এখন এই দশা হইয়াছে। তাহার ভিতরকার আগুন অনেক কাল নিবিয়াছে। অনেককাল হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে—আমরা তাহার কঙ্কাল মাত্র দেখিতেছি। কি ভাগ্য, ভাই, অমর হই নাই। তাহা হইলে সেই ভয়ানক শীতের সময় কি কষ্টই হইত। তুলার গাছ মরিয়া যাইত, সুতরাং কাপড় পরিতে পাইতাম না। ভেড়াগুলি মরিয়া গেলে শীত নিবারণের উপায় থাকিত না। খাবার জিনিস যাহারা যোগায়, তাহাদের মৃত্যু হইলে ক্ষুধায় চিরকালটা ক্লেশ পাইতাম।

সূর্য্যের ঘূর্ণনের চোটে* মাঝে মাঝে তাহার এক এক টুক্‌রা তাহার ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল। ঐ সকল টুক্‌রা শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে গোল আকার ধারণ করিল। প্রথমে ইহারা সূর্য্যের ন্যায় গরম ছিল। এক কড়া গরম দুধ হইতে এক চামচে দুধ তুলিয়া লইলে যেমন চামচের দুধ শীঘ্র ঠাণ্ডা হয় কিন্তু কড়ার রাশিকৃত দুধ তত শীঘ্র শীতল হইতে পায় না। সেইরূপ এই সকল টুকরা শীঘ্র শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া প্রথমে তরল তৎপরে কঠিন হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্য আজিও অতিশয় গরম বাষ্পের

* সূর্য্য ২৩ দিনে একবার ঘুরে।

আকারে রহিয়াছে। এইরূপ একটী টুকরার সঙ্গে আজ কাল আমাদের বড়ই ঘনিষ্টতা হইয়াছে, এবং আমরা "পৃথিবী" বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছি।

পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন হইয়াও অনেককাল খুব গরম ছিল। পৃথিবীর জলভাগ তখন বাষ্পের আকারে ছিল। ক্রমে পৃথিবী যখন আরো ঠাণ্ডা হইল, তখন তাহার পৃষ্ঠে জল জমিতে আরম্ভ হইল। এইরূপে সমুদ্রগুলির জন্ম হইল।

বস্তু সকল যতই ঠাণ্ডা হইতে থাকে, ততই তাহাদের আয়তন কমিতে থাকে। কঠিন পদার্থের চাইতে তরল পদার্থের আয়তন খুব শীঘ্র শীঘ্র কমে। পৃথিবীর ভিতরকার তরল জিনিস শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যত ছোট হইতেছে, বাহিরের কঠিন আবরণ দেরিতে কমার দরুণ, তত ছোট হইতে পারিতেছে না; সুতরাং সে কোঁকড়াইয়া যাইতেছে। এইরূপে পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশঃ অধিক উচু নীচু হইতেছে। এই ব্যাপার আমাদের চক্ষের সামনে অবিরত ঘটিতেছে। এক কালে পৃথিবীর কোন স্থান সমুদ্রের নীচে ছিল, তাহা জাগিয়া উঠিতেছে; কোন স্থান বা আগে উচু ছিল, এখন ক্রমে নীচু হইতেছে। কোন স্থান বা প্রথমে একবার উচু থাকিয়া, মাঝে নীচু হইয়া শেষে আবার উচু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুন্দর বনে কোন সময়ে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, এখন জলে ডুবি যাইতেছে। হিমালয় পর্ব্বতের অনেক স্থানে সামুদ্রিক জীবের চিহ্ন সকল পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং হিমালয় পর্ব্বতের ঐ সকল স্থান এক সময়ে সমুদ্রের নীচে ছিল। ইটালীতে একস্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সেই স্থান ক্রমশঃ নীচু হইয়া মন্দিরের স্তম্ভগুলির কিয়দংশ পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। আবার সেই স্থান উচু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নরওয়ের অনেক স্থান নীচু হইতেছে। সুইডেনের অনেক স্থান উচু হইতেছে। বল্টিক সমুদ্রের তলা ক্রমশঃ উচু হইয়া তাহার গভীরতা কমিয়া যাইতেছে। এইরূপে সাগর শুখাইয়া দেশ হইতেছে এবং দেশ ডুবিয়া সাগর হইতেছে। ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে অনেক সময় খুব শীঘ্র শীঘ্রই ভূপৃষ্ঠে গুরুতর পরিবর্ত্তন সকল ঘটে। দক্ষিণ আমেরিকায় একবার ভূমিকম্প হইয়া এক দেশের কিয়দংশ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল।

ক্রমশঃ।

পরিচ্ছন্নতা।

(প্রাপ্ত।)

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। উষ্ণ প্রধান দেশ বাসীদিগের পক্ষে উহা অধিকতর প্রয়োজনীয়। সচরাচর তোমরা দেখিতে পাও যে, গ্রীষ্ম কালে কাপড় একটু ময়লা হইলে উহা পরিধান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না; পরিলেও মনে ভাল লাগে না। কিন্তু শীতকালে তদপেক্ষা অপরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিতে তত বিরক্তি বোধ হয় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ সময়ই গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব অনুভূত হয়। সুতরাং আমাদের পরিষ্কার থাকার জন্য বিশেষ যত্ন করা উচিত। তোমরা হয় ত মনে কর, পরিষ্কার থাকিতে হইলে বেশী টাকা পয়সার দরকার। এরূপ মনে করা বড় ভুল। কারণ বহু মূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়াও কোন কোন ব্যক্তি অপরিষ্কার বলিয়া নিন্দনীয় হন। পক্ষান্তরে অনেকে অল্প মূল্যের ভদ্রোচিত বস্ত্রাদির দ্বারা ভূষিত হইয়া পরিচ্ছন্নতার

জন্য অশেষ সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়। শুধু সুখ্যাতি অখ্যাতি লাভালাভের নিমিত্ত পরিষ্কার থাকা উচিত, আমরা এরূপ বলিতেছি না। উহার নানাবিধ উপকারিতা আছে।

সুস্থ শরীরে জীবন ধারণ করা ইহ জগতে এক প্রধান সুখ। কতগুলি রোগ আছে, যাহা অপরিচ্ছন্নতায় উৎপন্ন হয়। চর্ম্মরোগ তন্মধ্যে প্রধান। পাচড়া, চুলকানি, দাউদ যাহার হইয়াছে, সেই উহার অপকারিতা অনুভব করিতে সক্ষম। এই সমস্ত ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমাদের পরিষ্কার থাকা প্রয়োজনীয়। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত তিনটী কারণে পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস করা, লোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ—পরিচ্ছন্নতা শিষ্টাচারের প্রধান অঙ্গ। মনুষ্য মাত্রই সামাজিক জীব। সমাজস্থ লোক মণ্ডলীর সুখে দুঃখে পরস্পরের সহানুভূতি না থাকিলে লোকালয়ে বাস করা দুঃসাধ্য হইত। লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেকের শিষ্টাচারী হওয়া উচিত। যে জাতি যত সভ্য, সেই জাতি ততোধিক পরিমাণে এই গুণে অভ্যস্ত।

মনে কর, কোন এক স্থানে দশ জন লোক সমবেত হইয়াছে। তথায় যদি কোন ব্যক্তি অত্যন্ত কদর্য্য ও দুর্গন্ধময় বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে কি মনে করিবে? পাগল অথবা অভদ্র বলিয়া ঠিক করিবে। কারণ সমবেত লোকবর্গ তাহার উপস্থিতিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইবে। এইরূপে কেহকে কষ্ট দেওয়া বড় অভদ্রতা। তজ্জন্যই আমাদের দেশে নিমন্ত্রণাদিতে সাধারণতঃ ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া যায়। সুতরাং সামাজিক রীতি রক্ষার জন্য লোক মাত্রেরই পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ—পরিচ্ছন্নতা ভালবাসার পুষ্টি সাধন করে। সাজ সজ্জা করিলে কুৎসিতকেও সুন্দর দেখায়। সাজ সজ্জা করার অর্থ ভদ্রোচিত নির্ম্মল বস্ত্রাদি ও সাধারণ অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হওয়া। যাহারা স্বভাব সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত, তাহারা অপরের চিত্ত অনায়াসে আকর্ষণ করে। সুন্দর পদার্থ মাত্রই লোকে ভালবাসে। সৌন্দর্য্যই ভালবাসার মূলীভূত কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। এইরূপ হইলে পরিচ্ছন্নতা ভালবাসার উদ্রেক ও তাহা দীর্ঘ স্থায়ী করার পক্ষে প্রধান সাহায্যকারী। লোক মাত্রই অপরের ভালবাসা পাইতে প্রয়াসী। অতএব কি সুন্দর কি কুৎসিৎ, সকলেরই সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হওয়া উচিত। নতুবা অপরের ভালবাসা প্রাপ্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

তৃতীয়তঃ—পরিচ্ছন্নতার সহিত পবিত্রতার অতি নিকট সম্বন্ধ। যেদিন অপরিষ্কৃত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ধৌত বস্ত্র পরা যায়, সেদিন স্বতঃই একটু পবিত্র ভাবের উদ্রেক হয়। ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আমাদের দেশে পূজা পর্ব্ব উপলক্ষে বাড়ী ঘর এবং পথ ঘাট ও গৃহের সমস্ত আসবাব অতি যত্নে পরিষ্কার করা হয়। অপরিষ্কারভাবে কেহ পূজার আয়োজন করিতে পারে না। বস্তুতঃ মানসিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস করা অতীব আবশ্যক। এই গুণ অভ্যাস করিতে যাইয়া অনেকে মাত্রা অতিক্রম করিয়া এক প্রকার রোগগ্রস্ত হন। উহাকে শুচি বলে। এক দিকে এই রোগ হইতে মুক্ত থাকিবে, অপর দিকে কখনও অপরিষ্কৃত থাকিবে না। এই গুণে অভ্যস্ত হইলে, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল অধিকাংশ সময় সহজ-সাধ্য হয়।



সেপ্টেম্বর, ১৮৯০।



বিবিধ।

ইংরেজ জাতির মহত্ত্ব।—জেনারেল গর্ডন বর্ত্তমান যুগে ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা বীর ছিলেন। তিনি কত যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, কিন্তু কখন বন্দুক হাতে করেন নাই;—একগাছা ছড়ি হাতে সৈন্য পরিচালন করিতেন। তাঁহার দয়ার শরীর, করুণ হৃদয় ছিল। আফ্রিকা দেশে আসিয়া তিনি নিহত হন। অর্থ বিত্ত তাঁহার বড় ছিল না; তথাপি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব তিনি পথের অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য ব্যয় করিতেন! পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ গলিয়া যাইত। তাই তিনি অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য এক আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিহত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আশ্রম আজও জীবিত আছে,—তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিয়াছে। বিগত বৎসর সেই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ইংলণ্ডের লোক ২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছে। এই পরোপকার ব্রতনিষ্ঠাতেই ইংরাজ জাতির মহত্ত্ব। আর আমাদের দেশে অর্থাভাবে কোন সদনুষ্ঠানই স্থায়ী হয় না!

**
*

প্রকৃত মনুষ্যত্ব।—বিলাতের এক স্থানে অল্পদিন হইল আগুন লাগে;—সে আগুন বেড়া আগুন; কাহার সাধ্য নিকটে যায়। এক বাড়ীর ভিতর দুইটী শিশু আর এক বুড়ী ছিল—বাড়ীতে আগুন ধরিয়াছে। লোকগুলি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় এক গোয়ালা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সেই সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। যে ঘরে শিশু দুইটী ছিল, সেই ঘরে ঢুকিয়া দেখে ধুঁয়ায় ঘর অন্ধকার; চোখে কিছু দেখা যায় না, শ্বাসরোধ হইয়া আইসে। তথাপি সে বহু আয়াসে শিশু দুইটীকে পথের পার্শ্বস্থ জানালা দিয়া বাহিরের লোকের হাতে দিল। তাহাদের উদ্ধার করিয়া বুড়ীর অন্বেষণে ছুটিল। দোতালায় বুড়ীর ঘরে যখন প্রবেশ করিল, তখন ঘরের মেজেতে আগুন ধরিয়াছে,—তাহারা উভয়ে মেজে পুড়িয়া নীচে অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া গেল। তাহাতেও সে হতাশ না হইয়া বুড়ীকে কোলে করিয়া আনিয়া বাহির করিল। বাহিরে আসিয়া দেখে তাহার ডান হাত খানা একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে! এ ব্যক্তি মানুষ না দেবতা?

**
*

অদ্ভুত জ্যোতির্ব্বিৎ।—কলিকাতাতে পণ্ডিত কাশীনাথ জ্যোতিষরত্ন নামে এক অদ্ভুত জ্যোতির্ব্বিদ আসিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান

নগরে ও ইয়ুরোপের কোন কোন স্থানে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় দিয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। পাথুরিয়াঘাটায় স্যার শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাড়ীতে একদিন তাঁহার অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি লোকের মুখ দেখিয়া তাহাদের জন্মতিথি, নক্ষত্র, বার প্রভৃতি বলিয়া দিতে পারেন। কেবল তাহাই নহে, তুমি মনে মনে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিবে ভাবিতেছ, আর এদিকে তিনি তোমার প্রশ্ন না শুনিয়াই কাগজে উত্তরটী লিখিয়া রাখিলেন। তারপর তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি প্রশ্ন? যেই তুমি প্রশ্নটী করিলে, আর অমনি তিনি পূর্ব্ব লিখিত উত্তরের কাগজখানা তোমার হাতে দিলেন। তুমি দেখিয়া অবাক্। আমরা নিজে ইহা প্রত্যক্ষ না করিয়া থাকিলেও, অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রত্যক্ষকারীর মুখে শুনিয়াছি।

* *
*

সামুদ্রিক কলম।—তোমরা "সামুদ্রিক কলম" কথাটী পড়িয়া হয় তমনে করিতেছ যে, লিখিবার কলমের কথা বলা হইতেছে। তাহা নহে, সমুদ্রে এক প্রকার জীব আছে, যাহাদিগের আকৃতি ঠিক পেন কলমের ন্যায়; এজন্য লোকে ইহাদিগকে সামুদ্রিক কলম (Sea-pen) কহিয়া থাকে। ইহারা পুরুভুজ জাতীয়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে পলিপ্‌ছ (Polypse) অর্থাৎ বহুপদ বলে। বৃক্ষাদির শাখা প্রশাখার মত ইহাদিগের অনেকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে বলিয়াই ইহাদিগের ঐরূপ নাম হইয়াছে। আমাদিগের হাত কি পা কাটিয়া ফেলিলে তাহা অকর্ম্মণ্য হইযা যায়; ইহাদিগের তদ্রূপ হয় না,—কর্ত্তিত অংশ স্বতন্ত্র জীবরূপে পরিণত হয়। পশু পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় ইহাদিগের সন্তান ও ডিম্বাদি হয় না। কোন কোন বৃক্ষের মূল হইতে যেমন আর একটী বৃক্ষ জন্মে, ইহাদিগেরও শরীর হইতে তেমনই আর একটী জীব জন্মিয়া স্বতন্ত্র হইয়া যায়। সামুদ্রিক কলমের মুখ হইতে অঙ্কুর বহির্গত হয়। ইহাদিগের একটী সুদীর্ঘ লেজ আছে, তজ্জন্যই ইহাদিগকে কলমের ন্যায় দেখায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদিগের শরীর হইতে খরতর জ্যোতিঃ নির্গত হয়। রাত্রিকালে ধীবরেরা এই আলোকের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী মৎস্য দেখিতে পাইয়া, জাল দ্বারা তাহা ধৃত করিয়া থাকে। অন্যান্য প্রকার পুরুভুজের ন্যায় ইহারা এক স্থানে আবদ্ধ থাকে না। ইহারা ইচ্ছামত সমুদ্রে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়।

* *
*

ঘোটকের বুদ্ধি।—একটী ঘোটক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল। আস্তাবলে জল ছিল না। ঘোটকটী তাহার রক্ষকের নিকট অভিপ্রায় জানাইতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। এই ঘোটকের একটী বিশেষ লাগাম ছিল। যখন তাহাকে জলপান করিতে লওয়া হইত, তখন এই লাগামটী পরাইয়া দেওয়া হইত। অবশেষে ঘোটক, যেঘরে লাগাম থাকিত সেই ঘরে গমন করিল, এবং সেই লাগামটী কামড় দিয়া রক্ষকের নিকট আসিল। রক্ষক তখন ঘোটকের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাকে জলপানার্থ লইয়া গেল।

* *
*

বালকের ধূমপান।—অল্প বয়স্কদের যে কোন রূপ ধূমপানই স্বাস্থ্যের অনিষ্টকারী। তাই যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন, নিউইয়র্ক নগরে ১৬ বৎসরের কম বয়সের যে বালক ধূমপান করিবে, তাহার জরিমানা করা হইবে।

পুরাতন কথা।

বৃষ্টি হইলে নীচু জায়গায় জল দাঁড়ায়। বুদ্ধিমান গৃহস্থেরা ওঠান উচু রাখেন, আর ছোট ছোট নালা কাটিয়া জল সরিবার বন্দোবস্ত করেন। বৃষ্টির সময় ঐ সকল নালা ছোট ছোট নদীর আকার ধারণ করে; ছেলেবেলায় তাহাতে মোচার খোলার নৌকা ভাসাইয়া আমোদ দেখিয়াছি। ওঠানের যত কিছু ধূলা মাটি, খড় কুটা সকলেরই নমুনা বৃষ্টির জলের সঙ্গে ঐ সকল নালা দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। নালার জল ভারি ঘোলা হইয়াছে। ঐ জল হয় ত একটা বড় গর্ত্তে যাইয়া পড়িতেছে। গর্ত্তের কাছে গেলে দেখিবে, সেখানে অনেক জল দাঁড়াইয়াছে। বৃষ্টি হইয়া গেলে ঐ জল থিতাইয়া ক্রমে পরিষ্কার হইবে; ক্রমাগত কয়েক দিন বৃষ্টি না হইলে শুখিয়া যাইবে। এখন যদি একবার ঐ গর্ত্তের তলাটা পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে যে তলায় অতি মিহি মোলায়েম কাদা জমিয়াছে। ঐ কাদা ওঠান হইতে আসিয়াছে। ওঠান হইতে ভারি জিনিস যাহা কিছু আসিয়াছিল, তাহা ঐ কাদায় ঢাকা পড়িয়াছে।

বর্ষাকালে নদীর জল বাড়ে। চৈত্র বৈশাখ মাসে ছোট নদীটী ঝির ঝির করিয়া কোন মতে দিনপাত করে। তাহার পরিষ্কার টলটলে জলটুকু দিন দিন শুকাইয়া যায়, দেখিলে দুঃখ হয়। বর্ষাকাল আসুক, দেখিবে তাহার আর সে অবস্থা নাই। তখন এ স্বচ্ছ জল থাকিবে না, দুরন্ত রাখাল বালকেরাও তখন আর চৌপর দিন ধরিয়া স্নান করিতে থাকিবে না। তখনকার সেই দেশ ভাসানে ঘোলা জল আর তার বেগ দেখিলেই মনে কেমন একটা কুমীর কুমীর ভাব আসে। এ ভাবেও কিছু আর চিরদিন যাইবে না। বর্ষা চলিয়া গেলে আবার নদীর পরিসর কমিতে থাকিবে। ঘোলা জল থিতাইয়া ক্রমে পরিষ্কার হইবে। নদীর দুই ধারে যে সকল জায়গা ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার একটু একটু করিয়া জাগিবে। এখন দেখিবে তাহাদের উপরেও অতি মিহি মোলায়েম কাদা জমিয়াছে। সাধারণ কথায় বলিবে "পলি পড়িয়াছে।"

ওঠানের নালার জল যেমন গর্ত্তে পড়িয়াছিল, নদীর জলও তেমনি হয় ত সমুদ্রে পড়িতেছে। নদীর জলে কত জিনিস—কত গাছ পালা, কত জন্তুর মৃত শরীর—ভাসিয়া যায়; তাহাদেরও অনেকে সমুদ্রে যাইয়া পড়িতেছে। সেখানে কয়েকদিন ভাসিয়া তার পর তলাইয়া যাইতেছে। এইরূপে নদী যে সব জায়গার ভিতর দিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কিছু কিছু নমুনা সমুদ্রের তলায় আসিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক বর্ষার ঘোলা জল হইতে পলি পড়িয়া আবার ইহাদিগকে ঢাকিতেছে। এইরূপে এক এক বৎসরের এক এক স্তর পলি আর সেই সকল স্তরের মাঝে নানান্ রকম জিনিসের নমুনা জমিতেছে।

জোয়ার ভাটা অনেকেই দেখিয়াছ; না দেখিয়া থাকিলেও 'সখা'তে তাহার বিষয় পড়িয়াছ। সমুদ্রের জল দিনে দুইবার করিয়া বাড়ে কমে, তাহাকেই আমরা জোয়ার ভাটা বলি। সমুদ্রের সহিত যে সকল নদীর সংযোগ আছে, সেই সকল নদীতেও জোয়ার ভাটা হয়। সমুদ্রের দিকে নদীর জল গড়াইয়া চলে, কিন্তু জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল উঁচু হওয়ার দরুণ সমুদ্রের জল নদীর ভিতরে আসে। নদীতে তখন জল বাড়িতে থাকে, এবং দুধারের জমি অনেক দূর অবধি ডুবিয়া যায়।

আবার ভাটার সময় জল সরিয়া আইসে। জোয়ারে ডোবা জায়গাগুলি আবার ভাসিতে থাকে। তখন দেখা যায়, তাহাদের উপরেও পলি পড়িয়াছে। নদীর জল যত অধিক ঘোলা হয়, এই পলি ততই পুরু হইয়া পড়ে; আর জোয়ার যত বেশী হয় নদীর দু পাশের জমি ততই বেশী দূর অবধি ডুবিয়া যায়।

অমাবস্যা পূর্ণিমায় যত জোয়ার হয়, অষ্টমীর দিন তার চাইতে অনেক কম হয়। অমাবস্যার দিন অনেক দূর অবধি ডুবিয়া পলি পড়িয়াছে। আবার পূর্ণিমা না আসিলে এত দূর জল আসিবে না। এর মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে এই পলি শুকাইয়া খুব শক্ত হইয়া যাইবে। যখন এই পলি কোমল ছিল, তখন ইহার উপর দিয়া কত পশু পক্ষী চলিয়াছে, কত গাছের পাতা বাতাসে উড়িয়া আসিয়া ইহার উপরে পড়িয়াছে; মিহি কাদায় সেই সকল পশু পক্ষীর পা এবং সেই সকল পাতার অতি চমৎকার ছাঁচ রহিয়াছে। এর মধ্যে যদি দু এক ফোটা বৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকটী ফোটার দাগ রহিয়াছে। একবার শুকাইতে পারিলেই এই সকল দাগ ও ছাঁচ চিরস্থায়ী হইয়া রহিল। পূর্ণিমার সময় ইহার উপর আবার এক স্তর পলি পড়িবে, কিন্তু সে পলিতে এই সকল দাগের কোন অনিষ্ট হইবে না। প্রতিদিন সকালে অনেক ঘরের মেজেতে মাটির লেপ দেওয়া হয়। এই সকল লেপের স্তর একটীর সঙ্গে আর একটী মিশিয়া যায় না। পুস্তকের পাতের মত তাহারা পৃথক পৃথক থাকে। পলি পড়ার সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। এক স্তর পলি যদি শুকাইতে পাইল, তবে আর একস্তর পলি তাহার উপরে পড়িলেও দুটী স্তর পৃথক পৃথক থাকিবে।

ক্রমশঃ।

অপূর্ব্ব বীরত্ব।



তি প্রাচীন কালীন গ্রীস দেশের বিবরণ পাঠ করিলে স্বার্থত্যাগের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাহার এক একটী এমন সুন্দর যে, অপার্থিব বলিয়া মনে হয়। তন্মধ্য হইতে আজ আমরা একটী চিত্রের কথঞ্চিৎ আভাস দিব।

থিব দেশের রাজা যৌবনকালে অতিশয় দুর্দ্দান্ত এবং দুশ্চরিত্র ছিলেন। তজ্জন্য প্রজাগণ তাঁহার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার চক্ষু দুটী হারাইয়াছিলেন। তখন সুবিধা পাইয়া প্রজাগণ পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য, বৃদ্ধ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। কনিষ্ঠ রাজপুত্র ইটিওকল্স্ পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইল।

অন্ধ রাজা তাড়িত হইয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। এই অসময়ে তাঁহার দুহিতা এণ্টিগণি পিতৃভক্তির চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছিল। এণ্টিগণি অনায়াসে ভ্রাতার নিকট রাজসুখে অবস্থান করিতে পারিত, কিন্তু তাহার হৃদয় পিতার জন্য ব্যাকুল হইল,—সে রাজসুখ অবহেলা করিয়া পিতার অনুসরণ করিল। পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ স্নেহের আধার পিতা, তাঁহার দুঃখ কি সন্তানের প্রাণে সহ্য হয়? এণ্টিগণি পিতার সান্ত্বনার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিল। পিতার সহিত দেশে দেশে ভিক্ষাজীবী হইয়া বেড়াইতে লাগিল। কন্যার পবিত্র স্নেহে বৃদ্ধ রাজা গভীর দুঃখের মধ্যেও সুখ পাইয়াছিলেন।

এণ্টিগণি পিতার সহিত অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বর্গের কিরণ তাহার হৃদয়কে অধিকতর পবিত্র ও সুন্দর করিয়াছিল, ইহা নিশ্চয়।

পিতা ও কন্যা দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া কোন প্রকারে প্রাণধারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা এটিকা দেশে গিয়া একটী রমণীয় স্থানে আশ্রয় পাইলেন। এথেন্স দেশের রাজা সদয় হইয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় অধিকারে আশ্রয় দিলেন। এই সময় এণ্টিগণির কনিষ্ঠা ভগিনীও আসিয়া তাঁহাদের সহিত বাস করিতে লাগিল।

এ দিকে থিবদেশের রাজা ইটিওকল্‌স্‌ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পলিনাইসেস্‌কে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ন্যায়ানুসারে থিবসিংহাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই প্রাপ্য। সুতরাং পলিনাইসেস্‌ ভ্রাতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া, রাজ্য উদ্ধারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। সে অনেক চেষ্টার পর, একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, পিতা ও ভগিনীদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য এটিকা দেশে গমন করিল। বিদায়ের কালে ভগিনীদের এই অনুরোধ করিল যে, যদি সে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, তবে যেন তাহারা তাহার দেহ সমাধিস্থ করে। প্রাচীন কালে গ্রীসদেশীয়দের এই সংস্কার ছিল যে, মৃতদেহের সমাধি না হইলে, সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না ;—একটী কৃষ্ণবর্ণ নদীর তীরে অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, পরলোকে প্রবেশ করিতে পারে না। বীরহৃদয়া এণ্টিগণি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতার নিকট প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইল। ভ্রাতা তখন নিশ্চিন্ত হৃদয়ে যুদ্ধার্থ গমন করিল।

ইহার কিছুকাল পরে, অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে বৃদ্ধ অন্ধ রাজার মৃত্যু হইল। তিনি পৃথিবীতে অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, এক্ষণে অমরধামে গমন করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। কিন্তু কন্যাদ্বয়কে শোকসাগরে ভাসাইয়া গেলেন। পিতার ন্যায় এমন আশ্রয় পৃথিবীতে আর কি আছে? সেই স্নেহের স্থান শূন্য হইলে, সন্তানের কত কষ্ট হয়! সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সেই স্নেহের উৎস শুষ্ক হয় না, সন্তানের প্রাণে অমৃত বর্ষণ করে। অতুল স্নেহময় পিতাকে হারাইয়া কন্যাদ্বয় শৈশবের ক্রীড়াভূমি সেই থিবদেশে প্রত্যাগমন করিল। সময়ে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যথায় পিতৃক্রোড়ে আনন্দময় বাল্য অতিবাহিত করিয়াছে, এক্ষণে তথায় পিতৃহীনা হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইল! তাহাদের হৃদয় এক্ষণে শোকভরে অবসন্ন।

এ দিকে থিবদেশে তখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় ভ্রাতাই প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। তখন তাহাদের পিতৃব্য ক্রীয়ন থিবদেশের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইল। ক্রীয়ন কনিষ্ঠ রাজপুত্রের পক্ষপাতী, সুতরাং সমাদর পূর্ব্বক যথারীতি তাহার শরীর সমাধিস্থ করিল। আর শৃগাল কুক্কুর পরিবেষ্টিত ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে পলিনাইসেসের শরীর অনাবৃত ফেলিয়া রাখিতে অনুমতি করিল। ক্রীয়ন চারিদিকে এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল যে, যদি কেহ মৃত পলিনাইসেসের শরীর সমাধিস্থ করিতে প্রয়াস পায়, তবে তাহাকে রাজবিদ্রোহীরূপে পরিগণিত করা হইবে। এই ভয়ে কেহ সে কার্য্যে অগ্রসর হইল না।

এই সময় এণ্টিগণির বীরহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া গেল। পবিত্র স্নেহে পূর্ণ হইলে রমণী হৃদয় কতদূর বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্যই বুঝি পরমেশ্বর এণ্টিগণির সৃষ্টি করিয়াছিলেন! ভ্রাতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া এবং বিশ্বদেবের আশীর্ব্বাদ মস্তকে

লইয়া, এণ্টিগণি ভ্রাতার শরীর সমাধিস্থ করিতে অগ্রসর হইল। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী কিছু ভীরু-স্বভাবা ছিল, সে অনেক যুক্তি এবং ভয় প্রদর্শন করিয়া এই অসম সাহসিক কার্য্য হইতে এণ্টিগণিকে বিরত করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু এণ্টিগণির চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হইল না। সে একমাত্র উত্তর এই করিল যে,—"এই গৌরবের মৃত্যু হইতে আমাকে বিরত করিতে পারে, এমন দুঃসহ কষ্ট পৃথিবীতে কিছু নাই।"

বাল্যের ক্রীড়াসহচর স্নেহবান্ ভ্রাতা মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তাহার পবিত্র মৃতদেহ শৃগাল কুক্কুরে স্পর্শ করিবে, ইহা কি ভগিনীর প্রাণে সহ্য হয়? এণ্টিগণি গভীর রজনীতে একাকিনী সেই হিংস্রজন্তু পরিবেষ্টিত ভয়সঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। ভ্রাতার মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া অবারিত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। নিস্তব্ধ নিশীথে তাহার করুণ শোকোচ্ছ্বাস কেহ দেখিতে পাইল না, শুধু অনন্ত স্নেহময়ী বিশ্বজননী তাহা শ্রবণ করিলেন এবং তাহার সেই অশ্রুজলের সহিত স্বর্গের কিরণ মিশ্রিত করিয়া দিলেন। তাহার হৃদয় দ্বিগুণতর বলীয়ান হইল। এণ্টিগণি শোকপূর্ণ হৃদয়ে ভ্রাতৃদেহ মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিল।

পর দিবস ক্রূর-প্রকৃতি ক্রীয়ন সর্ব্ব বিবরণ অবগত হইয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইল। পুনরায় সেই মৃতদেহ মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া অনাবৃত ফেলিয়া রাখিতে আদেশ করিল। রজনীতে তথায় একজন রক্ষক নিযুক্ত করিল। আবার সে রাত্রিতে এণ্টিগণি করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে শ্মশানভূমি সদৃশ সমরভূমিতে আগমন করিল। পুনরায় ভ্রাতার পবিত্র মৃতদেহের উপর স্বহস্তে মৃত্তিকারাশি চাপাইয়া দিল, এবং রীতিমত তাহা সমাধিস্থ করিল। কিন্তু এবার আর এণ্টিগণি নিস্তার পাইল না। তথাকার রক্ষক তাহাকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ ক্রীয়নের নিকট লইয়া চলিল। কিন্তু এণ্টিগণির হৃদয়ে ভয় নাই, দুঃখ নাই। ভ্রাতার জন্য জীবন যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? অসঙ্কুচিত হৃদয়ে পিতৃব্যের নিকট নিজ কার্য্য স্বীকার করিয়া ভ্রাতার শরীর ভিক্ষা চাহিল। নিষ্ঠুর ক্রীয়নের মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, সে এণ্টিগণির প্রাণ-নাশের আদেশ করিল। কনিষ্ঠা ভগিনী পিতৃব্যকে এণ্টিগণির জন্য অনেক অনুনয় করিতে লাগিল; কিন্তু নৃশংস ক্রীয়নের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল না। এণ্টিগণির প্রাণ গ্রহণার্থ সমুদয় আয়োজন হইল। এণ্টিগণি নির্ভয় হৃদয়ে বধ্য-ভূমিতে গমন করিল; হৃদয়ে অতুল গরিমা, বদন মণ্ডলে বুঝি স্বর্গের জ্যোতিঃ পড়িয়াছে,—তাই এমন পবিত্র, এমন সুন্দর!

"আবার সেই অমৃতময় স্বর্গধামে হৃদয়ের পূজনীয় জনক জননী এবং প্রিয়তম ভ্রাতার সহিত মিলিত হইব, মনে করিয়া আমার আনন্দ হইতেছে"—এই কথা বলিতে বলিতে প্রসন্ন বদনে এণ্টিগণি নিজ জীবন উৎসর্গ করিল!

সংসারে শোকভারাক্রান্ত মানবের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল এই,—আবার সেই অনন্তধামে গিয়া মিলিত হইব। এখানে প্রাণের প্রিয়জনকে হারাইয়া মানব এই আশায় জীবন রাখে যে, আবার সেই স্বর্গলোকে গিয়া বিশ্বদেবের অমৃতময় ক্রোড়ে তাহার সহিত মিলিত হইব।—নতুবা এত দুঃখ শোক মানব সহিতে পারিত না।



খুকু!

আয়রে খুকু, নেচে নেচে, মায়ের কাছে আয়।
দেখ্‌লে তোর অই, সোণার আনন, নয়ন ভুলে যায়॥
চাঁদের দেশে, ছিলি তুইরে, চাঁদের সুধা পিয়ে।
তাই বুঝি তোর, চাঁদ পানা মুখ, আকুল করে হিয়ে?
তাই বুঝি চাঁদ দেখ্‌তে পেলে, হাত দু'খানি তুলি।
আয় চাঁদ আয়, বলে ডাকিস, খেলা ধূলি ভুলি!!
অথবা তুই, ছিলি বুঝি, আকাশের তারা।
মর্ত্ত্য ধামে, চলে এলি, হয়ে পথ হারা॥
তারার মতন, নয়ন দুটি, তারার মত মুখ।
তারার যেমন, স্নিগ্ধ কিরণ, তেমন তোর সুখ॥
যুঁই ফুলটি, আনিয়েছি, দিবরে সাজিয়ে।
নাচ একবার, সোণার খুকু, দু বাহু তুলিয়ে॥
নাচ একবার, খুকু তুলি, হাসির লহর।
উথলিয়ে, উঠুক আমার, আনন্দ সাগর॥

কোথা হ'তে, এলি তুইরে, কনক কিরণ।
লয়ে চল যাই, দেখি সেই, আনন্দ কানন॥
সে দেশে কি, সবাই শিশু, সদাই হাসির খেলা?
সে দেশে কি, সরলতার, পবিত্রতার মেলা?
দূর করে দে, এ আঁধার মোর, বিষম ঘুমের ঘোর।
আলো দে, এ ভাঙ্গা ঘরে, দে আনন্দ তোর॥

আয়রে খুকু, নেচে নেচে,
মায়ের কাছে আয়।
দেখ্‌লে তোর অই, নলিন-নয়ন,
নয়ন ভুলে যায়॥



মহাভারতের গল্প।

শ্রীবৎস উপাখ্যান।

(১)

পুরাকালে প্রাগ্‌দেশে শ্রীবৎস নামে এক প্রজা-বৎসল নরপতি রাজত্ব করিতেন। শৌর্য্যে বীর্য্যে, গুণে গৌরবে, দয়া দাক্ষিণ্যে তিনি ভারতের তৎসাময়িক নরপতিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার যশঃ সৌরভ সুরলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। চিত্রসেন রাজার কন্যা চিন্তাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামী যেরূপ রূপবান, গুণবান ও ধার্ম্মিক ছিলেন, পত্নীও তদ্রূপ রূপবতী, গুণবতী ও ধর্ম্মশীলা ছিলেন;—তাঁহাদের উভয়ের মিলনে মণি কাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল। রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীবৎসের সুশাসনে প্রজাগণ সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিত। কিন্তু চিরদিন কাহার সমানে যায় না,—মহারাজ শ্রীবৎসেরও তাই ঘটিল।

লক্ষ্মী এবং শনি, ইহাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহা লইয়া একদা উভয়ের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। এই বিবাদ মীমাংসার জন্য শ্রীবৎস রাজাকে মধ্যস্থ মানা হইল। নরপতি যখন স্নান করিতে যাইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মী আর শনি বিচারপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৎস তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের বিবাদের বিচার নিয়া মহারাজা বিষম দায়ে পড়িলেন;—কারণ, একজনকে তুষ্ট করিলেই অপরে রুষ্ট হইবেন। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তিনি ইহার সদুত্তর প্রদান করিবেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে পরদিন আসিতে বলিয়া দিলেন। অতঃপর রাজা স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া, রাণীর নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। রাণী চিন্তা, শনি ও লক্ষ্মীর বিবাদের কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন,—এতদিনে তাঁহাদের কপাল ভাঙ্গিল মনে করিয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীবৎস ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া নিজে অবিচলিত রহিলেন এবং রাণীকে নানারূপে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

ভাবনা চিন্তায় সেই দিবস কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে রাজা সভা করিয়া, অনেক বিচারের পর মন্ত্রণা করিয়া এই ঠিক করিলেন যে, কে বড় কে ছোট তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে না,—কৌশলে উত্তর দেওয়া হইবে। রাজ প্রাসাদের এক গৃহে দক্ষিণ দিকে স্বর্ণছত্র শোভিত স্বর্ণসিংহাসন, বাম দিকে রৌপ্যছত্র শোভিত রৌপ্যসিংহাসন স্থাপিত হইল;—মধ্যস্থলে রাজার আসন রক্ষিত হইল। লক্ষ্মী আর শনি তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। মহারাজা দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক করপুটে তাঁহাদের স্তব স্তুতি আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মী তাঁহার স্তুতিবাদে তুষ্ট হইয়া স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন,—শনি রৌপ্যসিংহাসনে উপবেশন করিলেন,—শ্রীবৎস আপন আসনে বসিলেন। তখন কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বদিনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"আসন ছত্রেতে বিধি বুঝে লহ মনে।
বামে বসে সাধারণ, প্রধান দক্ষিণে॥"

এই কথা শুনিয়া শনি অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া উঠিয়া গেলেন,—লক্ষ্মী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজার গৃহে অচলা হইয়া থাকিবেন বলিয়া বর দিয়া বিদায়

হইলেন। শনি রুষ্ট হইয়া চলিয়া যাওয়াতে, রাজা ও রাণী প্রতি মূহূর্ত্তে কোন না কোন বিপদ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। রাজা কোন্ দিন কোন্ অনাচার করিবেন, এবং সেই সূত্রে তিনি তাঁহার দেহে প্রবেশ করিবেন—শনি সর্ব্বদা তাহারই অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। একদিন রাজা না জানিয়া কুকুরে মুখ দেওয়া জলে স্নান করেন, এবং সেই সূত্রে শনি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন।

শনির আশ্রয়ে রাজার বুদ্ধি ভ্রংস হইতে লাগিল,—রাজ্যে বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি উপস্থিত হইল; শ্রীবৎসের সোণার রাজ্য ছারে খারে যাইতে লাগিল। প্রজাগণের কষ্ট ও দুর্গতি দেখিয়া রাজা ও রাণী মনে বড় ক্লেশ পাইতে লাগিলেন—রাজ্য ও রাজ-সংসারের হতশ্রী দেখিয়া তাঁহারা বিষণ্ণ হইলেন। ধর্ম্মরত নৃপতি পদে পদে বুদ্ধিভ্রষ্টের পরিচয় দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেন না। তাঁহার জন্যই রাজ্যের এরূপ অমঙ্গল হইতেছে দেখিয়া, তিনি স্বয়ং বনবাসী হইতে সংকল্প করিলেন; এবং রাণী চিন্তার নিকট এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে পিতৃ-ভবনে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সতী নারী পতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কিরূপে? তাই তিনি বলিলেন—

"পিতৃ-গৃহে যাইবার সময় এ নয়।
হাসিবেক শত্রুগণ যে দুঃখ না সয়॥
দুঃখের সময় তব থাকিব সংহতি।
যা হবে তোমার গতি আমার সে গতি॥
তব সঙ্গে থাকিয়া সেবিব তব পদ।
আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ॥
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলায়।
উভয়ে যে স্থানে থাকে তথা সুখ পায়॥
শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবে।
চিন্তারে সমর্পি চিন্তা দুঃখিত পাইবে॥"

রাজা অগত্যা চিন্তাদেবীকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন। রাণী রাজার পরামর্শে কতকগুলি হীরা, মণি, স্বর্ণ, মুক্তা জড়াইয়া এক পুটলি বাঁধিলেন; এবং লোকে সন্দেহ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে এক কাঁথা দ্বারা তাহা বেষ্টন করিলেন। সব ঠিক ঠাক করিয়া এক রাত্রিতে রাজা ও রাণী পদব্রজে ঘরের বাহির হইলেন। উভয়ে পুটলি মাথায় করিয়া লইয়া চলিলেন। পুরীত্যাগকালে লক্ষ্মী আসিয়া এই বলিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"যথায় থাকিবা তথা করিব গমন।
কায়ার সহিত ছায়া মিলন যেমন॥
কিছুকাল দুঃখ তুমি গ্রহতে পাইবা।
পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে ঈশ্বর হইবা॥"

স্বামী স্ত্রী দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন—কিন্তু রাজ সুখে পরিবর্দ্ধিতা রাজরাণী কতক দূর যাইয়াই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন,—চরণ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। তথাপি স্বামীর উপর ভর দিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন,—রাণীর ক্লেশে রাজার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এক নদী দেখিতে পাইলেন। সেই নদী কিরূপে পার হইবেন, উভয়ে তাহা ভাবিয়া অধীর হইলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে একখানা নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইলেন। নদী পার করিয়া দেওয়ার জন্য, তাঁহারা তাহাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। তাহার নিকট আপনাদের পরিচয় প্রদান করিলে, নাবিক তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিতে সম্মত হইল;—কিন্তু তাহার ভগ্ন তরীতে তাঁহাদের দুজনের ও সঙ্গীয় পুটলির ভার সহিবে না বলিয়া সে আপত্তি করিল;—হয় পুটলি, না হয় রাণীকে আগে পার করিতে হইবে। আগে পুটলি পার করাই ঠিক করিয়া, রাজা ও রাণী ধরাধরি করিয়া তাহা

নৌকায় তুলিয়া দিলেন। নৌকা বাহিয়া চলিল,—কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই নদী শুকাইয়া গেল, নাবিক পুটলিসহ অন্তর্হিত হইল। তখন তাঁহারা ইহা শনির ছলনা বুঝিতে পারিলেন। রাণী ধনরত্ন হারাইয়া ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন,—রাজা নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আস্তে আস্তে তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। অবশেষে তাঁহারা চিত্রধ্বজ নামক বনে উপনীত হইলেন। তথাকার সরোবরের রমণীয় জলে স্নান, আহ্নিক ও দেবার্চ্চনা সম্পন্ন করিয়া ফলমূল ভক্ষণে উভয়ে ক্ষুধা নিবারণ করিলেন, এবং ফলমূল ভক্ষণ করিয়াই সেই বনে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন কয়েকজন ধীবর সরোবরে মাছ ধরিতে আসিল,—রাজা তাহাদের নিকট হইতে একটী শকুল (শোল) মৎস্য চাহিয়া লইলেন। মাছটী আনিয়া পুড়িয়া দেওয়ার জন্য রাণীর নিকট দিলেন। যাঁহার আহারের জন্য প্রতিদিন কত সুখাদ্য প্রস্তুত হইত, আজ তাঁহাকে কিরূপে মৎস্য পোড়া খাইতে দিবেন ভাবিয়া, রাণী খেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পোড়া শোল মাছ খাইলে শনি গ্রহের প্রকোপ কমে বলিয়া, রাণী মাছ পোড়াইতে বসিলেন। মাছ পোড়া শেষ হইলে, পুকুরের জলে তাহা পরিস্কার করিতে লইয়া গেলেন। যেই জলে পোড়া মাছ ধুইতে লাগিলেন, আর অমনি সেই পোড়া মাছ জীয়ন্ত হইয়া ছুটিয়া গেল! রাণী এই অস্বাভাবিক ঘটনা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা ইহাও শনির চাতুরী বলিয়া রাণীকে প্রবোধ দিলেন। তখন শনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাঁহাকে অবমাননার জন্য তাঁহাদিগকে এরূপ বিড়ম্বিত করিতেছেন বলিয়া শাসাইলেন, তাঁহাদের উভয়েতে বিচ্ছেদ ঘটাইবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজা শনির কথা শুনিয়া শঙ্কিত-হৃদয়ে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া ক্রমাগত ৫ বৎসর কাল বনবাসে কাটাইলেন। কিন্তু সেই বনের ফলমূল ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া, তাঁহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন।

তৎপর তাঁহারা নিকটবর্ত্তী এক নগরে উপনীত হইলেন। নগরের উত্তর ভাগে যত ধনীদের বাস ছিল, তাঁহারা দক্ষিণ ভাগে গরীব কাঠুরিয়াদের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। কাঠুরিয়া রমণীগণ রাণী চিন্তার সদ্ব্যবহারে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত সখীভাবে চলিতে লাগিল, রাজা কাঠুরিয়াদের সহিত বনে যাইয়া চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা বিক্রয় করিয়া স্বামী স্ত্রীতে সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন সেই নগরের নিকট এক সওদাগরের বাণিজ্য নৌকা নদীর চরাতে আটকিয়া গেল। বণিক বহু আয়াস করিয়াও নৌকা নামাইতে পারিল না। এই সময় শনি এক গণৎকারের বেশ ধরিয়া মহাজনের নিকট উপস্থিত হইলেন। "নগরে কাঠুরিয়া পাড়াতে এক সতী আছে, সে যদি আসিয়া নৌকা স্পর্শ করে, তবেই তোমার নৌকা নাগিবে"—সওদাগরকে এই কথা বলিয়া গণক চলিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে সওদাগর কাঠুরিয়া স্ত্রীদিগকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া নৌকা স্পর্শ করিতে আনাইল,—কিন্তু রাজার নিষেধে চিন্তা আসিলেন না। কাঠুরিয়া রমণীগণের সকলে একে একে নৌকা স্পর্শ করিল—কিন্তু চরা হইতে নৌকা এক তিলও নড়িল না। তখন তাহাদিগকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়া বিদায় করিল, এবং পাড়ার আর কোন রমণী আসিতে বাকি আছে কি না, লোকজনদিগকে জিজ্ঞাস করিল। কেবল একটী রমণী কিছুতেই আসিতে রাজি হন নাই শুনিয়া, মহাজন রাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদা কাটি

আরম্ভ করিল,—তখন রাজা জঙ্গলে কাষ্ঠ আহরণে গমন করিয়াছেন। বণিকের কাতর উক্তিতে করুণ-হৃদয়া রাণীর দয়ার উদ্রেক হইল। "তিনি পরোপকার সাধন করিতে,—ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক সওদাগরের নৌকা স্পর্শ করিতে গিয়াছিলেন,"—এ কথা বলিলে স্বামী অবশ্য ক্ষমা করিবেন এই ভাবিয়া সওদাগরের প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন, নৌকা স্পর্শ করিতে চলিলেন। যেই নৌকা স্পর্শ করা, আর অমনি নৌকা ভাসিয়া চলিল। ইহা দেখিয়া সেই দুষ্টমতি বণিক ভাবিল, এই সাধ্বী নারী নৌকাতে থাকিলে আর কোথাও নৌকা চরাতে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাহাকে সঙ্গে করিয়া লওয়া যাউক। এই ভাবিয়া রাণীকে নৌকাতে করিয়া লইয়া চলিল। তখন চিন্তা স্বামী-বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, তজ্জন্য খেদ করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বণিকের নিকট কাকুতি মিনতি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া না দেওয়াতে, পাছে তাঁহার উপর কোনরূপ অত্যাচার হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার রূপ লাবণ্য হরণ করিয়া জরাগ্রস্ত করার জন্য চিন্তা সতী সূর্য্যের স্তব স্তুতি আরম্ভ করিলেন। সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া রাণীর অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। ক্রূরমতি পামর বণিক তাঁহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া নৌকা ভাসাইয়া চলিল।

ক্রমশঃ।



ইতর প্রাণীর বুদ্ধি।

(সত্য ঘটনা।)

সদা সর্ব্বদা ছোট বড় পশুপক্ষী প্রভৃতি যে সমস্ত ইতর প্রাণী আমাদের চক্ষে পড়ে, তাহাদের আচার ব্যবহার, অনুরাগ বিরাগ, ও হিংসা দ্বেষের প্রতি সখার অল্প বয়স্ক পাঠক পাঠিকাদের কেহ কি ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ? দেখিয়া থাকিলে সময় সময় নিশ্চয়ই তোমাদের খুব আশ্চর্য্য বোধ করিতে হইয়াছে। ইতর প্রাণীরা কথা বলিতে পারে না বটে; কিন্তু পরস্পর ইঙ্গিতে ইসারায় কেমন আশ্চর্য্যরূপে ইহারা কথার কাজ সারিয়া লয়। ইহাদের বুদ্ধি কৌশল দেখিয়া সময় সময় অবাক হইতে হয়। পশুর মধ্যে শৃগালের দুষ্টামি, এবং পক্ষীর মধ্যে কাকের নষ্টামি বোধ হয় অনেকেই অবগত আছ। পাড়াগায়ে নিরীহ গৃহস্থদের প্রতি এই দুই মহাত্মা কিরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া থাকেন, অনেকেই বোধ হয় তাহা দেখিয়া থাকিবে। আমাদের ছেলেবেলার অনেক কথার মধ্যে এই শৃগাল ও কাকের দুষ্টামি বুদ্ধির দুইটী ঘটনা মনে পড়িতেছে। সেই দুইটী প্রথমতঃ সখার শিশু পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিয়া কুকুর বিড়াল প্রভৃতি অন্যান্য জন্তু সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

একবার আমাদের বাহির বাড়ীর দালানের একটী কুঠরীতে একটা কুকুরের কতকগুলি ছানা হয়। ঘরটীতে ভালরূপ কপাটাদি ছিল না; এবং কাঠকুটা রাখা ব্যতীত উহার আর কোন ভাল ব্যবহারও ছিল না। ঘরটীর যাহা কিছু সদ্ব্যবহার চামচিকা মহাশয়রাই করিতেন, এবং উহা তাঁহাদেরই একচেটিয়া মহল হইয়া পড়িয়াছিল।

আমাদের বাড়ীর কুকুরটী অসময়ে আর কোন ভাল স্থান না পাইয়া, ঐ ঘরটীতেই আশ্রয় নিয়াছিল। কিছুদিন যাইতে না যাইতে, ছানাগুলির অবিশ্রান্ত চীৎকারে সমস্ত বাড়ী এবং চারিদিকের বন জঙ্গল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শৃগাল কুলের মধ্যেও আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। সেই কুকুরের ছানাগুলির কচি হাড় ও মাংসের আশায়, দুটী একটী করিয়া শৃগাল ক্রমশঃ সেই কুঠরীর কাছ দিয়া সর্ব্বদা আনাগোনা আরম্ভ করিল। কিন্তু ছানাগুলির মায়ের অবিশ্রান্ত যত্ন ও সতর্কতার জন্য শৃগালদের মনোরথ সহজে পূর্ণ হইল না। দু'টী একটী শৃগাল যেমন ঘরটীর কাছে যায়, আর সেই মা কুকুরটীর বিষম তাড়া খাইয়া, লেজ গুটাইয়া তাহাদের পালাইতে হয়। কুকুরের ছানাগুলির উপর শৃগালদের আক্রমণ এবং ছানাগুলির মায়ের তীব্র পাহারা, এই ভাবে চলিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে একদিন নিকটস্থ আর একটী ঘরে বসিয়া আমরা কয়েকজন গল্প করিতেছি। এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, দুইটী শৃগাল জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া, যে ঘরে কুকুরের ছানা ছিল তাহার সম্মুখের দিকে একটী উপস্থিত হইল, এবং অপরটী ঘরের পশ্চাদ্দিকে রহিল। যে শিয়ালটী সাম্নের দিকে গিয়াছিল, সে ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই মা-কুকুরটী তাহার পিছনে পিছনে ভয়ানক তাড়া করিয়া গেল, এবং এই সুযোগে ঘরের পশ্চাৎ হইতে অপরটী আসিয়া একটী ছানা মুখে করিয়া পালাইল। প্রতিদিনই শিয়াল আসে এবং কুকুরের ছানাগুলির মায়ের কাছে তাড়া খাইয়া পালায়। সুতরাং আজও সেইরূপ হইবে মনে করিয়া আমরা বসিয়াছিলাম। কিন্তু আজ যে শৃগাল দু'টী ছানা নিবার জন্য এত বুদ্ধি খাটাইয়া এরূপ ফন্দী করিয়া আসিয়াছে, তাহা আমাদের একটুও সন্দেহ হয় নাই। আহা! হতভাগিনী মা শৃগাল তাড়া করিয়া ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিল যে, তাহার একটী ছানা নাই, তখন কতই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিছুদিনের মধ্যে সেই দুরাচার শৃগালদ্বয় নানা ফিকিরে একে একে বেচারীর সমস্ত ছানাগুলিই খাইয়া ফেলিল। শৃগালের এইরূপ দুষ্টামি বুদ্ধি সচরাচর আরও অনেক দেখিত পাওয়া যায়।

কাকের নষ্টামির কথা যে বলিতেছিলাম, তাহা আরও কৌতুকজনক। এমনি আমটী, জামটী, কলাটী, সন্দেশটী যে ইহারা নিমেষ মধ্যে সুকৌশলে ছো মারিয়া লইয়া যায়, তাহা ত সদা সর্ব্বদাই সকলে দেখিয়া থাক, এবং অনেকে বোধ হয় সে দৌরাত্ম্যের ভুক্তভোগীও আছ। যে ঘটনার কথা বলিতেছি, এ সেরূপ নহে। আমাদের কোন বন্ধুর একটী কুকুর ছিল। কুকুরটী একটু ভাল জাতের, অর্থাৎ যে সব কুকুরকে সাধারণতঃ আমরা বিলাতী কুকুর বলিয়া থাকি, সেই রকমের। আমাদের বন্ধু তাহার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিতেন। প্রতিদিনই কুকুরটীর জন্য একটু আধটু মাংসের ব্যবস্থা ছিল। এক দিবস আমরা অনেকেই আমাদের সেই বন্ধুর বাড়ীর দরদালানে বসিয়া নানারূপ গল্প করিতেছি, এবং আমাদের বন্ধুর সেই কুকুরটী সম্মুখে উঠানে বসিয়া একখানা পাঁঠার ঠ্যাঙের রসাস্বাদনে রত আছে,—এমন সময় কতকগুলি কাক আসিয়া কুকুটীর পিছনে লাগিল। কাকগুলির চেষ্টা, কি করিয়া সেই পাঁঠার ঠ্যাঙখানি কুকুটীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে; কিন্তু কিছুতেই তাহারা তাহা পারিয়া উঠিতেছে না। এক একবার যেমন তাহারা কুকুরটীর সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, আর কুকুরটী রাগে ভেউ ভেউ

করিয়া কামড়াইতে যাইতেই, উড়িয়া পালাইতেছে। অনেক চেষ্টার পর কিছুতে আর না পারিয়া কাকগুলি খানিকটা দূরে একটী বৃক্ষের উপর গিয়া জড় হইল। আমাদের সকলেই কাক ও কুকুরের ঐ ব্যাপার দেখিতেছিলাম। কাকগুলিকে বৃক্ষের উপর গিয়া একত্র জড় হইতে দেখিয়া আমাদের মধ্যে একজন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দেখেছ, বেটারা হেরে গিয়ে আবার কি পরামর্শ আঁট্‌ছে।" তখন সে কথা নিতান্ত হাস্যজনক বোধ হইলেও কিছুক্ষণ পরেই সে অনুমানটী ঠিক বলিয়া প্রকাশ পাইল।

এবারে কাকগুলি দুইদল হইয়া, একদল আসিয়া কুকুরটীর সম্মুখের দিকে উড়িয়া পড়িল, আর এক দল পিছনের দিকে পড়িল। সাম্নের দল প্রথমতঃ কুকুরটীকে পূর্ব্বের ন্যায় খোঁচাইয়া তুলিল। ঠ্যাঙ খানি নেবার জন্য তাহারা যেমন অগ্রসর হয়, কুকুরটী রাগিয়া খেউ খেউ করিয়া কামড়াইতে ওঠে, আর তাহারাও তখনই পালাইয়া আসে। কিন্তু এবার শুধু খেলা নহে। এবার কাকগুলি মতলব আঁটিয়া আসিয়াছে। একটু পরেই দেখিলাম যে, কুকুরের পিছনের দলের দুটী কি তিনটী খুব আস্তে আস্তে অলক্ষিত ভাবে গিয়া কুকুরের লেজে ঠোঁট দিয়া এমন ঠোকর মারিল যে, কুকুরটী দারুণ ব্যথায় এবং রাগে পশ্চাৎ ফিরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কামড়াইবার জন্য তাড়া করিল। পাঁঠার ঠ্যাঙখানি সে সম্মুখে রাখিয়া খাইতেছিল; সুতরাং এবার উহা ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতের কাকগুলিকে তাড়া করাতে, সম্মুখের কাকের দল ঠ্যাঙ লইয়া উড়িয়া পালাইল। কুকুরটী মুখ ফিরাইয়া ঐ ঠ্যাঙ না পাইয়া ভেউ ভেউ খেউ খেউ করিয়া কাণে তালা লাগাইল। ওদিকে কাকের দল উপরে উড়িতে উড়িতে কঃ-কঃ করিয়া ডাকিয়া যেন তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল। ঠাট্টা করুক আর নাই করুক, কুকুরটী কিন্তু সেই কঃ-কঃ ধ্বনিতে পাগল-প্রায় হইয়া উঠিল। তখন আমাদের বন্ধু গিয়া আর একখানি ঠ্যাঙ দিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলে হাসিতে হাসিতে মরি। শৃগাল ও কুকুরের এ দুইটী চাতুরীই এক রকমের। কিন্তু এ ধূর্ত্তামির কাছে মানুষের অনেক সময় পরাস্ত হইতে হয়। এখন বিড়াল কুকুরের কথা কিছু বলিব।

বিড়াল কেবল মাচ খাইবার যম বলিয়াই আমরা জানি। গুণ ইহাদের এই যে, কখনও কখনও দুই একটা ইন্দুর মারে;—সেও সব বিড়াল না। কিন্তু ইহারা যে সময় সময় প্রতিপালকের প্রাণ রক্ষা করিতে পারে এবং চোর ডাকাত তাড়াইতে পারে, তাহা বোধ হয় এ দেশে কেহই কখনও দেখেও নাই—শোনেও নাই। কিছুদিন হইল এক খানি বিলাতী সংবাদপত্রে বিড়ালের আশ্চর্য্য বুদ্ধি সম্বন্ধে কতকগুলি সত্য ঘটনা পাঠ করিয়াছিলাম। আজ তাহারই দুই একটীর কথা সখার পাঠক পাঠিকাগণকে বলিব।

বিলাতের কোন এক বাটীতে টপ্‌সি নামে একটী সুন্দর পালিত বিড়াল ছিল। বাড়ীর গৃহিণীর কোন সন্তানাদি ছিল না বলিয়া টপ্‌সিকে আপনার সন্তানের মত লালন পালন করিতেন। টপ্‌সিও তাঁহাকে মায়ের মতই দেখিত; একদণ্ডের তরেও কাছ ছাড়া হইত না। বাড়ীর কর্ত্তাটীর স্বভাব বড় মন্দ ছিল। সর্ব্বদা মদ খাইয়া মাতলামী করিতেন, এবং স্ত্রীর উপর বড়ই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। এক দিন তিনি ভয়ানক মাতাল হইয়া আসিয়া গৃহিণীর সঙ্গে অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন, এবং শেষে কথায় কথায় রাগান্ধ হইয়া স্ত্রীকে লাথি দিয়া ভূতলে ফেলিয়া হতভাগিনীকে গলা টিপিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। টপ্‌সি

তাহার মাতার এইরূপ বিপদ কালে আর কোন উপায় না দেখিয়া, তীব্রবেগে গিয়া তাহার তীক্ষ্ণ নখপংক্তিদ্বারা সেই মাতাল গৃহস্বামীর পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক আঁচড় মারিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গৃহস্বামী স্ত্রীকে ছাড়িয়া টপ্‌সিকে মারিতে ধাইলেন। টপ্‌সি পালাইল, এবং এদিকে গৃহিণীও নিষ্ঠুর স্বামীর হাত এড়াইয়া এক ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিলেন।



বিড়ালের চোর তাড়ানের ঘটনাটীও কম আশ্চর্য্যজনক নহে।

রাত্রিকালে ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া এক বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিতেছিল। গৃহস্থেরা সকলেই ঘুমে অচেতন ছিল। চোর গৃহে একবার প্রবেশ করিতে পারিলেই গৃহস্থকে স্বর্বস্বান্ত করিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু চোর যেমন জানালার মধ্য দিয়া প্রথম মাথা ঢুকাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, সেই বাড়ীর একটী পালিত বিড়াল গিয়া তাহার তীক্ষ্ণ নখাগ্র দ্বারা চোরের মুখে এমন থাবা মারিল যে, সেই আঘাতের বিষম যন্ত্রণায় গৃহ প্রবেশের চেষ্টায় আপাততঃ চোরকে নিরস্ত হইতে হইল। এদিকে সেই বিড়ালটীর চীৎকারে গৃহস্থদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং চোরেরও প্রাণ নিয়া পালাইতে হইল। সেই রাত্রিতেই সে চোর স্থানান্তরে ধরা পড়িয়াছিল; এবং তাহার মুখের আঁচড়ের দাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন হওয়াতে পুলিসের কাছে বিড়ালের সেই আক্রমণের কথা সে স্বীকার করিয়াছিল। বিড়ালের এরূপ বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আছে। কিন্তু তাহার সকলগুলি বলিবার স্থান আমাদের নাই।

কুক্কুর প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের বুদ্ধি যেমন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, বিশ্বাস এবং ভক্তিও তেমনি অত্যন্ত প্রগাঢ়। মানুষের বুদ্ধিতে যাহা কুলায় না, সময় সময় কুকুর তাহাও অনায়াসে করিয়া ফেলে। কুকুর বিপদ আপদে বড় উপকারী বন্ধু। এ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা আমরা জানি। বারান্তরে সখার পাঠক পাঠিকাদিগকে আমরা তাহার কিছু কিছু উপহার দিব।



অজিত কুমার।

সপ্তম অধ্যায়।

(১১৮ পৃষ্ঠার পর।)


সন্ধ্যা হইয়াছে। খনকেরা কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অজিতকুমার সেই স্থানে সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময়ে অরুণ আসিয়া বলিল,—"দাদা, বাড়ী যাইবে না?" এতক্ষণে অরুণের জ্ঞান হইল। রৌপ্যের খনির কথা, ইনেস্পেক্টরের ভৎর্সনা তাহার মনে আসিল। অজিত কহিল,—"তুমি আগে যাও। আমি একটু পরে আসিতেছি।"

অজিত আবার গলিতে গলিতে খুঁজিতে লাগিল। অনেক অন্বেষণের পর দেখিল, একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া ভিতর হইতে আলোক আসিতেছে। অজিতের সন্দেহ হইল, সেই ছিদ্রের ভিতরে মস্তক প্রবেশ করাইয়া দেখিতে লাগিল; দেখিল, সেই রূপার খনি দীপালোকে ঝকমক করিতেছে। অজিত চীৎকার করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু এমন সময়ে সভয়ে দেখিল, ৪ জন বিকটাকার লোক ভিতরে রূপা কুড়াইতেছে। অজিত আরও দেখিল, সেই ৪ জনের মধ্যে তাহাদিগের উপকারক ও পরম বন্ধু গণেশ রহিয়াছে। অজিতের বিশ্বাস হইল না; মনে হইল, তাহার দেখিতে ভ্রম হইয়াছে। আবার চাহিল,—আবার সেই গণেশের মুখ উজ্জ্বল দীপালোকে তাহার চক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

এতক্ষণে অজিত সমুদায় রহস্য বুঝিতে পারিল। যখন রূপারখনি দেখিয়া সে ইন্‌স্পেক্টরের বাড়ীতে দৌড়াইয়া যায়, তখন ৪ জন লোক তাহার নিকটে কর্ম্ম করিতেছিল। অজিত বুঝিল, ইহারা সেই ৪ জন লোক। অজিত চলিয়া গেলে, ইহারা পাথরিয়া কয়লার পিণ্ড দ্বারা গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল; তজ্জন্যই অজিত ইন্‌স্পেক্টরের সহিত ফিরিয়া আসিয়া সে গহ্বর বাহির করিতে পারে নাই। এক্ষণে খনির সমস্ত লোক চলিয়া যাওয়ায় ইহারা গোপনে গহ্বর হইতে রূপা কুড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

অজিতের মহা ভাবনা উপস্থিত। অজিত কি করিবে এক্ষণে তাহাই ভাবিতে লাগিল। যদি ঐ ৪ জন লোককে জিজ্ঞাসা করে, কেন তাহারা তাহার রূপারখনি গোপন করিয়াছিল—এবং কেনই বা এমন গোপনে খনি হইতে রূপা কুড়াইয়া লইতেছে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগের দুষ্কর্ম্ম প্রকাশিত হইবার ভয়ে অজিতকে মারিয়া ফেলিবে। আর যদি অজিত যাইয়া আবার ইন্‌স্পেক্টরকে খবর দেয়, ইন্‌স্পেক্টর হয় ত তাহার কথা বিশ্বাস করিবে না—হয় ত চোরেরা ইহার মধ্যে আবার গহ্বরটী ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং অজিতের এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? অজিত অনেকক্ষণ ভাবিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। দিবসের লজ্জা ও অপমানে তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। তাই অজিত কিছুই অবধারণ করিতে পারিল না। অবশেষে রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিল।

অজিত বাটীতে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সে রাত্রিতে তাহার ঘুম হইল না। রূপার খনির কথা, ইন্‌স্পেক্টরের ভৎর্সনা, গণেশের আচরণ তাহার মনে আসিতে লাগিল। একবার মনে করিল, বাবার কাছে সকল কথা বলি। আবার ভাবিল, আজ বলিব না, কাল একটা যাহা হয় করিয়া তাঁহাকে জানাইব। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি প্রভাত হইল। অজিত অরুণের সঙ্গে আবার খনিতে কাজ করিতে গেল।

অষ্টম অধ্যায়।

কাজ কর্ম্ম সারিয়া খনকেরা বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। খনির সমুদায় অংশ নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। সেই অন্ধকারময় খনির একটী গলিতে অজিতকুমার সেই গহ্বরের প্রবেশ পথে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছে। ভিতরে থাকিয়া থাকিয়া ঠং ঠং শব্দ হইতেছে। আর সেই শব্দে নিস্তব্ধ অন্ধকাররাশি কাঁপিয়া উঠিতেছে। হঠাৎ লণ্ঠনের আলো আসিয়া অজিত কুমারের মুখের উপর পড়িল। অজিত সরিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে সেস্থান হইতে একটী অঙ্গ নাড়িবার পূর্ব্বেই কে আসিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল,—"দুষ্ট বালক, তুমি—তুমি আমাদিগকে ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছ?"

অজিত একটী কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাহারা তাহাকে গহ্বরের মধ্যে টানিয়া লইল। অজিত দেখিল, এ সেই ৪ জন লোক।

গহ্বরের মধ্যে লইয়া তাহারা অজিতকে ছাড়িয়া দিল, এবং নিকটে বসিতে বলিল। অজিত বসিলে কহিল,—"দেখ, তুমি কি আমাদিগকে ধরাইয়া দিতে চাও? সে সংকল্প পরিত্যাগ কর। এ খনির কথা কেহই জানে না। দেখ এখানে কত রৌপ্য রহিয়াছে। আমরা ৫ জনে ইহা ভাগ করিয়া লইব, কেহই জানিতে পারিবে না। দিবসে গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে, কে ইহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে?"

অজিত।—তোমাদিগকে ধরাইয়া দিই বা না দিই, কিন্তু তোমাদিগের কথায় সম্মত হইতে পারিতেছি না। দেখ এ খনি আমাদিগের নহে। যাহারা এই খনির অধিকারী, তাহাদিগের এই খনির জন্য কত টাকা খরচ হইতেছে। তাহারা টাকা খরচ করিয়া সুবিধা না করিলে, আমরা এখানে আসিতে পারিতাম না। অতএব তাহাদিগের যত্ন ও পরিশ্রমের ফল আমরা লইব কেন? আমরা ত খাটুনির জন্য টাকা পাইতেছি।

১ জন চোর।—তোর ধর্ম্ম কথা শুনিতে চাই না। তুই আমাদের কথা মত কাজ করিবি কি না, বল্।

অজিত।—আমি অন্যের জিনিষ কখনই লইব না। বাবা বলিয়াছেন, চুরি করা অত্যন্ত নীচ কাজ।

চোর।—আমাদের কথা না শুনিলে তোর কি হইবে জানিস্?

অজিত।—জানি। তোমরা আমাকে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু তোমাদের কথা শুনিলেও আমি চিরকাল বাঁচিব না। একদিন মরিবই। তবে চুরি করিয়া—পাপ করিয়া মরিব কেন? অধর্ম্ম করিব না। এই জন্য যদি তোমরা মারিয়া ফেল পরমেশ্বর আমাকে মৃত্যুর পর গ্রহণ করিবেন।

"তবে মর" এই বলিয়া একজন চোর তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। আর একজন বলিল,—"রাখ্ না, আগে দেখি জল কতদূর গড়ায়। তার পর যাহা হয়, একটা করিব। আবার তাহারা অজিতকে অনেক প্রলোভন ও ভয় দেখাইল। অজিত বিচলিত হইল না। তখন ৪ জনে গহ্বরের এক কোণে যাইয়া পরমার্শ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিণ্ড দ্বারা গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। অজিত সেই নির্জ্জন খনির অন্ধকারময় গহ্বরে জীবন্ত অবস্থায় সমাহিত হইয়া অনাহারে ও দূষিত বায়ুতে মরিবার জন্য পরিত্যক্ত হইল।

ক্রমশঃ।



অক্টোবর, ১৮৯০।



বিবিধ।

কথনশীল পুতুল।—আমেরিকা মহাদেশে যুক্ত-রাজ্য নামে যে একটী দেশ আছে, তাহা তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ। যুক্তরাজ্যের ন্যায় উন্নতশীল দেশ দু'টী নাই বলিলেই হয়। ইংরেজেরা যাইয়া সেই দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছে—দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা একরূপ লোভ পাইয়াছে। সেই দেশের লোকেরা ইংরেজ হইলেও সভ্যতা, হেকমতি, ধনে জনে প্রায় সকল বিষয়ে ইংলণ্ডের লোকদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে। আজ কাল যত প্রকার হেকমতি কেরামতির কথা শুনা ও দেখা যায়, তার অধিকাংশই যুক্তরাজ্য হইতে আবিষ্কৃত হয়,—সেই দেশকে আজগবির দেশ বলিলেও চলে। এডিসন নামে এক প্রতিভাশালী ব্যক্তি এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে পুতুলে কথা বলে! সেই যন্ত্রের নাম "ফনোগ্রাফিক" যন্ত্র;—আমরা ইহাকে "স্বর-যন্ত্র" নাম দিতে পারি। বড় বড় পুতুলের মধ্যে সেই স্বর-যন্ত্রের কৌশল পূরিয়া দেওয়াতে সেই পুতুল মানুষের ন্যায় কথা বলিতে পারে। তুমি যাহা বলাইতে ইচ্ছা কর, কল টিপিয়া সেই কথাগুলি পুতুলের ভিতর বলিয়া রাখ; পুতুল মানুষের ন্যায় তাহা বলিয়া যাবে! আমেরিকাতে প্রতি বৎসর এই কথনশীল পুতুল হাজার হাজার বিক্রয় হইয়া থাকে। সেই পুতুল প্রস্তুত ও বিক্রীর জন্য এক কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে, সেই কোম্পানি আমাদের দেশেও সেই পুতুলের চালান দিতে সংকল্প করিয়াছে। কিন্তু পুতুলে এখন ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায়ই কথা বলিয়া থাকে। আমাদের দেশের সাধারণের মধ্যে যাহাতে ইহার প্রচলন হয়, সেই উদ্দেশে আমাদের দেশী ভাষা সকলে পুতুলে কথা বলার উপায় অব-লম্বিত হইতেছে। এই যদি হেকমতি না হয়, তবে আর হেকমতি কাহাকে বলে? আর ভাব দেখি, যে এডিসন সাহেব এই যন্ত্রের আবিষ্কারক, তিনি কিরূপ প্রতিভাশালী লোক।

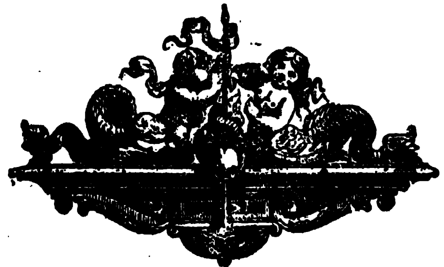
* *
*

নর মাংসভোজী মানুষ।—অসভ্য বর্ব্বর লোকে-রাই নরমাংস খাইয়া থাকে,—আমরা এরূপ কথাই জানি। কিন্তু আমেরিকার সভ্যতম দেশ যুক্ত-রাজ্যের রাজধানী নিউইয়র্ক নগর হইতে খবর আসিয়াছে, একজন লোক তাহার স্ত্রী ও ৫টী সন্তানকে বধ করিয়া তাহাদের আম মাংস খাইতে-ছিল! লিভিংষ্টোন নামক স্থানে কুইন নামে এক

ইংরেজ পরিবার বাস করিত,—পরিবারের লোক-দের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী আর তাহাদের ৫টী সন্তান। ক্রমাগত কয়েক দিন পাড়া প্রতিবেশী ও বন্ধু বান্ধবেরা তাহাদের দেখিতে না পাইয়া একটু বিস্মিত হইল। তাহাদের কয়েক জন একদিন কুইনের বাড়ীতে খোঁজ লইতে গেল। যাইয়া দেখে, কুইন ঘরের এক কোণাতে বসিয়া তাহার একটী সন্তানের একখানা ছিন্ন হাতের কাচা মাংস খাইতেছে,—সন্তানের শরীরটা নিকটে পড়িয়া আছে; স্ত্রীর খণ্ড খণ্ড দেহ ঘরময় ছড়িয়া রহিয়াছে! এই ব্যাপার দেখিয়া প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন নরমাংস-ভোজীর নিকট যাইতে লাগিল। তাহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া সেই রাক্ষস তাহার উপর পড়িল। অপর লোকেরা যাইয়া তখন তাহাকে রাক্ষসের আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিল। পাছে অন্য লোকের উপরও আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় তখন তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইল।

* *
*

সভ্যতার পরিচয়।—বর্ত্তমান যুগে সংবাদপত্র সভ্যতার একটী পরিচায়ক। যে দেশ যত সভ্য, সেই দেশে সংবাদপত্রের প্রচলন তত অধিক। আজ কাল ইউরোপ, আমেরিকাই নাকি সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছে,—আসিয়া, আফ্রিকা নীচে পড়িয়াছে,—তাই সেই দুই মহাদেশের তালিকাটাই বিশেষ ভাবে পাওয়া গিয়াছে। আসিয়া খণ্ডে আরব ও ভারতবর্ষ, এবং আফ্রিকা-খণ্ডে মিসর দেশ এককালে সভ্যতার উচ্চ সোপানে উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বহুদিনের কথা, আজ কাল নহে। তাই তালিকায় এই তিন দেশের কথাটা তোলা হয় নাই। তা দুঃখ করিলে কি হবে, যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাই জানিয়া রাখ; কাজে লাগিতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১ হাজার খানা সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ২৪ হাজারই এক ইউরোপে। ইউরোপের এই ২৪ হাজারের মধ্যে জর্ম্মণিতে ৫ হাজার ৫ শত, ফরাসী দেশে ৪ হাজার ১ শত, ইংলণ্ডে ৪ হাজার, অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারিতে ৩ হাজার ৫ শত, ইটালিতে ১৪ শত, স্পেইনে ৮ শত ৫০ খানা, রুষিয়াতে ৮ শত, সুইজার্লেণ্ডে ৪ শত ৫০ খানা, বেলজিয়াম ও হোলেণ্ডে ৩ শত; আর বাকিগুলি পর্টুগাল, স্কেণ্ডেনেভিয়া, বলকান প্রভৃতি দেশে। কিন্তু আমেরিকা মহাদেশের যুক্ত-রাজ্য সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে, এক সেই দেশেই ১২ হাজার ৫ শত। কানেডা রাজ্যে ৭ শত, অষ্ট্রেলিয়া দেশেও ৭ শত। আসিয়া খণ্ডে সবে ৩ শত খানা কাগজ প্রকাশিত হইয়া থাকে,—তন্মধ্যে সেদিনকার জাপানই নাকি ২ শতের অধিকারী। আফ্রিকা খণ্ডেও ২ শত কাগজ প্রকাশিত হয়; কিন্তু সেণ্ডউইচ্ নামক দ্বীপখণ্ডে ৩ শত কাগজ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ৪১ হাজার খবরের কাগজের মধ্যে ১৭ হাজার ইংরেজী ভাষায়, ৭ হাজার ৫শত জর্ম্মণ ভাষায়, ৬ হাজার ৮ শত ফরাসী ভাষায়, ১ হাজার ৮ শত স্পেনিস ভাষায় ও ১২ হাজার ৫ শত ইটালীয়ান ভাষায় প্রচারিত হইয়া থাকে।



শ্রীবৎস উপাখ্যান।

(১৩৯ পৃষ্ঠার পর।)

(২)



জা শ্রীবৎস জঙ্গল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, চিন্তাদেবী ঘরে নাই। কাঠুরিয়াদের বাড়ী খুঁজিতে গেলেন। কাঠুরিয়া-রমণীদের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, রাজা রাণীর অনুসন্ধানে উন্মাদের মত নদীর তীর ধরিয়া ছুটিলেন। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন গিরি, কানন, নগর, জনপদ উত্তীর্ণ হইয়া চলিতে লাগিলেন,—উদরে অন্ন নাই, চোখে নিদ্রা নাই; মুখে কেবল "হা চিন্তা! হা চিন্তা!!" অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে চিত্তানন্দ নামক বনে গোমাতা "সুরভীর" আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বনের নাম যেমন "চিত্তানন্দ," তেমনি তার শোভা! সুরভী রাজার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে আপন আশ্রমে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। "তাঁহার আশ্রমে শনির ভয় নাই,—সুতরাং যত দিন তাঁহার গ্রহ-বৈগুণ্য না খণ্ডে, তত দিন তথায় থাকিতে বলিলেন। কিন্তু যদি আশ্রমের বাহিরে যান, তবেই আবার তাঁহাকে শনির চক্রে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইতে হইবে। আশ্রমের মধ্যে থাকিয়া শনির ভোগ উত্তীর্ণ হইলে, তিনি রাজ্যপাট এবং রাণী-চিন্তা সকলই পাইবেন।" সুরভীর দুগ্ধপান করিয়া রাজা শ্রীবৎস দিন কাটাইতে লাগিলেন। রাজার তাল বেতাল সিদ্ধ ছিল। দুগ্ধপান কালে বৎসের মুখ হইতে যে দুগ্ধ মাটিতে পড়িত, রাজা তাহাদ্বারা কাদা করিয়া দুই হাতে দুই পাটকেল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তাল বেতালকে স্মরণ করিয়া "চিন্তাবতী ও শ্রীবৎস" নামে দুই পাটকেল একত্রিত করিতেন; আর সেই মাটির পাটকেল দুখণ্ড সোণা হইয়া একত্র জোড়বদ্ধ হইত। এইরূপে রাজা শত সহস্র পাটকেল নির্ম্মাণ করিয়া স্তূপাকার করিতে লাগিলেন।

শনি রাজাকে ছাড়িয়াও ছাড়ে না। যে সদাগর রাণীকে হরণ করিয়া নিয়াছিল, সে সেই বনের নিকটবর্ত্তী নদী দিয়া একদিন নৌকা বাহিয়া যাইতেছিল। রাজা নৌকা কূলে ভিড়ানের জন্য তাহাকে ডাকিলেন। ডাক শুনিয়া বণিক তরী কূলে ভিড়াইল। তখন রাজা তাহাকে বলিলেন,—আমি এক সময় বড় লোক ছিলাম, কিন্তু ভাগ্য দোষে এখন নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি! আমি কতকগুলি স্বর্ণপাট করিয়াছি, তুমি যেখানে বাণিজ্য করিতে যাইতেছ, তথায় যদি আমাকে আমার সেই স্বর্ণপাটগুলি সহ লইয়া যাও, তবে আমি তাহা বিক্রয় করিয়া বিপদোদ্ধার হইতে পারি। বণিক রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্বর্ণপাট ও তাঁহাকে নৌকায় করিয়া লইল। নৌকায় তুলিয়া ভাবিল, ইহাকে মারিয়া ফেলিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়,—আমি এই সকল স্বর্ণপাটের অধিকারী হইতে পারি। এই ভাবিয়া রাজার হস্তপদ বাঁধিয়া তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিল,—রাজা মৃত্যু উপস্থিত ভাবিয়া রাণী চিন্তাবতীকে স্মরণ করিয়া রোদন এবং তাল বেতালকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাল বেতালের একজন নিদ্রারূপে রাজাকে নিদ্রাভিভূত করিল, অপরে ভেলা হইয়া তাঁহাকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিল। রাণী চিন্তা তাঁহার নাম শুনিয়া চাহিয়া দেখেন, মহারাজ শ্রীবৎসকে বন্ধন দশায় জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর একটা বালিশ

জলে ফেলিয়া দিলেন। সেই বালীশ রাজার উপাধান হইল। রাজা জলস্রোতে ভাসিয়া চলিলেন।

ভাসিতে ভাসিতে শ্রীবৎস রাজা অবশেষে সৌতিপুর নগরে এক মালাকার পত্নীর বাগানের ঘাটে আসিয়া লাগিলেন। রাজার চেতনা সঞ্চার হইল। মালিনীর সেই বাগানে অনেকদিন হইতে ফুল ফুটিত না,—মহারাজ শ্রীবৎসের আগমনে বাগানের শুষ্ক ফুলগাছ বিকসিত হইয়া উঠিল,—কুসুমের সুগন্ধে উদ্যানের চারি দিক আমোদিত হইয়া গেল। মালিনী এই আকস্মিক ব্যাপার দেখিয়া বাগানে ছুটিয়া আসিল,—পরম সুন্দর শ্রীবৎস রাজাকে দেখিয়া করপুটে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইল। তিনি বণিক, বাণিজ্য করিতে আসিয়া নৌকা ডুবি হইয়া তাঁহার এ দশা ঘটিয়াছে, বলিয়া পরিচয় দিলেন। মালিনীর ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী কেহ ছিল না,—ভাগিনেয় রূপে তথায় বাস করিতে সে তাঁহাকে অনুরোধ করিল। রাজা শ্রীবৎস মালিনীর গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। ইষ্ট দেবের আরাধনান্তর মালিনীর মালা গাঁথিয়া রাজার দিন কাটিতে লাগিল।

সৌতিপুরে বাসুদেব নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। ভদ্রা নামে তাঁহার এক পরম রূপবতী কন্যা ছিল। ভদ্রা ভগবতীর আরাধনা করিয়া বর প্রাপ্ত হন। শ্রীবৎস তাঁহার পতি হইবেন বলিয়া বর লাভ করেন। শ্রীবৎসকে তিনি কোথায় পাইবেন বলাতে, রাজা রম্ভাবতী মালিনীর ঘরে ছদ্মবেশে আছেন, হৈমবতী এ কথা বলিয়া প্রস্থান করেন। কন্যাকে বিবাহ-যোগ্যা দেখিয়া রাজা বাসুদেব স্বয়ম্বরের আয়োজন করিলেন, নির্দ্দিষ্ট দিনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণ আসিয়া সভাস্থলে সমবেত হইলেন। ভদ্রা মালা চন্দন লইয়া সভাতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৎস রাজাও তামাসা দেখার ছলে এক কদমগাছের নীচে আসিয়া বসিয়াছিলেন।

"সভা মধ্যে আসি ভদ্রা কৈল নিবেদন।
এ সভাতে দেব দ্বিজ আছ যত জন॥
জানিবেন সকলে আমার নমস্কার।
আজ্ঞা হয় আমি পাই পতি আপনার॥"

তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, ঐ কদম্ব তরুমূলে তোমার অভীপ্সিত স্বামী বসিয়া আছেন, তাঁহার কণ্ঠদেশে সচন্দন পুষ্প মাল্য অর্পণ কর। ভদ্রা তাই করিলেন,—সভাস্থ দুর্জ্জনেরা ভদ্রা নীচজাতিতে পরিণীতা হইলেন মনে করিয়া 'ছি ছি' করিয়া উঠিল, সুজনেরা বিধাতার লিপি বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। রাজা বাসুদেব কন্যার এরূপ আচরণে মৃত-প্রায় হইয়া অন্দরমহলে রাণীর নিকট যাইয়া মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিলেন। লজ্জায় লোকের নিকট মুখ দেখাইবেন না বলিয়া, অমাত্যবর্গকে ডাকিয়া নিয়া প্রাসাদের বাহিরে জামাতা ও কন্যার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলিলেন। ভগবতীর বর ব্যর্থ যাইবে না ভাবিয়া রাণী, কন্যা ও জামাতার নিকট যাইয়া আদর অভ্যর্থনা করিয়া আসিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল,—রাজ-বাড়ী হইতে আহার যায়, ভিন্ন বাটীতে থাকিয়া তাঁহারা দিন কাটান। অবশেষে শনির ভোগ দ্বাদশ বৎসর কাল ফুরাইয়া আসিল,—অশুভ গ্রহ যাইয়া শুভগ্রহের সঞ্চার হইল। তখন একদিন শ্রীবৎস ভদ্রার নিকট এই প্রস্তাব করিলেন,—তোমার পিতাকে বলিয়া ক্ষীরোদ নদীর তটে আমাকে নৌকার উপর কর আদায়ের কাজ লইয়া দাও। ভদ্রা মাতাকে এ কথা জানাইলেন, রাণীর কথায় রাজা অনুমতি দিলেন। শ্রীবৎস নদীর তীরে জগাতি হইয়া চলন্ত নৌকা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কতকদিন পরে দৈবযোগে সেই সওদাগরের নৌকা নদী দিয়া যাইতেছিল। নৌকা দেখিয়াই শ্রীবৎস চিনিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ নৌকা আটক রাখিতে আদেশ করিলেন এবং নৌকাতে যত ধনরত্ন আছে, তাহা তুলিয়া লইতে হুকুম দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া নৌকাতে যত স্বর্ণপাট ছিল, কর্ম্মচারিগণ তাহা তুলিয়া লইল। বণিক রাজা বাসুদেবের নিকট নালিশ করিল। রাজা জামাতার এরূপ দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া এরূপ অন্যায় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শ্রীবৎস বলিলেন,—এই স্বর্ণপাট বণিকের নয়,—এ দুষ্ট চুরি করিয়াছে। যদি ইহার হয়, তবে সে প্রত্যেক খানা দুখণ্ড করুক। বণিক এক কুড়ালহস্তে স্বর্ণপাট দ্বিখণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু কিছুতেই সমর্থ হইল না। তখন তিনি নিজে তাল বেতালকে স্মরণ করিয়া অনায়াসে সেই সকল পাট দ্বিখণ্ড করিতে লাগিলেন,—ইহা দেখিয়া সভাস্থ সকলে অবাক্ হইয়া গেল। তখন বাসুদেব কৃতাঞ্জলীপুটে শ্রীবৎস নরপতির নিকট আপন কৃত অবজ্ঞার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রাগ্‌দেশপতি শ্রীবৎস নরপতি এ কথা শুনিয়া, ভদ্রা হইতে নিজকুল পবিত্র হইয়াছে দেখিয়া রাজা পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীবৎসের অনুজ্ঞা ক্রমে, বাসুদের স্বয়ং মহা সমারোহে সওদাগরের নৌকাতে যাইয়া, চিন্তাসতীকে সমাদরে তুলিয়া আনিলেন। চিন্তাদেবী বিপদোদ্ধার হইয়াছেন দেখিয়া সূর্য্য-দেবকে স্মরণ করিলেন,—সূর্য্যদেব পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত্যানুসারে রাজ-রাণীর পূর্ব্বরূপ তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন;—কদাকার জরা প্রতিগ্রহণ করিলেন। অনেক দিনের পর শ্রীবৎস ও চিন্তা মিলিত হইয়া সকল ক্লেশ ভুলিয়া গেলেন। বাসুদেব সছত্র সভা করিয়া তাঁহাদের যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন শনিদেব আসিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৎস রাজ শনিকে দেখিয়া স্তব স্তুতিতে তাঁহাকে প্রীত করিলেন'—শনি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন;—

"শুন ওহে মহারাজা, করহ আমার পূজা,
আর তব নাহি রবে ভয়॥
দেশে যাও নরবর, এক ছত্রে রাজ্যেশ্বর,
রবে দশ সহস্র বৎসর।
পুত্র পাবে শতজন, কন্যারত্ন মহাধন,
অন্তে বাস বৈকুণ্ঠ নগর॥"

সৌতিপুরে মহোৎসব পড়িয়া গেল। ভদ্রা অন্ত্যজ বরের গলে মাল্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া যেমনই নিরানন্দ হইয়াছিল, এখন রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীবৎস জামাতা হইয়াছেন দেখিয়া তেমনই আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। আনন্দ উৎসব থামিলে, মহারাজ শ্রীবৎস শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চিন্তা ও ভদ্রা সহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া, রাজ্যের লোক প্রফুল্লচিত্তে রাজদর্শনে উপস্থিত হইতে লাগিল,—উৎসব আনন্দ চলিল। তৎপর রাজা বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া পূর্ব্ববৎ রাজত্ব করিতে লাগিলেন,—চিন্তা ও ভদ্রার গর্ভে শত পুত্র ও দুই কন্যা জন্মিল। অবশেষে—

"রাজসূয় অশ্বমেধ করি বারে বার।
দানেতে দরিদ্র কেহ না রহিল আর॥
দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে।
অন্তকালে রাণীসহ গেলা বিষ্ণুলোকে॥"

কাশীরাম দাসের মহাভারতে উপাখ্যানটী যেরূপ আছে, অবিকল তদনুরূপ বিবৃত হইল। বেদব্যাস বিরচিত উপাখ্যানের সহিত ইহার বড় পার্থক্য নাই। এমন দিন ছিল, যখন বাঙ্গালার

ঘরে ঘরে কাশী দাসের মহাভারত, কীৰ্ত্তিবাসের রামায়ণ আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে সাদরে পাঠ করিত। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, আজ কাল আমাদের বালক বালিকারা আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস প্রভৃতি কত আষাঢ়ে-গল্পের বই পড়িয়া থাকে, অথচ স্বদেশীয় ইতিবৃত্ত—অনন্ত রত্নের আধার মহাভারত রামায়ণ পড়ে না,—তাহার কোন কথা জানে না! আমরা এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াই সময় সময় রামায়ণ মহাভারতের কোন কোন উপাখ্যান সংক্ষেপে সখার পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। শ্রীবৎস উপাখ্যানে অপরাপর দেশের প্রাচীন উপাখ্যানের ন্যায় অনেক অস্বাভাবিক কথা আছে বটে, কিন্তু মহাভারতকার ইহাতে মহারাজ শ্রীবৎসের ধৰ্ম্মানুরক্তির ও রাণী চিন্তার সতীত্বের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতীব আদরের জিনিষ,—আদর্শ স্থানীয়।



কুকুরের বুদ্ধি।

পূর্ব্ব সংখ্যায় ইতর প্রাণীর বুদ্ধি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে বলিতে আমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, কুকুরের আশ্চর্য্য বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সমস্ত সত্য ঘটনা আমরা জানি, তাহার কিছু আমাদের সখার শিশু পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিব। কুকুরের বুদ্ধি, বিশ্বাস ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সত্য ঘটনার কথা আমরা জানি, এবং তাহার অনেক কথা বোধ হয় "সখার" পাঠক পাঠিকারাও শুনিয়া থাকিবে। আজ শুধু আমরা এ সম্বন্ধে যাহা কিছু নূতন জানিতে পারিয়াছি, এবং যে সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনা হইতে আমাদের শিশু পাঠক পাঠিকাদের উপদেশ লাভ হইবার সম্ভাবনা, তাহারই দুই একটীর কথা বলিব।

বিলাতের কোন এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে "জিপ্" নামে একটী কুকুর ছিল। বিশ্বাস, ভক্তি, ও অন্যান্য সদ্গুণের জন্য "জিপ্" সেই বাড়ীর ছোট বড় সকলেরই অনুরাগের পাত্র ছিল। এক দিবস সেই গৃহস্থের দুইটী ছেলে বাড়ীর পুষ্করিণীতে হাঁস নিয়া খেলা করিতেছিল। "জিপ্" পারে বসিয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছিল। গৃহস্থের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠটী ১২ বৎসরের এবং কনিষ্ঠ ১০ বৎসরের ছিল। অনেকক্ষণ খেলার পর হাঁস নিয়া তাহাদের ঘরে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। জল হইতে হাঁস ডাঙ্গায় উঠান সহজ নহে। ডাকিয়া ডুকিয়া কিছুতেই হাঁস জল হইতে তুলিতে না পারিয়া, শেষে উহাদিগকে হাতে ধরিয়া তুলিবার জন্য বড় ভাই পুষ্করিণীতে নামিল। অতঃপর একটী হাঁসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে যেমন ধরিতে যাইতেছে, তাহার ছোট ভাই অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল; এবং সেই সময় "জিপ্"ও পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সম্মুখের দিকে বেগে সন্তরণ করিয়া চলিল। তখন বড় ভাই "জিপের" লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইল যে, সে যে হাঁসটী ধরিতে যাইতেছে ঠিক সেইটীকে লক্ষ্য করিয়া বৃহৎ একটী সাপ অতি বেগে আসিতেছে। সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সেই বৃহৎ সর্প এখনই আসিয়া হাঁসটীকেও ধরিবে এবং

তাহাকেও দংশন করিবে, এইরূপ মনে মনে নিশ্চয় জানিয়া সেই বালক প্রাণের আশা একেবারে ত্যাগ করিল।

কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বর কাহাকে কখন আমাদের সাহায্যে পাঠান, পূর্ব্বে আমরা তাহার কিছুই সাহায্য করিতে পারিবে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে "জিপ্" অতি বেগে সাঁতরাইয়া গিয়া সেই ভয়ঙ্কর সর্পের গলা কামড়াইয়া ধরিয়া ঝুলাঝুলি করিতে করিতে পুকুরের পারে তুলিল; এবং কামড়াইয়া গলা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে মারিয়া



জানিতে পারি না। সামান্য জীবজন্তুর দ্বারা সময় সময় আমাদের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, ইহা দেখিয়াও যাহারা তাহার মঙ্গলাভিপ্রায়ে সন্দেহ করে, তাহারা নিতান্তই অন্ধ। সেই বিপদগ্রস্ত বালক স্বপ্নেও কখন মনে করে নাই যে, তাহার এইরূপ ভয়ানক সঙ্কটে "জিপ্" তাহার কোন ফেলিল। তখন সেই বৃহৎ সর্পকে মৃত দেখিয়া "জিপ্" মহানন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাহার বিপন্মুক্ত প্রভুর নিকট গিয়া আহ্লাদসূচক শব্দ করিতে লাগিল। তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতে লাগিল যে, সে তাহার প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া, তাহার বড়ই আনন্দ

হইয়াছে। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর সর্পের বিষম দংশনে যে তাহার শরীর জর জর হইয়াছিল, এবং বেচারীর মৃত্যু যে অতি সন্নিকট, সে জ্ঞান তাহার ছিল না।

সেই বালকদ্বয় অল্প বয়স্ক হইলেও "জিপের" শরীর ক্ষত বিক্ষত দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে বিষম হলাহলের হাত হইতে তাহার রক্ষা নাই। অতি সত্বর গিয়া তাহারা পিতা মাতার নিকট সমস্ত ঘটনা বলিল, এবং "জিপের" প্রাণরক্ষার্থ এখন নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল। কিন্তু উপায় অবলম্বন করিলে কি হইবে? দেখিতে দেখিতে সেই বিষম হলাহল "জিপ্‌কে" ধরিল, এবং কয়েক ঘণ্টা ছট্‌ ফট্‌ করিয়া বেচারী প্রাণত্যাগ করিল। "জিপের" শোকে বাড়ীশুদ্ধ লোক শোক করিতে লাগিল। সে দিবস সে গৃহস্থের কোন পুত্র কন্যার মৃত্যু হইলেও বোধ হয় সে গৃহে অধিক শোকোচ্ছ্বাস দেখা যাইত না। হাঁ,—শোক হইবারই কথা বটে। এমন উপকারী বন্ধুর মৃত্যুতে যদি লোকে শোক না করিবে, তবে আর শোক করিবে কাহার জন্য? সখার পাঠক পাঠিকা, তোমাদের মধ্যে কয়জন বল দেখি, বিপদে "জিপের" মত সৎসাহস দেখাইয়া লোকের জন্য প্রাণ দিতে পার? "জিপ্‌" সামান্য ইতর প্রাণী হইলেও অধিকাংশ মনুষ্য হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। যাহার গৃহে জিপের ন্যায় কুকুর আছে, তাহার বিপদ আপদে মস্ত সহায় আছে। এমন কুকুরের জন্যও লোকে কাঁদিবে না?

কুকুরের বুদ্ধি সম্বন্ধে আর একটী সত্য ঘটনার কথা বলিয়া, আজ আমরা বিদায় নিব। এ ঘটনা হইতে কুকুরের মহত্বের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাইব। বিলাতের কোন ধনীর গৃহে "টমি" নামে একটী কুকুর ছিল। কুকুরটী সে গৃহের চৌকিদারস্বরূপ ছিল। "টমির" প্রতাপে বাড়ীর কুটাটী পর্য্যন্ত কেহ ধরিতে পারিত না। এক দিবস একটী বালক সেই গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। ঐ বাড়ীর বাগানে একটী কুলগাছে বড় বড় কুল পাকিয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহার লোভ জন্মিল। সেই বালকটী কয়েকটী কুল পাড়িয়া নিবার জন্য যেমন চেষ্টা করিতেছিল, "টমি" তাহাকে ভয়ানক তাড়া করিয়া গেল। বালক "টমির" ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ নিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কিয়দ্দূর দৌড়িয়া যাইতে না যাইতেই, টমি ভেউ ভেউ করিতে করিতে তাহাকে ধর ধর হইল। আর রক্ষা নাই মনে করিয়া "টমি" কত কাছে আসিয়াছে দেখিবার জন্য, দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেই বালক যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল, সম্মুখের একখানি পাথরে হুচোট্‌ খাইয়া পড়িয়া গেল, এবং সেই আঘাতে তাহার পাখানি মচকাইয়া গিয়া আর উঠিবার শক্তি রহিল না। তখন সে মৃত্যু সন্নিকট মনে করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বালক মনে করিয়াছিল যে, এখনই "টমি" আসিয়া কামড়াইয়া তাহার শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য,—"টমি" সেরূপ কিছুই করিল না। কাছে আসিয়া সে যখন দেখিতে পাইল যে, তাহার পলাতক শত্রু পড়িয়া গিয়া পা মচকাইয়া ফেলিয়াছে এবং যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতেছে, তখন তাহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। কি করিয়া সে বালকের কষ্ট নিবারণ করিবে, সেই জন্য "টমি" অস্থির হইয়া পড়িল। অতঃপর এক দৌড়ে বাড়ী গিয়া গৃহস্থদের মনোযোগ আকর্ষণ মানসে ভেউ ভেউ করিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু তখন কাহারও সাড়া না পাইয়া, পুনরায় অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে দৌড়াইয়া সেই বিপন্ন বালকের নিকট আসিল। তাহার ভাবভঙ্গী, দৌড়াদৌড়ি দেখিয়া সেই বালক স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে,

"টমির" তাড়া খাইয়াই তাহার এই দশা হইয়াছে বলিয়া, "টমি" বড়ই মনোকষ্ট পাইতেছে। "টমি" আবার বাড়ীতে দৌড়াইয়া গেল, এবং এবার এমন চীৎকার আরম্ভ করিল যে, কি হইয়াছে দেখিবার জন্য বাড়ীর গৃহস্থদের বাহির হইতে হইল। "টমির" সেই অস্থিরতা ও উদ্বেগের ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন যে, কিছু একটা কাণ্ড হইয়াছে। তখন "টমিকে" অনুসরণ করিয়া কিছু দূর গিয়াই তাঁহারা সেই বালকের দুর্দ্দশা দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধানে বালকের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত তাহারা জানিতে পারিলেন, এবং আর বিলম্ব না করিয়া সেই হতভাগ্য বালককে গৃহে নিয়া ডাক্তার ডাকাইয়া দেখাইলেন। সামান্য চিকিৎসায়ই বালক ভাল হইয়া গেল।

সখার পাঠক পাঠিকা এ ঘটনাতে "টমির" যে মহত্ত্ব দেখিলে, বল দেখি, আমাদের মধ্যে শতকরা কয়জনের সে মহত্ত্বটুকু আছে? "টমি" পশু, আর আমরা বিদ্যাভিমানী মানুষ—ভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। কুকুর তাহার শত্রুর দুর্দ্দশা দেখিয়া সমস্ত হিংসা রোষ ত্যাগ করিয়া তাহার প্রতি যেরূপ দয়া দেখাইল, আমাদের শত্রুকে কি আমরা সেরূপ দয়া দেখাইয়া থাকি?—না, শত্রুকে বিপন্ন দেখিয়া আরও নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করি? "টমির" হৃদয় আছে, কিন্তু আমাদের সকলের তাহা নাই;—টমি পশু হইয়া মহৎ, আমাদের অনেকে মানুষ হইয়া পশু। তাই বলি যে, এ ঘটনায় "টমি" আজ আমাদের উপদেষ্টা।



পুরাতন কথা।

(১৩২ পৃষ্ঠার পর।)

এতক্ষণ যাহা বলা গিয়াছে, তাহা হইতে কি শিখিলাম, দেখা যাউক—

১। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেশ ডুবিয়া সাগর হইতেছে, সাগর ডুবিয়া দেশ হইতেছে।

২। জল থিতাইয়া পলি পড়ার দরুণ নানারূপ গাছ পালা জীব জন্তু ইত্যাদির চিহ্ন থাকিয়া যাইতেছে।

এই দুইটী কথা বেশ করিয়া মনে রাখ। তার পর যাহা বলি শ্রবণ কর।

অনেক সময় জলে এমন জিনিস সব মিশ্রিত থাকে যে, তাহার সাহায্যে জলে ডোবা বস্তুগুলি পাথর হইয়া যায়। একবার এইরূপে পাথর হইতে পারিলে আর সে সব জিনিসের ধ্বংস হয় না—যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহাদের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। পাথর মানুষের অতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তু, সুতরাং মানুষেরা তাহা সংগ্রহ করিতে যায়। এইরূপে পাথর আনিতে গিয়া তাহার ভিতরে অনেক সময় নানা প্রকার জীব জন্তুর হাড় পাওয়া যায়। সেই সকল হাড় দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিতে পারেন, তাহা কিরূপ জন্তুর হাড় ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কোন নদীর তলায় পলি পড়িয়াছিল, তখন একটা জন্তুর মৃত দেহ তাহাতে ঢাকা পড়িয়াছিল। জলে এমন কোন পদার্থ ছিল, যাহার জন্য ঐ সকল পলি এবং হাড় ক্রমে পাথর হইয়া গেল। কালক্রমে সে স্থানের মাটি উচু হইয়া সেখানে একটা পাহাড়

হইল। আজ কাল সেই পাহাড়ের কাছে মানুষ বলিয়া এক রকম জন্তু চলা ফেরা করে। তাহাদের ঘর দো'র তয়ের করিবার জন্য পাথরের দরকার হয়; সেই পাথর তাহারা ঐ পাহাড়ের গা হইতে কাটিয়া বাহির করিতে গিয়া ঐ হাড়গুলি পাইল। অনতিবিলম্বে ‘পালিয়ণ্টলজিষ্ট নামক এক প্রকারের পণ্ডিত মানুষ আসিয়া চসমা চোখে, নোট বই হাতে তাহাদের পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরীক্ষায় স্থির হইল যে, এ হাড় যে জানোয়ারের, তাহার মতন জন্তু আর এখন পৃথিবীতে নাই।

কোটী বৎসর পূর্ব্বে হয়ত কোন স্থানে প্রকাণ্ড বন ছিল। একদিন তাহা ধসিয়া গিয়া জলাতে পরিণত হইল। লক্ষ বৎসর ধরিয়া সেই জল হইতে ঐ বনের গাছ পালার উপর পলি পড়িল, তাহারা ঢাকা পড়িল। কালে জলার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়া সে স্থান সমান জমিতে পরিণত হইল। তাহার নীচে সেই যে বহুকালের পুরাতন বনের গাছ পালা-গুলি ঢাকা পড়িয়াছে, এতদিনে তাহাদের কি হইয়াছে জান? এতদিনে তাহাদের শরীর গঠনের উপকরণগুলি রূপান্তরিত হইয়া পাথর-কয়লার আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল পাথর-কয়লার মধ্যে স্থানে স্থানে এক একটা আস্ত গাছের গোড়া, নানান রকমের পাতা ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাহার আকৃতি ঠিক্ বজায় রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা পাথর কয়লা হইয়া গিয়াছে। এই সকল গাছ পালার চিহ্ন দেখিয়াও পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, তাহাদের অনেকেই বর্ত্তমান গাছ পালা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন।

বড় বড় জলার ধারে কত জন্তু জল খাইতে আসে। জলে যে সব লতা পাতা জন্মে তাহা খাইতেও ছোট বড় কত জন্তু আসে। এই সকল জলাতে প্রায়ই ভয়ানক কাদা হয়। আজ কালও অনেকের গরু বাছুর এইরূপ কাদায় ডুবিয়া মারা যায়। প্রাচীন কালে এইরূপ ঘটনা ঘটিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। জলার ধারে আসিয়া একবার যদি গভীর কাদায় পা পড়িল, তবে আর রক্ষা নাই। যতক্ষণ জন্তুটী পানাহারে ব্যস্ত, ততক্ষণে পা গুলি অজ্ঞাতসারে অনেক দূর বসিয়া গিয়াছে। চলিয়া যাইবার সময় আর পা উঠে না। ভয়ে জন্তুটী যতই হুড়াহুড়ি করিতেছে, পাগুলি ততই অধিক বসিয়া যাইতেছে। অবশেষে শরীরটী অবধি ডুবিয়া সেই ভয়ানক কাদার ভিতরে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইল। আমেরিকায় এরূপ অনেক জলা ছিল, তাহাদের অনেকগুলি আজও একেবারে শুখাইয়া যায় নাই। এই সকল স্থান খুড়িয়া পণ্ডিতেরা অনেক অত্যাশ্চর্য্য জন্তুর অস্থি, কঙ্কাল, এমন কি অনেক সময় আস্ত শরীর অবধি পাইয়াছেন। আয়র্লণ্ড এবং স্কটলণ্ডের স্থানে স্থানেও এমন হইয়াছে। সাইবিরিয়াতেও সময় সময় এরূপ ঘটনার চিহ্ন পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে কিরূপ জন্তু সকল ছিল, তাহা কিরূপে জানা যায়—এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছ। অনেক সময় কেবল মাত্র পদচিহ্ন দেখিয়া জন্তুবিশেষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কোন সময় অস্থিখণ্ড মাত্র দেখিয়া তাহার স্বভাব চরিত্র নির্ণয় করিতে হইয়াছে। কোন স্থানে আস্ত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে; কোন স্থানে সমস্ত শরীরটাও পাওয়া গিয়াছে। তখন তাহাদের পেট কাটিয়া পরীক্ষা করা গিয়াছে। একবার একজন পণ্ডিত এইরূপে প্রাপ্ত একটা জন্তুর হাড় হইতে সূপ প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতদের উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহারা খাইয়া কি বলিলেন, জানিতে পারি নাই।

পৃথিবীর সকল স্থানেই এইরূপ লুপ্ত জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও তাহা নিতান্ত বিরল

নহে। ঐ সকল জন্তু কত দিন হইল লোপ পাইয়াছে, তাহা অবশ্য সকল স্থলে বলা যায় না। কিন্তু কোনটী পুরাতন, কোনটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এ কথা অনেক স্থলেই বলা সম্ভব। আবার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে লোকেরা দেখিয়াছে, এখন তাহা নাই, এরূপ জন্তুও নিতান্ত কম নহে। পুরাতন প্রাণীবৃত্তান্তের পুস্তকে, এবং প্রাচীন নাবিকদিগের লিখিত প্রবন্ধাদিতে অনেক সময় অনেক জন্তুর বিবরণ এবং চিত্র পাওয়া যায়। আজ কাল সে সকল জন্তুর চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। এই সকল জন্তুর কথা শুনিতে তোমাদের অনেকরেই কৌতূহল হইতে পারে; আর তাহাদের বিবরণ অনেক স্থলে অতিশয় আশ্চর্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং আগামীতে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।



অজিত কুমার।

নবম অধ্যায়।

(১৪৪ পৃষ্ঠার পর।)

যাহার কেহই নাই, সহায় নাই, পরমেশ্বর তাহার সহায়। সংসারের বন্ধু বান্ধবদিগের সাহায্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অজিত সেই অবরুদ্ধ গহ্বরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। অরুণ নিশ্চয়ই তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইবে। কিন্তু কে তাহাকে বলিয়া দিবে যে, অজিত এই নির্জ্জন খনিতে অন্ধকার গহ্বরে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং কেহই তাহার সন্ধান করিতে পাইবে না। ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া দুর্গন্ধময় বাতাসে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

অজিত আবার ভাবিল,—মরিব কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, পরমেশ্বর তাহার জন্য আমাকে শাস্তি প্রদান করিবেন? ঈশ্বর কখনই নির্দ্দোষীকে শাস্তি প্রদান করেন না। তিনি নিশ্চয়ই আমার উদ্ধারের কোন উপায় করিয়া দিবেন।

দুর্ব্বল বালকের মন হঠাৎ বলবান হইয়া উঠিল। অজিত উঠিয়া দাঁড়াইল,—দেখিল চোরেরা অসাবধানতা বশতঃ একটী প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন ফেলিয়া গিয়াছে। অজিত সেই লণ্ঠন লইয়া চারি দিক অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এক স্থানে বোধ হইল, একখানি টালি পড়িয়া আছে। অজিত ভাবিল এখানে এ টালি কোথা হইতে আসিল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বালক টালিখানি উঠাইল। ঝুর্ ঝুর্ করিয়া নীচে কতকগুলি আবর্জ্জনা পড়িয়া গেল। অজিত দেখিল একটী সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ।

অজিত ও চোরেরা যাহাকে রূপারখনি মনে করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিক রূপারখনি নয়, একটী প্রাচীন হিন্দু দেবালয়। ক্রমে ভূপঞ্জরের পরিবর্ত্তনে উহা প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। অজিত যখন গহ্বর হইতে বাহির হইবার অন্য পথ পাইল না, তখন সাহস করিয়া ঐ অন্ধকারময় সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল।

প্রথমতঃ তাহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। সুড়ঙ্গ এত অপ্রশস্ত যে, কোন ক্রমে হামাগুড়ি দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। তা ছাড়া

বহু শতাব্দী সে সুড়ঙ্গে জনপ্রাণীর গতায়াত নাই। নানা প্রকার বিষধর কীট উহার মধ্যে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অজিত কুমারের এই অনধিকার প্রবেশে তাহারা তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে পাহাড়ের আঘাতে অজিতের গা ছড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু যখন বাঁচিবার অন্য উপায় নাই, তখন অসহ্য হইলেও এই বিষের জ্বালা, এই পাথরের আঘাত সহ্য করিতেই হইবে। অনেক দূরে অগ্রসর হইলে পথ একটু প্রশস্ত হইল। অজিত এক্ষণে দাঁড়াইবার উপযুক্ত স্থান পাইল। পরে আরও কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইলে, অন্ধকার একটু কম দেখা গেল। বোধ হইল বাহির হইতে আলোক আসিতেছে। এক্ষণে অজিতের মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল। অজিত সে সুড়ঙ্গ হইতে বাহিরে আসিয়া আবার নক্ষত্র খচিত অনন্ত প্রসারিত নীল আকাশতলে দণ্ডায়মান হইল।

অজিত যেখানে উপস্থিত হইল, তাহা একটা ক্ষুদ্র জঙ্গল। মনোযোগের সহিত দেখিলে বোধ হয় তাহা পূর্ব্বে একটী ভাল ফলের বাগান ছিল। নিকটে একটী কূপ। বহুদিন কেহ তাহার জল স্পর্শ করে নাই। এক্ষণে রজনী প্রায় প্রভাত হইয়াছে। কি জানি জঙ্গল হইতে বাহির হইলে চোরেরা যদি আবার ধরে, এই আশঙ্কায় অজিত জঙ্গল হইতে আর বাহির হইল না। পরন্তু তাহার সমস্ত শরীর বিষের জ্বালায় ও পাথরের আঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল;—অজিত ঐ স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

দশম অধ্যায়।

প্রায় সন্ধ্যাকালে অজিতের ঘুম ভাঙ্গিল। দুর্ভাবনা, অপমান, ক্লান্তি ও বিষের জ্বালায় তাহার শরীর এত দূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সমস্ত দিন কোন দিক্ দিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার সে জ্ঞান নাই। এক্ষণে অজিত দেখিল, শরীর বড় অবসন্ন হইয়াছে; ক্ষুধা তৃষ্ণায় একবারে দুর্ব্বল ও অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব সেই নির্জ্জন জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া অজিত ধীরে ধীরে আপনার বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল।

এ দিকে অজিতকে না দেখিয়া অরুণ ও তাহার পিতা সমস্ত রাত্রি ও দিন তাহাকে খুঁজিতেছে। এ পর্য্যন্ত তাহাদের আহার হয় নাই। রামরূপ একবারে পাগলের মত হইয়াছে। অরুণ "দাদা—দাদা" বলিয়া কাঁদিতেছে। আদরিণীর প্রফুল্ল মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তাহার মনে শোকের প্রবলপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। আজ ঘর দোর পরিষ্কার হয় নাই। বাড়ীখানি কেমন অপ্রফুল্ল ও গম্ভীর দেখাইতেছে। শরীর হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হইলে শরীরের যেমন শ্রীহীনতা হয়, আজ এ বাড়ীখানির তাহাই হইয়াছে। রামরূপ মাটিতে হাত পা ছড়াইয়া, মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া আছে। আদরিণী বিষণ্ণ মুখে মাথায় হাত দিয়া শিয়রে বসিয়া আছে। এমন সময় অরুণ বাহির হইতে চেঁচাইয়া উঠিল—"দাদা!—দাদা!—এই যে দাদা এসেছে!"

রামরূপ মাটি হইতে লাফ দিয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে যাইতে যাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। আদরিণী নড়িতে চড়িতে পারিল না। তাহার কেমন এক মোহ উপস্থিত হইল যে, সে যে ভাবে বসিয়াছিল সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। অরুণ দৌড়াইয়া যাইয়া অজিতের গলা জড়াইয়া ধরিল। "দাদা—দাদা, কাল কোথা ছিলে দাদা? আমরা সারা রাত, সারা দিন খুঁজিলাম, তোমাকে পাইলাম না। তুমি কোথা হ'তে এলে দাদা?" ক্ষুদ্র বালক অজি-

তের গলা জড়াইয়া ধরিয়া এইরূপ কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ক্রমে রামরূপের জ্ঞান হইল; সে অজিতকে কোলে লইয়া চারিদিকে পাগলের মত নাচিতে লাগিল। ক্রমে আদরিণীর মোহ ঘুচিল। সে উঠিয়া অজিতের মুখে একটী চুম খাইল। এইরূপে রামরূপের বাড়ীতে একটী প্রবল ঝড় উঠিয়া আস্তে আস্তে স্থির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। পিতা পুত্র আহারান্তে দাবায় বসিয়াছে। অজিত সমস্ত ঘটনা একে একে রামরূপের নিকট বলিয়াছে। সকলেই নীরব। এমন সময়ে অজিত জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, এখন কি করা? আমরা কি চোর ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিব না?"

রাম।—চোরদিগকে নিশ্চয় ধরাইয়া দিতে হইবে।

অজিত।—তাহা হইলে গণেশের বিপদ ঘটিবে যে? তাহারই অশ্রয়ে এবার আমরা বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

রাম।—যাহা ন্যায় সঙ্গত, তাহা করিতে হইবেই। ইহাতে যাহার বিপদ ঘটে ঘটুক। বন্ধু ও উপকারকের হিত চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু তাহাদিগের দুষ্কর্ম্মের সাহায্য করিবে না। বিষাক্ত হইলে, স্বীয় আঙ্গুলটী কাটিয়া ফেলিতে হয়। যদি দুষ্কর্ম্মের শাস্তি না হয়, সমাজে বাস করা ভার হইয়া উঠে। যেমন অনুমাত্র বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে প্রাণ বিয়োগ হয়, সেইরূপ অনুমাত্র পাপের পোষণে সমাজ দুর্গতিগ্রস্ত হয়। মনে কর, এই সকল চোরের যদি শাস্তি না হয়, লোভে পড়িয়া সকলেই চোর হইবে। খনিতে লোকসান বই লাভ হইবে না। তাহা হইলে কয়লার অভাবে কত লোকের কষ্ট হইবে ভাবিয়া দেখ।

অজিত।—আচ্ছা, আমরা যেন চোরদিগের নাম বলিলাম; তাহারা যে চোর, তাহা প্রমাণ করিব কিরূপে?

রামরূপ একটু গোলযোগে পড়িল। অনেকক্ষণ ভাবিল, কিন্তু কোন পথই বাহির করিতে পারিল না। অবশেষে কহিল,—"তুমি কাল একবার গজেন্দ্র নারায়ণ বাবুর বাড়ী যাও। তিনি কি পরামর্শ দেন, জানিয়া আইস।"

সেদিন আর কথাবার্ত্তা হইল না। সকলেরই শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। অতএব তাহারা বিপদ্‌-মুক্তির জন্য পরমেশ্বকে ধন্যবাদ দিয়া শয়ন করিল।

একাদশ অধ্যায়।

উষার লোহিত ছটায় ভূমণ্ডল পুলকিত হইয়াছে। গজেন্দ্র বাবুর বাগানে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়াছে। প্রাতঃ সমীরণ সেই ফুলরাশি দোলাইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছে। গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে। বাগানের পাখীগুলি জাগিয়া উঠিয়া গান ধরিতেছে। আর সেই ফুল রাশির মধ্যে প্রফুল্ল ফুলের মত দুইটী বালিকা খেলা করিতেছে। অরুণের লোহিত ছটায় বায়ু-কম্পিত কেশরাশির মধ্যে মুখ দুইখানি ভারি সুন্দর দেখাইতেছে। জমিদার গজেন্দ্র নারায়ণ একদৃষ্টে সেই বাল্যের সারল্য শোভিত মৃণাল ও আদরিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। এমন সময়ে অজিত ও অরুণ যাইয়া প্রণাম করিল।

গজেন্দ্র বাবু।—আজ এত সকালে তোমাদিগকে দেখিতেছি যে। বোধ হয় কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

অজিত।—আজ্ঞে, সম্প্রতি আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি; তাই আপনার নিকট পরামর্শ লইতে আসিলাম।

অজিত আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা গজেন্দ্র বাবুর নিকট বিবৃত করিল, এবং গণেশ তাহাদিগের যে উপকার করিয়াছিল তাহাও উল্লেখ করিল।

গজেন্দ্র বাবু।—তোমার কথা আমার নিকট এক আশ্চর্য্য উপন্যাস বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি যে যথার্থই রূপার খনি দেখিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি?

অজিত।—এ প্রকার ঘটনার কিরূপে প্রমাণ থাকিতে পারে? আমার কথা যদি আপনি যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস না করেন, তবে আমি অদ্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারি না।

গজেন্দ্র বাবু।—কর্ত্তৃপক্ষ স্বধু তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া এরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন কেন?

অরুণ।—আজ্ঞে, আমার দাদা কখন মিথ্যা কথা বলেন না।

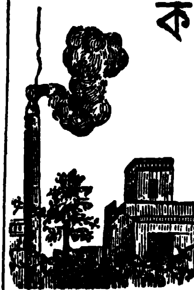
হটাৎ গজেন্দ্র বাবুর দৃষ্টি আদরিণীর দিকে পতিত হইল। গজেন্দ্র বাবু দেখিলেন সেই সরল বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় যেন বিস্ময় ও ক্ষোভে অনিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যেন গজেন্দ্র বাবুর সন্দেহে তাহার ভারি বিস্ময় জন্মিয়াছে; যেন ভ্রাতার প্রতি অবিশ্বাসে ভগিনীর মর্ম্মস্থান পৃষ্ট হইয়াছে। আদরিণীর সেই চক্ষু দুইটীতে গজেন্দ্র বাবু যেন অজিতকুমারের নির্ম্মল চরিত্র প্রতিবিম্বিত দেখিলেন। তাহার আর সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না। তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি তোমার ঘটনা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিব; তুমি এক্ষণে সেই গহ্বরটী প্রদর্শন করিতে পারিবে কি না?"

অজিত।—এক্ষণে সেই গলি ও গহ্বর এরূপে চিহ্নিত করিয়াছি যে, কিছুতেই আর ভুল হইবে না। আমি কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, একবারও গলি ও গহ্বর খুঁজিয়া লইতে ভুল হয় নাই।

অনুসন্ধানে চোরদিগের বাড়ী হইতে অনেক রৌপ্যপিণ্ড বাহির হইল। খনিতে চুরি করার জন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাদিগের বিচার হইল; এবং বিচারে দোষ সাব্যস্থ হওয়ায় সকলেরই কারাদণ্ড হইল। বিচারক অজিতের সাহস, সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং খনির সাহেবকে অনুরোধ করিলেন, তাহাকে যথোপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করা হয়।



আতিথেয়তা।



কলিকাতার নিকট কোন গ্রামে একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাঁহার একটীমাত্র পুত্র সন্তান। পুত্রটি যখন ১২।১৩ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল, তখন হইতে সে কাহারও কোন কষ্ট দেখিলে বড় কষ্ট বোধ করিত। চৈত্র মাসে একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন হইল। বালক বাড়ীতে বসিয়া আছে, এমন সময়ে দুইজন হিন্দুস্থানী মুসলমান মুটে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল,—"বাবু আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি, আমরা স্ত্রী পুত্র

লইয়া নৌকাযোগে স্বদেশে যাইব বলিয়া বাহির হইয়া নদীতীরে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মেঘ দেখিয়া অদ্য মাজিরা নৌকা ছাড়িল না। আমাদের বাসা অনেক দূরে, এখন সন্ধ্যা হইয়াছে ও ভয়ানক মেঘ উঠিয়াছে, স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলে লইয়া এখন বাসায় ফিরিয়া যাওয়া কোন মতে সম্ভব নহে। অন্য কোথায়ও আশ্রয় পাইলাম না। মুটে-দিগের মধ্যে একজন বলিল, "সেদিন আমি আপনাদের বাড়ী মোট আনিয়াছিলাম, আপনি আমাকে চেনেন বলিয়া আপনার আশ্রয়ে আসিলাম। এক্ষণে আমাদিগকে যদি অদ্য রাত্রের জন্য একটু স্থান দান করেন, তবে অত্যন্ত উপকৃত হই।" বালক মুটেকে চিনিল; এবং দেখিল সত্য সত্যই সে কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাদের বাড়ীতে মোট আনিয়াছিল।

গৃহস্থের বাড়ীর ভিতরে একটী পাকা ঘর ও তাহার সম্মুখে একখানি চালা, একখানি রন্ধন গৃহ ও বাহির বাড়ীতে একখানি মাটির ঘর, তাহার সম্মুখে একটি ছোট বারাণ্ডা। বালক দৌড়িয়া গিয়া নিজে জননীকে সমস্ত কথা বলিল,—"মা ইহারা অদ্য নিরাশ্রয়, ইহাদিগকে আমাদের বাড়ীতে একটু থাকিবার স্থান দেই?" বালকের মাতা কোন মতে এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"উহারা হিন্দুস্থানী মুটে, হয়ত রজনীতে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছে, স্থানই বা কোথায়; উহারা প্রায় চল্লিশ জন, আমাদের ক্ষুদ্র বাড়ীতে কোথায় থাকিবে?" দুই একজন প্রতিবেশী স্ত্রীলোক এই সময় তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা মাতা ও পুত্রের কথোপকথন শুনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

ঐ গৃহস্থের বাড়ীর পার্শ্বে এক ঘর ধনী লোকের বাস, বালক শীঘ্র গিয়া তাহাদিগকে বলিল,—"যদি আপনারা এই নিরাশ্রয় লোকদিগকে অদ্যকার রজনীর জন্য আশ্রয় দেন, তবে ইহারা বড় উপকৃত হয়।" কিন্তু তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বালক তখন ক্ষুণ্ণচিত্তে মুটেদিগকে বলিল,—"কি করিব? আমার মা তোমাদিগকে বাড়ীতে স্থান দিতে স্বীকার পাইতেছেন না, অন্যত্রও কোন জোগাড় করিতে পারিলাম না। তোমরা অন্য চেষ্টা দেখ।" এই কথা বলিলে মুটেগণ তাহাদের পরিবারদিগকে লইয়া প্রস্থান করিল। তাহারা প্রস্থান করার অল্পক্ষণ পরে, শরণাগত আশ্রয় বিহীন মুটেদিগের জন্য বালকের কোমল অন্তঃকরণ ধড় ফড় করিয়া উঠিল, বিদ্যুতের ন্যায় সে বাহিরে গিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিল। বলিল,—"দেখ আমার বাবা বাড়ীতে নাই তোমাদিগকে আমি কোন আহারীয় দিতে পারিব না, তবে তোমরা আমাদের বাড়ীতে ঘর দুখানির বারাণ্ডাতে শয়ন করিয়া থাক, কোন ভয় নাই।" বালকের মাতা তাহাকে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু সে কোন উত্তর করিল না।

রজনীযোগে বালকের পিতা গৃহে আসিলেন এবং এই সকল অপরিচিত লোকদিগকে দেখিয়া "ইহারা কে" এই কথা জিজ্ঞাসা করায় বালকের মাতা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা শুনাইলেন। কিন্তু বালকের জনক বিরক্ত না হইয়া বরং আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং আপনি সেই রজনীতেই বাজারে গিয়া তাহাদের জন্য যথাসাধ্য কিছু খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া আনিয়া তাহাদিগকে খাইতে দিলেন। মুটে ও তাহাদের স্ত্রী পুত্র বালকের এই অতিথি সৎকারে অতিশয় প্রীত হইয়া, প্রাতে অভিলষিত স্থানে গমন করিল।



"আমি চেষ্টা করিলে পারিব।"



ন বিদ্যালয়ে এক বালক লেখা পড়া করিত। তাহার বয়ঃ-ক্রম বার বৎসর, অঙ্ক বিষয়ে তত বুদ্ধি ছিল না। কিন্তু সে তাই বলিয়া অঙ্ক কষিতে বিরত থাকিত না। বরং অন্য বিষয় অপেক্ষা অঙ্ক বিষয়ে অধিক সময় ব্যয় করিত।

একদা তাহার শিক্ষক তাহাকে তিনটী অঙ্ক দিয়া বলিলেন,—"কাল গৃহ হইতে এই কয়টী অঙ্ক কষিয়া আনিও।" বালক তাহাতে স্বীকৃত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

পর দিন যখন শিক্ষক তাহার সেই অঙ্ক কটী কষা হইয়াছে কি না দেখিতে চাহিলেন, তখন বালক দুইটী অঙ্ক দেখাইল এবং বলিল, তৃতীয়টী বড় কঠিন, আমায় আর এক দিনের সময় দিন; বোধ হয় এবার চেষ্টা করিলে পারিব। শিক্ষক কহিলেন,—"আমি আনন্দের সহিত তোমায় আর এক দিনের সময় দিতেছি।" তিনি তাহাকে আরও দুইটী অঙ্ক কষিতে দিলেন।

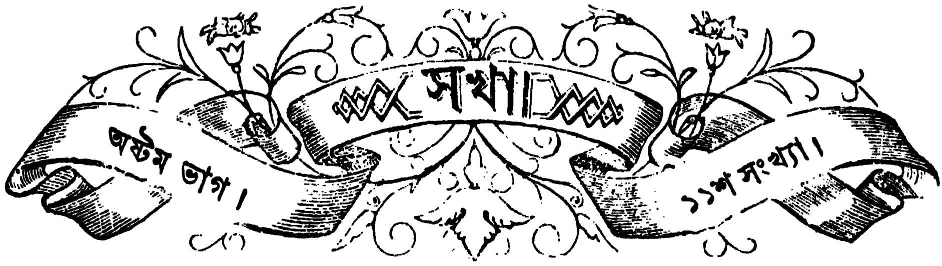
তৃতীয় দিবসও বালক শিক্ষক মহাশয়ের সেই অঙ্কটী দেখাইতে পারিল না, কেবল পূর্ব্ব দিনের দুটী অঙ্ক কশা হইয়াছে দেখাইল। শিক্ষক কহিলেন,—"তবে এবার ঐ অঙ্কটী আমার নিকট হইতে বুঝিয়া লও।" বালক কহিল,—"না মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমায় আরও এক দিনের সময় দিন, বোধ হইতেছে আমি চেষ্টা করিলে পারিব।" শিক্ষক মহাশয় বালকের আপনার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অঙ্ক কষিবার চেষ্টা ও অধ্যবসায় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আহ্লাদের সহিত তাহাকে পুনরায় সময় দিলেন।

চতুর্থ দিন বালক যখন শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন যে, বালক সে অঙ্কটী কষিতে পারিয়াছে। তাহার মুখ কেমন প্রফুল্ল ও হাস্যময়। যিনি নিজে অনেক চেষ্টা করিয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারিয়াছেন, তিনি বালকের সেই সময়ের আনন্দ বুঝিতে পারিবেন। শিক্ষক মহাশয় দেখিলেন যে, বালক তাহা বেশ সহজ উপায়ে কষিয়াছে। এইরূপ চেষ্টা ও অধ্য-বসায় বলে বালক গণিতশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।



মানুষের ছয় অঙ্গুলি।

জ্যামেকা দ্বীপের অন্তর্গত ব্রাউনষ্টাউন নগরে একটী পরিবার আছে। তাহাদিগের হাতে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি হয়। ৪ পুরুষ পর্য্যন্ত যত সন্তান জন্মিয়াছে প্রত্যেকেরই ছয়টী করিয়া আঙ্গুল। তাহারা এই অতিরিক্ত আঙ্গুল লজ্জাকর বিবেচনা করিয়া কাটিয়া ফেলে। এই অতিরিক্ত অঙ্গুলি ঠিক অবশিষ্ট অঙ্গুলির মত। তাহাতে নখ ও দুইটী গাঁইট (joint) আছে।



নবেম্বর, ১৮৯০।



বিবিধ।

রুষ যুবরাজ ও তাঁহার ভ্রাতার ভারত-ভ্রমণ।—রুষ সাম্রাজ্যের যুবরাজ ও তাঁহার ভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউক জর্জ্জ পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহারা অন্যান্য দেশ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ দর্শনেও আগমন করিবেন। আগামী ২৩এ ডিসেম্বর তাঁহাদের বোম্বাই সহরে পৌছার কথা। সেখানে তত্রত্য গবর্ণর লর্ড হেরিসের গৃহে তাঁহারা আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, মান্দ্রাজে তত্রত্য গবর্ণর লর্ড কনেমারার ভবনে, ও কলিকাতাতে বড়লাট বাহাদুরের রাজপ্রাসাদে তাঁহাদের অভ্যর্থনা হইবে। তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে চীন, জাপান, সেনফ্রেন্সিস্কো হইয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্য পরিদর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

* *
*

বিদ্যালয়ের ছাত্রের কারাদণ্ড।—বিদ্যালয়ের ছাত্রের কারাদণ্ড, একথা শুনিতেও যেমন লজ্জাকর, ভাবিতেও তেমনি ক্লেশজনক। বিদ্যালয়ের পবিত্র মন্দিরে যাহাদের বাস, তাহারা দেবতার ন্যায় নির্ম্মল চরিত্র, বিশুদ্ধ স্বভাব, সরল ও শিষ্টাচারী হইবে, এই সকলের আশা ও বিশ্বাস। কিন্তু আজ কাল ইহার বিপরীত ভাব দেখিয়া ছাত্রদের হিতাকাঙ্ক্ষী লোকেরা প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়া থাকেন। লাহোরের কোন কোন বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র শিক্ষকদের নামে কুৎসিত কথা লেখায় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাদের ধরিতে সমর্থ না হইয়া পুলিসের উপর ভার দেন। একদিন একটী ১০ বৎসরের বালক সন্ধ্যার পর, অন্ধকারের সাহায্যে বিদ্যালয়ের দেয়াল টপকিয়া আসিয়া, তাহাদের শিক্ষকের নামে কুৎসিত কথায় পূর্ণ একখণ্ড কাগজ, ভিতরের দিকে লাগাইয়া পলাইতেছিল; এমন সময় প্রহরী কনেষ্টবল তাহাকে আসিয়া গ্রেপ্তার করিল। মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার ৩ মাসের কারাদণ্ড হয়; কিন্তু ডেপুটী কমিসনরের নিকট আপিল করাতে বিচারক তাহাকে নিতান্ত শিশু দেখিয়া কারাদণ্ড কমাইয়া ৩ মাস স্থানে ৬ সপ্তাহ এবং ১০৲ দশ টাকা অর্থদণ্ড করেন। আমরা আশা করি, সখার ছাত্র পাঠকদের কেহই এইরূপ দুর্নীতি ও দুষ্কর্ম্ম পরায়ণ নহে।

* *
*

বৃহত্তম বৃক্ষপত্র।—যত প্রকারের গাছ আছে, তন্মধ্যে তাল জাতীয় গাছের পাতাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়

হইয়া থাকে। আমেজন দেশে ইনাজা নামক তাল গাছের পাতা ৩০ হইতে ৫০ ফুট লম্বা এবং ১০ হইতে ১২ ফুট চৌড়া হইয়া থাকে। সিংহল দ্বীপে টেলিপো নামক তাল গাছের পাতা সচরাচর ২০ ফুট লম্বা ও ১৮ ফুট চৌড়া হইয়া থাকে। তথায় "ডবল-ককোনাট" নামে এক প্রকার নারিকেল গাছ জন্মায়, তাহার পাতাও প্রায় তালগাছের পাতার ন্যায় বড় হইয়া থাকে।

* *
*

অনুকরণীয় বটে।—সার্জ্জেণ্ট ইন্‌ষ্ট্রাক্টর হেণ্ডার্সন নামে জনৈক সৈনিক পুরুষ পশ্চিম ভারতবর্ষের ভিরামগাঁও জেলায় এক স্থানে বিগত ৬ই নবেম্বর প্রাতে হাঁস শিকারে বাহির হন। একটা পুকুরে একটা হাঁস গুলি করেন,—কাঁটা গাছের জন্য তাহাতে সন্তরণ নিরাপদ নয় জানিয়া, তিনি সঙ্গের লোকজনদিগকে আহত হাঁসটা আনিতে নিষেধ করিয়া চলিয়া আসেন। অল্প দূর আসিতে না আসিতেই একজন দেশীয় লোকের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, একটী লোক পুকুরের জলে ডুবিয়া মরার উপক্রম হইয়াছে। তিনি দৌড়িয়া গিয়া গায়ের কোট ফেলিয়া, তাহার উদ্ধারার্থ ঝাঁপিয়া জলে পড়িলেন;—কিন্তু বহু আয়াসেও তিনি তাহাকে এক তিল সরাইতে পারিতেছিলেন না। লোকটার পা কাঁটা গাছে দৃঢ়রূপে জড়ায়ে ধরিয়াছে মনে করিয়া, তাঁহার সঙ্গীয় একজন মুসলমান সাঁতরাইয়া যাইয়া ডুব দিয়া কাঁটার বেড় হইতে তাহার পা ছাড়াইয়া দিল এবং উচু করিয়া ধরিল। তখন সার্জ্জেণ্ট সাহেব তাহাকে টানিয়া আনিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া প্রাণে বাঁচাইলেন। সার্জ্জেণ্ট হেণ্ডার্সন যেরূপ সৎসাহের ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকটী যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্তের পরিচয় দিয়াছে, তাহা মনুষ্য মাত্রেরই অনুকরণীয়।

* *
*

ছোটলাট।—তোমরা জান আমাদের বর্ত্তমান ছোটলাট সাহেবের নাম সার ষ্টুয়ার্ট বেলী। ইনি এই কাজ ছাড়িয়া বিলাতে কাজ নিয়া যাইতেছেন। ইহাঁর পরে আসামের ভূতপূর্ব্ব চিফ কমিসনর বাঙ্গালার ছোটলাট হইবেন। তাঁহার নাম সার চারলস্ ইলিয়ট। ইনি এতদিন বড়লাটের সভায় সদস্য ছিলেন;—আগামী ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করিবেন।

* *
*

অদ্ভুত সাপ।—সিঙ্গাপুরে জনৈক কৃষকের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী ময়দানে তাহার কতকগুলি মুরগি ও শূকরের ছানা চড়িয়া বেড়াইত। কতিপয় দিবস পরে কৃষক দেখিতে পাইল, কোন দিন একটী মুরগির ছানা, কোন দিন বা একটী শূকরের ছানা নিরুদ্দেশ হইতেছে। প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে বালকের চীৎকারের মত শব্দ মাঝে মাঝে শুনিতে পায় আর তাহার পরক্ষণেই দেখিতে পায়, হয় একটী মুরগির ছানা বা একটী শূকরের ছানা নাই। কৃষক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইল, নিকটবর্ত্তী কতকগুলি বৃক্ষের মধ্যস্থিত একটী গর্ত্ত হইতে একটা ভীষণাকার সর্প বাহির হইয়া ঐ রকম শব্দ করিয়া মুরগি বা শূকরের ছানা লইয়া যায়। সেই ব্যক্তি অনেক কষ্টে একজন শিকারীর সাহায্যে এই সাপটী বধ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা এই, সাপটীর মাথা ঠিক মানুষের মাথার মত।

পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী।



সখার পাঠক পাঠিকা, উপরে যাঁহার ছবি দেখিতে পাইতেছ, তোমাদের অনেকেই হয়ত তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবে। বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, মায়া ও মনুষ্য হৃদয়ের অন্যান্য সদ্‌গুণের জন্য রমাবাই যেরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম না জানাই দোষের কথা। ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি জগতের প্রধান প্রধান সমস্ত স্থানেই পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর নাম ও যশঃ বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই বিদূষী মহোদয়া রমণীর যে পরিমাণে আদর হওয়া উচিত, এ পর্য্যন্ত তাহা না হইয়া থাকিলেও, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই রমাবাই সর্ব্বসাধারণের আদর ও সম্মানের পাত্রী হইবেন, এবং সমগ্র ভারতের মহিলাগণের আদর্শস্থানীয়া হইয়া দাঁড়াইবেন। তিনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে করিয়া

কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও প্রসন্নদৃষ্টি যে সর্ব্ব সময়েই তাহার উপর বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

রমাবাই মহারাষ্ট্রের কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের কন্যা। ইঁহার পিতা অনন্তশাস্ত্রী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও অনন্তশাস্ত্রীর মত অতিশয় উদার ছিল। অন্যান্য পণ্ডিতগণের ন্যায় তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী না হইয়া বরং পূর্ণমাত্রায় তাহার স্বপক্ষে ছিলেন। পিতার চেষ্টা ও যত্নে রমাবাই অতি অল্প বয়সেই সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রী, হিন্দুস্থানী, ও উর্দ্দু প্রভৃতি নানা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এখন তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা প্রভৃতি আরও অনেক ভাষা সুন্দররূপ শিক্ষা করিয়াছেন। রমাবাই নানা ভাষা ও নানা শাস্ত্রে যেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নামের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের সেই খনা লীলাবতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া ভারত মহিলাগণের নাম স্বতই মনোমধ্যে উদয় হয়।

পণ্ডিতা রমাবাই বিধবা। এক মাত্র দুহিতা ভিন্ন ঠিক আপনার বলিতে তাঁহার আর কেহ না থাকিলেও, ভারতের সমস্ত বালবিধবাগণকে তিনি আপনার অধিক করিয়া তুলিয়াছেন। দুর্দ্দশাগ্রস্তা ও নানা অত্যাচারে প্রপীড়িতা তাঁহার এই চিরদুঃখিনী ভগিনিগণের দুঃখবিমোচনে তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুই বৎসর হইল, রমাবাই বোম্বাই নগরে হিন্দু বালবিধবাগণের জন্য "সারদা সদন" নামে একটী আশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রমে খাঁটি হিন্দু আচার পদ্ধতি অনুসারে বাল-বিধবাগণকে রাখা হয়, এবং যাহাতে প্রত্যেকের জীবন সর্ব্বতোভাবে পরোপকারে ও পরদুঃখ বিমোচনে নিয়োজিত হইতে পারে, তদনুরূপ শিক্ষা তথায় সকলকে দেওয়া হয়। অল্প সময়ের মধ্যে "সারদা সদনে" অনেক ছাত্রী যুটিয়াছে এবং তাঁহাদের শিক্ষাদিও আশানুরূপ চলিতেছে। কিছুদিন হইল, ব্যয় সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশে আশ্রমটী পুনা নগরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর এই শুভ চেষ্টা, ঈশ্বর ফলবতী করুন।

কয়েক মাস হইল, রমাবাই প্রণীত "সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দু মহিলা" নামে একখানি ইংরাজী পুস্তক আমাদের হাতে আসিয়াছে। এই পুস্তকে রমাবাই অতি সহজ ও পরিষ্কার ভাষায়, তাঁহার হিন্দু ভগিনিগণের অবস্থা বিস্তারিত বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকের সূচনায় পণ্ডিতার পিতা মাতার এবং তাঁহার নিজের জীবনের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। বিবরণটী পাঠ করিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। রমার ও তাঁহার পিতা মাতার জীবনের আখ্যায়িকা একখানি রমণীয় উপন্যাস বিশেষ। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন রামায়ণ মহাভারতের কোন পুণ্যাত্মা ঋষির পবিত্র আশ্রমের ঘটনাবলী পাঠ করিতেছি;—বড় মধুর, বড় হৃদয়গ্রাহী। পাঠ করিতে করিতে সময় সময় অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কতক কতক শুনাইব। মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, দেখিতে পাইবে রমাবাই ও তাঁহার পিতা মাতার কত উদারতা,—কত গুণ।

পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর পিতা অনন্তশাস্ত্রীর নিবাস বোম্বাই প্রদেশের মঙ্গলোর জেলায় ছিল। অতি অল্প বয়স হইতেই অনন্তের হৃদয়ে বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের তৃষ্ণা অত্যন্ত বলবতী ছিল। দশ বৎসরের সময় তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। বিবাহের পরই তিনি সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ তখনকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রীর নিকট পুনা নগরে গমন করেন। বুদ্ধি ও অধ্যবসায় গুণে অল্প দিনের

মধ্যেই অনন্ত, রামচন্দ্র শাস্ত্রীর একজন প্রিয় শিষ্য হইয়া উঠেন। পণ্ডিত রামচন্দ্র অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে তথাকার পেসোয়ার (রাজার) এক রাণীকে সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। রামচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য বলিয়া অনন্তেরও গুরুর সঙ্গে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার ছিল। তিনি যখন রাজমহিষীকে সংস্কৃত শ্লোক সমূহ আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে শুনিতেন, তখন যুগপৎ আশ্চর্য্য ও উল্লাসে তাঁহার হৃদয় পুলকিত হইত; এবং তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন যে, বাটী ফিরিয়া গিয়া তাঁহার স্ত্রীকেও ঐরূপ শিক্ষা প্রদান করিবেন।

২২।২৩ বৎসর বয়সের সময় অনন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। অনন্তের নিজের মত অত্যন্ত উদার হইলেও তাহার পিতা মাতা প্রভৃতির সেরূপ ছিল না; সুতরাং গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে যখন বিদ্যা শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইলেন, গৃহের সকলেই তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্ত নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁহার এত সাধের সঙ্কল্প শেষে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল, এবং ইহার কিছুদিন পরেই অনন্ত পুনরায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার এ বিবাহের ঘটনাটী একটু কৌতূহলজনক।

অনন্ত শাস্ত্রীর স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে এক ব্রাহ্মণ সপরিবারে সে দেশে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হন। তাঁহার সঙ্গে স্ত্রী এবং দুইটী কন্যা ছিল। কন্যাদ্বয়ের জ্যেষ্ঠা ৯ বৎসরের এবং কনিষ্ঠা ৭ বৎসরের ছিল। এক দিবস প্রাতঃকালে ঐ ব্রাহ্মণ গোদাবরীর পবিত্র সলিলে স্নান করিতেছেন, এমন সময় একটি সুশ্রী ও সুস্থকায় অপরিচিত যুবা স্নানার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। উভয়ের স্নান আহ্নিক শেষ হইলে ব্রাহ্মণ সেই যুবার নাম ধাম জানিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে কথা পাড়িলেন। কথা প্রসঙ্গে যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেই অপরিচিত যুবা একটী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-তনয়, বাসস্থান নিকটেই এবং সংপ্রতি বিপত্নীক, তখন তাঁহার নবম বর্ষীয়া কন্যা লক্ষ্মীবাইকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। লক্ষ্মীবাই দেখিতে অতি সুন্দরী ছিলেন; সুতরাং সেই অপরিচিত ব্রাহ্মণ-তনয় বিবাহ-প্রস্তাবে কোন আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত কথা ঠিক হইয়া গেল; এবং পর দিবসই লক্ষ্মীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিয়া তাহার পিতা স্ত্রী ও কনিষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া সে তীর্থস্থান ত্যাগ করিলেন।

পাঠক পাঠিকা, এই অপরিচিত ব্রাহ্মণ-তনয় আর কেহ নহে,—আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত অনন্ত শাস্ত্রী; এবং এই লক্ষ্মীবাইই আমাদের রমাবাইর মাতা। অনন্ত শাস্ত্রী লক্ষ্মীকে লইয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন; এবং মাতার নিকট সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত প্রকাশ করিলে, বৃদ্ধা মহা সমাদরে পুত্রবধুকে ঘরে নিলেন। এতদিনে আবার অনন্তের পুনার সেই পেসোয়ার রাজধানী এবং সেই রাণীর বিদ্যা বুদ্ধির কথা মনে পড়িল। এবার তিনি তাঁহার এই বালিকা স্ত্রীকে ইচ্ছানুরূপ সাহিত্যাদি শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। লক্ষ্মীর বয়স নিতান্ত অল্প; সুতরাং তাহাকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইবে সেইরূপ শিখিবার কথা। বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে লক্ষ্মীর কোন আপত্তি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অনন্ত শাস্ত্রী আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বাটীর সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এবার যখন দেখিলেন যে, তাঁহার মাতা ও অন্যান্য

আত্মীয় স্বজন সকলেই লক্ষ্মীর বিদ্যাশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী, তখন তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অতঃপর এক দিবস অনন্ত শাস্ত্রী বালিকা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, এবং পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের ঘোর অরণ্যে এক কুটীরে আশ্রয় নিলেন। ঐ স্থানটীকে গঙ্গমল বলিত। লক্ষ্মীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও যত্ন করিতেন। সেই বুদ্ধিমতী বালিকাও তাহার মঙ্গলের জন্য স্বামীর সেই অবিশ্রান্ত যত্ন ও চেষ্টার মূল্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিত, এবং তাহার প্রতিদান স্বরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীর সমস্ত উপদেশ পালন করিত। প্রথমতঃ সেই অরণ্যে লোকজনের মুখ দেখা যাইত না। সেই হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অরণ্যে মানুষের মুখ কেনই বা দেখা যাইবে। রাত্রিতে অনন্ত শাস্ত্রীর কুটীরের চারিদিকে ব্যাঘ্র ভল্লুকের ডাক শুনা যাইত। সময় সময় সেই কুটীরের অতি নিকটেই আসিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুক দর্শন দিত। রাত্রিতে লক্ষ্মী প্রাণের ভয়ে জড় সড় হইয়া লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিত। অনন্ত বালিকা ভার্য্যাকে নানা প্রকারে সাহস দিতেন এবং সময় সময় সমস্ত রাত্রি দুয়ারে প্রহরী হইয়া বসিয়া থাকিতেন। দিনের বেলা স্নান আহ্নিক ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য করিতে যে সময় লাগিত, তাহা ব্যতীত প্রায় সমস্তক্ষণই তিনি লক্ষ্মীকে ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি শিক্ষা দিতেন। এত চেষ্টার ফল ফলিল। অল্প দিনের মধ্যে লক্ষ্মী সুন্দররূপ শিক্ষা লাভ করিল। দিন দিন যেমন সেই ক্ষুদ্র বালিকা বয়সে বাড়িতে লাগিল, তাহার জ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিদ্যা বুদ্ধি ও ভক্তি শ্রদ্ধাতে লক্ষ্মী স্বামীকে মোহিত করিল। সেই অরণ্যে অনন্তশাস্ত্রী যেন পূর্ণকাম হইয়া স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ।



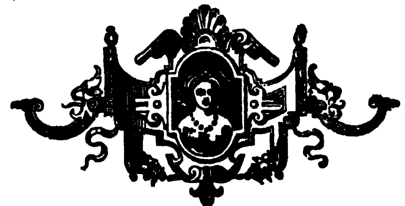
মিলন-বন্ধন।

মিলন বাঁধনে বাঁধা সমুদায়,
এ জগতে কোন মতে নাহি পরাজয়;
এই বাঁধা হাতে হাত, চলিয়াছি এক সাথ,
অচ্ছিন্ন বন্ধন যবে, উদ্যম অক্ষয়।

শত ভাই একঠাঁই, তাই প্রতি প্রাণে পাই
শতেকের বল বীর্য্য, ভুলি সর্ব্ব ভয়।
এক প্রাণে ব্যথা লেগে শত প্রাণ উঠে জেগে,
পলায় বিপদ দূরে,—দুঃখ নাহি রয়।

এক শিক্ষা এক জ্ঞান, এক মান অপমান,
এক জন্মভূমি হিতে শকতি সঞ্চয়।
শত কণ্ঠে এক স্বর, চাহি বর, হে ঈশ্বর,
এ মিলন কভু যেন ছিন্ন নাহি হয়।

(এই কবিতাটী তাল মান লয়ে গান করা যায়।)



বালিকার দয়া।

হরি সিদ্ধেশ্বর বাবুর বাড়ীর চাকর। অনেক কাল কাজ করিতেছে—কিন্তু একটু সেকেলে ও সাদাসিদে রকমের মানুষ। সে এক দিসস বাবুর বৈঠকখানা পরিষ্কার করিতে করিতে দেখিল যে, টেবেলের উপর বাবুর ঘড়ীটি রহিয়াছে। হরির কি কুবুদ্ধি হইল, সে ঘড়ীটি হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল এবং ঘড়ীর মধ্যের কল কারখানা দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। আ সর্ব্বনাশ! এ আবার কি হইল? হঠাৎ হরির হাত থেকে ঘড়ীটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল! এখন কি হইবে? বাবু দেখিলে ত আর রক্ষা থাকিবে না। হরির গা কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত পৃথিবী একেবারে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। ওমা, এ আবার কি! যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়৷ এমন সময় বাবু আসিয়া সেখানে উপস্থিত, বাবু ঘরে ঢুকিয়াই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি একে রাগী মানুষ, তাহাতে ঘড়ীটির অবস্থা দেখিয়া একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রথমে হরিকে খুব গালি দিলেন; কিন্তু তাহাতেও রাগ পড়িল না, তার পর তাহার পিঠে ঘা কতক দিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন আর বলিলেন যে, সে যেমন অনেক দামের ঘড়ীটি নষ্ট করিয়াছে, তাহার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ ৬ মাস তাহাকে বিনা মাহিয়ানায় কাজ করিতে হইবে। বেচারীর আজ কি অশুভক্ষণেই রাত পোহাইয়াছিল। বাবুর কথা শুনিয়া হরির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বেচারী গরীব মানুষ, কতকগুলি ছেলে পিলে আছে। বাড়ীতে যে যায়গা আছে তাহাতে তরিটে তরকারিটে হয়, আর বাবুর বাড়ী ৪৲ টাকা করিয়া মাহিয়ানা পায়, তাহাতেই কোন রকমে হরির দিন চলে। এখন সে কি করিবে? ৬ মাস কি করিয়া চালাইবে? হায় হায়, ছেলেগুলি না খাইয়াই মারা যাইবে! 'কেন তার এমন কুবুদ্ধি হইয়াছিল? হরি আর ভাবিয়া কূল পাইল না, একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। সে বাবুর ভাব জানিত, তাঁহার হাতে পায় ধরিয়া পড়িলে কোনই ফল হইবে না। এমনিই বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে ভয় হয়, তাহাতে আবার সে এরূপ অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। হরি ধীরে ধীরে এক ঘরে গিয়া বসিল এবং কোন উপায় নাই দেখিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় একটী বালিকা "এই যে হরি দাদা, তুমি এখানে?"—বলিয়া একেবারে হরির গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। কিন্তু তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল, "ওকি হরি দাদা, তুমি কাঁদ কেন? তোমার কি হয়েছে? তোমায় কি কেউ কিছু বলেছে?"

হরি আর কথা কহিতে পারিল না। বালিকাকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া, আরও কাঁদিতে লাগিল। বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল। হরি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত খুলিয়া বলিল। শুনিয়া বালিকার বড় কষ্ট হইল; হরির কান্না দেখিয়া তাহারও কান্না পাইল; এবং হরির চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "হরি দাদা, তুমি আর কেঁদ না, আমি বাবাকে ব'লে ঠিক ক'রে দেব এখন।" হরি বলিল, "না না, মিনু দিদি, তুমি কিছু ব'লো না"; তা হলে তিনি মনে ক'র্বেন, আমি তোমায় শিখিয়ে দিইছি, আর"—

হরির কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মিনু দিদি (মেয়েটির নাম মৃণ্ময়ী, হরি তাহাকে মিনু দিদি

বলিয়া ডাকিত) বলিয়া উঠিল, "বা! তা কেন মনে ক'র্‌বেন? তুমি আর আমায় সত্যি সত্যিই শিখিয়ে দেও নি"। মৃণ্ময়ীর কথা শুনিয়া এত কষ্টেও হরি একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল "পাগলি, তোর মত যদি সকলের মন হ'ত, তবে কি আর দুঃখ থাক্‌ত?" "তা যাহোক, হরি দাদা, তুমি কোন ভয় করোনা, আমি যাই বাবাকে বলি গিয়ে।" এই বলিয়া মৃণ্ময়ী ছুটিয়া গেল।

মৃণ্ময়ী সিদ্ধেশ্বর বাবুর মেয়ে। মৃণ্ময়ীর যেমন দয়ার শরীর, কথাগুলি তেমনি মিষ্টি। বাড়ীর ও পাড়ার সকলেই তাহাকে বড় ভালবাসিত। তাহাকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া সুখী না হইত, এমন মানুষ পাড়ায় ছিল না। সিদ্ধেশ্বর বাবু ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ও ছেলে পিলেরা সেখানে বসিয়া নানা রকম গল্প করিতেছিলেন। মৃণ্ময়ীও সেখানে গিয়া বসিল, কিন্তু তাহাকে কেমন এক লজ্জায় ধরিল, হরির কথা মুখের বাহির করিতেও পারিল না। একবার মায়ের মুখের দিকে, একবার ভাই বোনদের মুখের দিকে চায়। কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায় না। লজ্জায় মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারে না, আবার না বলিয়াও থাকিতে পারে না, বড়ই ফাঁপরে পড়িল। চোক মুখ লাল হইয়া গেল। কিছুকাল পরে সিদ্ধেশ্বর বাবু উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, মৃণ্ময়ীও পিছু পিছু আসিল। সিদ্ধেশ্বর বাবু বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন, মৃণ্ময়ীও সেখানে গিয়া বসিল। সিদ্ধেশ্বর বাবু মেয়ের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে বুড়ি, কি চাস্‌?"

মৃণ্ময়ীর আরও লজ্জা হইল। কোন রকমে বলিল, "বাবা, একটী কথা বলব।"

সি। কথা! কি কথা, বল না?

মৃ। হ্যাঁ বাবা, রাগ কর্‌বে না ত?

সি। রাগ কর্‌ব কেনরে, বল্‌ না?

মৃ। আচ্ছা, বাবা, আমার কথা শুন্‌বে ত?

সি। কি জ্বালা, কি কথা আগে তাই শুনি না?

মৃ। বাবা, হরি দাদা—

সি। হরি দাদা কি?

মৃণ্ময়ী এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে, এখন আর না বলিলে চলে না। অগত্যা মাথা নীচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "হরি দাদা, বড় কাঁদ্‌ছে, তুমি না কি মাইনে দেবে না। সেত আর ইচ্ছে ক'রে ঘড়ী ভাঙ্গেনি, হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেছে। তার কান্না দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্চে বাবা; তুমি তার মাইনে দিও, সে আর কখনও অমন কর্‌বে না।" ওমা, মেয়েটা বলে কি? এক রত্তি মেয়ে, তার কথা শোন!

সিদ্ধেশ্বর বাবু একেবারে অবাক্ হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, মৃণ্ময়ী কি জিনিস চাহিবে। বলিলেন, "যা যা, ওদিকে যা, ওসব কথায় তোর কাজ কি?"

মৃণ্ময়ীও ছাড়িবার মেয়ে নয়। সে বলিল, "না বাবা, তোমাকে আমার কথা শুন্‌তেই হবে। তুমি হরি দাদার মাইনে কাট্‌তে পার্‌বে না। হরিদাদার জন্যে আমার বড় কষ্ট হচ্চে। সে বলে যে, তার ছেলে পিলেরা না খেয়ে মারা যাবে। হ্যাঁ বাবা, আমরা যদি না খেতে পাই, তাহলে তোমার কষ্ট হয় না?"

সিদ্ধেশ্বর বাবু আর মেয়ের সঙ্গে আঁটিতে পারিলেন না। একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে। এখন যা, তোর হরি দাদাকে বল্‌গে, যা।"

মৃণ্ময়ী ছুটিয়া হরির নিকট গেল। হাসিতে হাসিতে সকল কথা বলিল। হরির মনে আর আহ্লাদ ধরে না। কান্নার উপর আরও কাঁদিল। দুই হাত তুলিয়া মৃণ্ময়ীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

অজিত কুমার।

দ্বাদশ অধ্যায়।

(১৫৮ পৃষ্ঠার পর।)



অজিতের পুরস্কার লাভ হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে আর সামান্য খনকের কার্য্য করিতে হয় না। সাহেবেরা তাহার পিতৃ-ভক্তি, অধ্যবসায়, সাধুতা, সত্যপ্রিয়তা ও অকুতোভয়তার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে ৩০ টাকা বেতনে ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। অজিত এক্ষণে ক্ষুদ্র বাড়ীখানিকে সুখ স্বচ্ছন্দের উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে। এক্ষণে অরুণকে আর কয়লা খনকের কার্য্য করিতে হয় না, সে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছে। আদরিণী এক্ষণে গজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতেই থাকে। বৃদ্ধ রামরূপ অনেক দিনের পর সুখের মুখ দেখিতে পাইয়াছে।

গণেশের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। তাহার বৃহৎ পরিবার এত দিন অন্নাভাবে মরিয়া যাইত, কিন্তু অজিতের অনুগ্রহে তাহা হয় নাই। অজিত এত দিন অন্ন বস্ত্র দ্বারা গণেশের পরিবার প্রতিপালন করিয়াছে। এক্ষণে গণেশ কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার ভারি অসুখ। গণেশের পুত্র অজিতকে ডাকিতে আসিয়াছে। অজিত তৎক্ষণাৎ গণেশের গৃহাভিমুখে চলিল।

অজিতকে দেখিয়াই গণেশের স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "গণেশের আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই; অন্তিমকাল উপস্থিত। ঘোরতর বিকার, কেবল এক একবার অজিতকুমার বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেছে।"

অজিত তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গণেশের চক্ষু দুইটী স্থির হইয়া আসিয়াছে। তাহার মৃত্যু অতি নিকট। অজিতকে দেখিয়া গণেশের মুখ একটু প্রফুল্ল হইল। কিন্তু সে প্রফুল্লতা দেখিলে আনন্দ হয় না, প্রাণ চমকিয়া উঠে। গণেশ বলিল,—"অজিত আসিয়াছ। আমি চলিলাম। তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি। তোমাকে মারিবার জন্য খনির গহ্বরে বদ্ধ করিয়াছিলাম। ইচ্ছায় নহে। উহারা তখনই তোমাকে মারিতে চাহিল। আমি বলিলাম, মারিয়া কাজ নাই, বদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাই। তুমি সাধু, ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন। তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। তোমার প্রার্থনায় আমার স্বর্গলাভ হইবে।" গণেশ আর কথা বলিতে পারিল না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অজিত একটু জল দিলেন। গণেশ একটু সুস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন;—"ইচ্ছায় আমি তাহাদের সঙ্গী হই নাই। না হইলে তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিত। তুমি সাধু, মৃত্যুকে ভয় কর নাই। আমি এই বৃহৎ পরিবারের জন্য মৃত্যুকে ভয় করিতাম। তা, আজ সব ছাড়িয়া চলিলাম। পুত্র কন্যাদিগের কোন গতি করিয়া যাইতে পারিলাম না। ইহারা না খাইয়াই মরিবে। উঃ—অনাহারে"—গণেশের আবার কণ্ঠরোধ হইল। অজিত আবার জল দিলেন। কোন ফল হইল না। কণ্ঠ আর খুলিল না।

গণেশ অজিতের হাতখানি ধরিতে চাহিল। হাত উঠিল না। অজিত তাহার হাত ধরিলেন। গণেশ আঙ্গুল নাড়িয়া তাহার পুত্রদিগকে দেখাইল, ঠোঁঠ নাড়িয়া কি বলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুই

বলিতে পারিল না। অজিত বলিলেন,—"বিপদের দিনে তুমি আমাদিগকে বাঁচাইয়াছ। আমি তোমার সন্তানদিগের ভরণপোষণ করিব। আমি বাঁচিয়া থাকিতে উহারা অনাহারে মরিবে না।"

গণেশের মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইল। তাহার চক্ষু স্থির হইল, ক্রমে মুদ্রিত হইয়া গেল। অজিত গণেশের স্ত্রীর সহিত ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিলেন।

আমরা অজিত কুমারের বাল্য-জীবন এইখানেই শেষ করিলাম। যাহারা বাল্যকালে আপনাদিগকে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব দেখিয়া সংসার অন্ধকারময় দেখেন, অথবা যাহারা ভয়ের সামান্য বাতাসে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন, অজিত কুমার তাহাদিগকে নবজীবন প্রদান করিতে পারিবে, এই আমাদের বিশ্বাস।



চরিত্র-মাহাত্ম্য।

লণ্ডন নগরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একদা বক্তৃতা হইতেছিল। বক্তা মহাশয় বলিতেছিলেন,—"আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই চরিত্রের মাহাত্ম্য আছে, কেহ কখন মনে করিবেন না যে, তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য নাই, পরন্তু প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু মাহাত্ম্য আছে।"

এক নিরক্ষর অসভ্য লোক, বক্তৃতাগৃহের এক প্রান্তে, তদীয় কন্যাকে বক্ষোপরি রক্ষা করিয়া, দণ্ডায়মান ছিল। বক্তা মহাশয়, পিতা ও কন্যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, "ঐ যে শিশুটি দেখিতেছেন, উহারও চরিত্রের মাহাত্ম্য আছে।" এই কথা শুনিবামাত্র, বালিকার পিতা উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"মহাশয়, ইহা অতি সত্য কথা।" অবশ্য শ্রোতৃবর্গের অনেকেই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

বক্তৃতা শেষে নিরক্ষর অসভ্য লোকটি, বক্তা মহাশয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া, নিম্নলিখিত ভাবে, আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। "মহাশয়, আমি ইতিপূর্ব্বে ঘোর মদ্যপায়ী ছিলাম। শুণ্ডিকালয়ে একাকী যাইতে ভাল লাগিত না, তজ্জন্য এই শিশুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। একদা রাত্রিকালে, মদের দোকানে বিকট শব্দ শুনিয়া, এই কন্যা আমাকে সভয়ে কহিল,—"বাবা! ওখানে যেও না, আমাকে লইয়া মদের দোকানে প্রবেশ করিও না।" আমি ইহাকে ধমকাইয়া চুপ করিতে বলিলাম; তথাপি এই বালিকা বিরত না হইয়া অধিকতর কাতর ও ভীতিপূর্ণ স্বরে পুনরায় কহিল,—"বাবা! ভিতরে যেও না, কখনই যেও না।" তাহাতে আমিও পুনরায় বালিকাকে ভর্ৎসনা করিলাম। এবার বালিকার মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না, ইহার কণ্ঠরোধ হইল; কিন্তু কন্যা আমার মুখপানে সকাতরে চাহিয়া রহিল, নীরব অশ্রুবিন্দু আমার গণ্ডস্থল আর্দ্র করিয়া আমার পাষাণ সম কঠোর হৃদয় দয়ার্দ্র করিতে লাগিল। শুণ্ডিকালয়ের অভিমুখে পদমাত্র অগ্রসর হইবার শক্তি অপহৃত হইল, গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম, আত্মগ্লানির দারুণ যন্ত্রণা আমার প্রাণ আকুল করিল। তদবধি আমি মদের দোকানে আর যাই নাই, অথবা

মদ্যপান করি নাই। মদ্যপান ছাড়িয়া দিয়া এখন আমি পরম সুখী হইয়াছি। তাই আপনার বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলাম,—'সকলেরই চরিত্রের মাহাত্ম্য আছে,' ইহা অতি সত্য বাক্য। এই ক্ষুদ্র বালিকা তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।"



সাধু যাঁহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়।

একটী বিদ্যার্থী দরিদ্র যুবক, কোনও অবৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার অভিপ্রায়ে, বহুদূর পদব্রজে গমন করেন। অসহায় ছাত্র, পরিশ্রান্ত হইয়া উক্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া, প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তৎকালে ছাত্রসংখ্যা পূর্ণ থাকাতে, তাঁহার স্থানাভাব হইল।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, দীন যুবকের সকরুণ প্রার্থনা কি প্রকারে অগ্রাহ্য করিবেন? স্পষ্টাক্ষরে "তোমার এখানে স্থান হইবে না" বলিয়া, কিরূপে তাহাকে বিদায় করিবেন, ইহা ভাবিয়া এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একটা পাত্র এরূপে জলপূর্ণ করিলেন যে, তন্মধ্যে বিন্দুমাত্র অধিক জল থাকিবার যো রহিল না। তৎপরে সুচতুর অধ্যক্ষ মহাশয় সেই জলপূর্ণ পাত্র নীরবে যুবকের সম্মুখে ধারণ করিলেন। যুবকও এই সঙ্কেতের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া ক্ষুণ্ণ-মনে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল, তিনি একটী ক্ষুদ্র শুষ্ক পর্ণ কুড়াইয়া লইয়া ঐ পাত্রস্থ জলের উপর রাখিয়া দিলেন। এই ঘটনা তাঁহার বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার অব্যর্থ দ্বার স্বরূপ হইল। বিনা আপত্তিতে তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিলেন। পত্র জলপূর্ণ পাত্রের উপর যেরূপ ভাসমান হইয়াছিল, তিনিও সেইরূপ ছাত্রবর্গের বিশেষ অসুবিধা না করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাস্তবিক যাঁহাদের সঙ্কল্প সাধু, পরমেশ্বর তাঁহাদের সহায় হন, তাঁহারা এইরূপেই অভাবনীয় উপায়ে পুরস্কৃত হইয়া থাকেন। তাঁহারা যতই প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হউন না কেন, নিরুপায়ের উপায়, আশার জ্যোতিঃ, পরমেশ্বরের এমনি অদ্ভুত বিধান যে, তাঁহাদিগকে চিরদিন দুর্দ্দশাগ্রস্থ থাকিতে হয় না। অতএব "সাধু যাঁহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাঁহার সহায়," এই মহাসত্যের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিরুদ্যম হইবার কোন কারণ নাই। যাঁহারা সাধু সঙ্কল্প পোষণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সফল-মনোরথ হইয়া থাকনে।



খোঁড়া ব্যাঙ্।

বর্ষার মেঘ আকাশ জুড়ে
করছে ছুটো ছুটি,
দিক্ বিদিকে মনের সুখে,
খাচ্ছে লুটো পাটি।
কি ভেবে সে, আপন মনে
কাঁদিয়া আকুল,
চোখের জলে, ফাসিয়ে দিলে
তটিনীর কূল।
কতই তারে, বোঝায় সবে,
না মানে সান্ত্বনা,
দ্বিগুণ ধারায়, ভাসিয়ে তুলে
সারা জগৎ খানা।
পুকুর ধারে, গভীর স্বরে,
ডাক্‌ছে ভেকের দল,
নূতন জলে, শুষ্ক প্রাণে,
পেয়ে নূতন বল।
বরষের পর, পেয়েছে তারা
বর্ষার দিন কটা,
হাসে খেলে, নাচে যেন
দুর্গো পূজার ঘটা!
দূর হতে সব, পুকুর পাড়ে,
আস্‌ছে দলে দল,
লম্ফে ঝম্ফে নেচে গেয়ে
সবল দুর্ব্বল।
তার মাঝেতে, গর্ত্ত হতে
বাড়িয়ে দুটী ঠ্যাং
কাঁদতেছিল, ক্ষুণ্ণ মনে
একটী খোঁড়া ব্যাং।

বড় সাধ তার, শুনবে সবার
দুটী মিষ্ট কথা,
পরের সুখে, ভুলে যাবে
আপন দুঃখের ব্যথা।
পথ হতে তায় দেখ্‌তে পেয়ে
ব্যাকুল হৃদয় হয়ে,
একটী তাদের, চল্‌লো তারে
কান্ধে তুলে নিয়ে।
পথ হতে সে নিল ছিঁড়ে
কচুপাতা দুটী,
একটী পাতা, করলে ছাতা,
অপরটীতে লাঠি।



ছাতাটী দিয়ে খোঁড়ায় ঢেকে,
লাঠিতে দিল ভর,
উৎসাহেতে সমুখ পথে
হল অগ্রসর।
একলা যেতে, খোঁড়ায় ফেলে
সরে না তার মন,

আপন সুখের অংশ দিতে
কত উচাটন।
আমরা যদি উহার মত
হতাম সদয়-প্রাণ,
খোঁড়া ভাইটী কোলে নিয়ে
হতুম আগুয়ান।
এবার থেকে, কারো বাড়ী
আমন্ত্রণ পেলে,
খোঁড়া ভাইটী নিয়ে যেতে
যাবনা'ক ভুলে।
অন্ধ হলে, হাত ধরে তার
লয়ে যাব সাথে,
আপন বুকে, রাখ্‌ব তারে
ভারাক্রান্ত মাথে।
সজল চোখের স্নেহ দিয়ে
যদি তায় না রাখি,
তবে বল ভাই, কি ফল রেখে
শুষ্ক পোড়া আঁখি!



"অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।"

বাবা আবদল্লা নিম্ন লিখিত গল্পটী বলিয়াছেন।—

একদিন আমি বোগদাদ নগরে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য একটা গাছের ছায়ায় বসিলাম। আমার সঙ্গে যে উটগুলি ছিল, তাহাদের পিঠে কোন বোঝাই ছিল না। তাহারাও সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। এমন সময়ে একজন দরবেশ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমার কাছে বসিয়া নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, সেই স্থানের অদূরে কোন স্থানে প্রচুর স্বর্ণ ও বহুমূল্য হীরকাদি লুক্কাইত আছে। আমার নিকট আশিটী উট ছিল। তিনি বলিলেন,— "চল, আমরা উভয়েই তথায় গিয়া সব উটগুলি বোঝাই করিয়া লুক্কাইত ধন আনি। তুমি অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে।" আমি অতিশয় আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, দরবেশের সহিত যাত্রা করিলাম। আমরা শীঘ্রই একটী সঙ্কীর্ণ উপত্যকার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দরবেশ বলিলেন,—"আমাদের গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, আর দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই।" তিনি সেই স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গাছের শুষ্ক ডাল সংগ্রহ করিয়া, আগুন জ্বালিলেন এবং সেই আগুনে খানিকটা সাদা গুঁড়া ফেলিয়া দিয়া বিড় বিড় কি মন্ত্র পড়িলেন। আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে সেই আগুন নিভিয়া গেলে, দরবেশ ছাই ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিলেন ও সেই স্থানে একটী বৃহৎ সুড়ঙ্গের দ্বার দৃষ্ট হইল। সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা ও বহুমূল্য মণি মুক্তাদি রহিয়াছে দেখিলাম। আমি অমনি তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া একে একে সমস্ত বস্তা গুলি পূর্ণ করিলাম, এবং শীঘ্র উটের পিঠে বোঝাই করিয়া সুস্থ হইলাম। তারপর দেখিলাম, দরবেশ পুনরায় সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও তথাকার এক স্বর্ণপাত্র হইতে একটী কাঠের বড় কৌটা তুলিয়া লইয়া পকেটে রাখিয়া দিলেন, এবং আবার পূর্ব্বের ন্যায় আগুন জ্বালিয়া গুঁড়া ফেলিয়া মন্ত্র

পড়িলেন। সে সুড়ঙ্গ অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন আমরা চল্লিশটী করিয়া উট ভাগ করিয়া লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিতে লাগিলাম। তাঁহাকে চল্লিশটী উট দিয়াছি বলিয়া মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। এত লোভী যে তাঁহাকে চল্লিশটী উট দিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। কিয়দ্দূর আসিয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলাম, "আপনি উট চালনা বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তা চল্লিশটী উট একত্রে লইয়া যাওয়া আপনার বড়ই কষ্টকর হইবে, আপনি ত্রিশটা লউন, আর দশটা আমায় ফিরাইয়া দিন।" দরবেশ বলিলেন,—"যাহা তুমি সঙ্গত বিবেচনা কর তাহাই কর, আমার কোনই আপত্তি নাই।" সেই দশটা লইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূর গিয়া আবার তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিলাম, এবং বলিলাম,—"আমি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি, আপনি সন্ন্যাসী এত ধন লইয়া কি করিবেন? কুড়িটী উট হইলেই আপনার যথেষ্ট হইবে।" দরবেশ তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া আমাকে আরও দশটী দান করিলেন। এদিকে যাহা চাহিতেছি, তাহাই বিনা আপত্তিতে পাইয়া আমার লালসা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। প্রথমে মিনতি, তৎপর ক্রমে ভয় দেখাইতে লাগিলাম। এইরূপে সকল গুলিই তাঁহার নিকট হইতে হস্তগত করিলাম। ইহাতেও আমার অদমনীয় লালসার নিবৃত্তি হইল না। আমি তাঁহাকে পকেটে যে কাঠের কৌটা পুরিতে দেখিয়াছিলাম, ভাবিলাম সেটীতে না জানি এই সকল অপেক্ষা আরও কি অমূল্য রত্ন রহিয়াছে। বলিলাম,—"আপনি দরবেশ, রুগ্ন শরীর, যদি সহজে এই কৌটাটী আমাকে না দেন, বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইলে আপনি রক্ষা করিতে পারিবেন না।" আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ভীত বা চিন্তিত না হইয়া, বিনা আপত্তিতে আমায় দান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, সেইটী আমায় উপহার দিয়া বলিলেন,—"ইহার ভিতর এক আশ্চর্য্য মালিস আছে, তোমার বামচক্ষে মাখাইলে পৃথিবীর সমুদয় গুপ্তধন দেখিতে পাইবে, সাবধান যেন ডান চোখে মাখাইও না, মাখাইলে অন্ধ হইবে।" আমি এই দ্রব্যের আশ্চর্য্য গুণ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া ইহার কিঞ্চিৎ বামচক্ষে মাখাইয়া দিলাম। বাস্তবিকই পৃথিবীর কতস্থানে কত গুপ্তধন দেখিতে পাইলাম! হায়, লালসার আর তৃপ্তি হয় না! তখন ভাবিলাম, দরবেশ আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে, মিথ্যা বলিয়া আমাকে ভুলাইয়াছে। ডান চোখে মাখাইলে আরও কত কি আশ্চর্য্য বস্তু দেখা যাইবে, এই মনে করিয়া ডান চোখে খানিকটা মাখাইলাম; সত্য সত্যই আমি দৃষ্টিহীন হইলাম। শুনিতে পাইলাম, দরবেশ আমাকে তিরস্কার করিতেছেন,—"হা হতভাগ্য, তোর লোভাতিশয়ের ও নির্ব্বুদ্ধিতার সমুচিৎ শাস্তি পাইয়াছিস্।" আমি তাঁহাকে কত মিনতি করিলাম, তিনি আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া আমায় সেই নির্জ্জন স্থানে একাকী ফেলিয়া প্রস্থান করিলেন।

কয়েক দিবস পরে বাগ্‌দাদ্ যাত্রী কতিপয় বণিক্ আমাকে ঐরূপ অসহায় অবস্থায় দেখিয়া, দয়া করিয়া আমাকে বাড়ী পৌছিয়া দেন। আমার অতিরিক্ত লালসাই আমার সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছিল।



মহাভারতের গল্প।

যযাতি উপাখ্যান।

সত্যযুগে দেবাসুরে অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছিল। সুরগণ অঙ্গিরা ঋষির পুত্র বৃহস্পতির শিষ্য, আর দৈত্যগণ ভৃগুমুনির পুত্র শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। সুরগণ কর্ত্তৃক যত অসুর নিহত হয়, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র বলে তাহাদের সকলকেই বাঁচাইয়া তোলেন। কিন্তু বৃহস্পতির সে ক্ষমতা নাই। তাই দেবতারা চক্রান্ত করিয়া, শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সেই মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র শিক্ষার জন্য, বৃহস্পতি-পুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিলেন। আর বলিয়া দিলেন, শুক্রাচার্য্যকে যত শ্রদ্ধা ভক্তি ও সেবা করিবেন, তাঁহার কন্যা দেবযানীর ততোধিক সেবক ও আজ্ঞাবহ হইবেন। কচ, শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, দেবতাদের আদেশানুরূপ, গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন, আর দেবযানীর আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া, তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে গোরক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। একদিন দৈত্যগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ভাবিল, দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র আমাদের গুরুর নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র শিক্ষা করিয়া নিয়া যাওয়ার জন্য, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং ইহাকে জীবিত রাখা হইবে না। তখনই তাহারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ব্যাঘ্র দ্বারা খাওয়াইয়া ফেলিল। সন্ধ্যার সময় গোরুগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিল,—কিন্তু কচ আসিলেন না দেখিয়া দেবযানী পিতার নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, ব্যাঘ্র, ভল্লুক কি অন্য কোন হিংস্র জন্তুতে নিশ্চয়ই তাঁহাকে বধ করিয়াছে। এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। তখন কন্যাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, শুক্রাচার্য্য তাঁহার মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র জপ করিয়া তিন ডাক দিতেই, কচ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতক্ষণ কচ কোথায় ছিলেন, দেবযানী জিজ্ঞাসা করাতে, কচ সমুদয় বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। দেবযানীর অনুরোধে সেই হইতে কচের গোরক্ষণ বন্ধ হইল,—তিনি গৃহে থাকিয়া শাস্ত্র শিক্ষা ও দেবযানীর মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

একদিন দেবযানী কচকে দেব পূজার জন্য ফুল আনিয়া দিতে বলিলেন। সেদিনও অসুরগণ আবার কচকে বাগে পাইয়া, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া, সুরার সহিত শুক্রাচার্য্যকেই খাওয়াইল।—অন্য কিছুতে খাইলে শুক্রাচার্য্য জীবন দান করিবেন,—তাঁহাকে খাওয়াইলে আর সে আশঙ্কা থাকিবে না। এদিকে কচের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া দেবযানীর মনে আশঙ্কা হইল,—দৈত্যগণ হয়ত এবারও তাহাকে বধ করিয়াছে। পিতার নিকট যাইয়া কচের জন্য ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।—কচকে জীবিত না করিলে তিনি অনাহারে দেহত্যাগ করিবেন বলিতে লাগিলেন। তখন শুক্রাচার্য্য ধ্যানে বসিয়া দেখেন, কচ তাঁহারই উদরের মধ্যে রহিয়াছে! সবিস্ময়ে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমুদয় বিবরণ অবগত হইলেন। কচকে বাহির করিলে নিজের জীবন যায়, অথচ বাহির না করিলে ব্রাহ্মণ বধ হয়; উভয় সঙ্কটে পড়িয়া অগত্যা কচকে উদরের ভিতরে রাখিয়াই মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র শিক্ষা দিলেন, পরে নিজ খড়্গ দ্বারা উদর চিড়িয়া কচকে বাহির করিলেন। কচ বাহির হইয়া গুরুকে মন্ত্রবলে জীবনদান করিলেন।

শুক্রাচার্য্য তখন মদের অপকারিতা বুঝিয়া এই অভিসম্পাত করিলেন যে,—

"ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান।
থাকুক পানের কাজ, যদি লয় ঘ্রাণ॥
আজি হৈতে সুরাপান করে যেই জন।
ব্রহ্ম তেজ নষ্ট তার হবে সেইক্ষণ॥
ইহলোকে অপূজিত হবে সেই জন।
মরিলে নরক মধ্যে হইবে গমন।"

এইরূপে কচের উদ্দেশ্য সাধন হইল,—মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র শিক্ষা হইল। তিনি সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া গুরুর নিকট বিদায় লইয়া গুরু কন্যার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। কচের উপর দেবযানীর অনেকদিন অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল; তাই তাঁহাকে বিবাহ করার জন্য তিনি কচকে অনুরোধ করিলেন। গুরু-কন্যা সহোদরা তুল্য, কচ এরূপ অন্যায় প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইতে পারেন না বলিয়া উত্তর করিলেন। দেবযানী ভালবাসার খাতিরেই দুবার কচের জীবন দান করিয়াছেন বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কচ তাহাতেও সম্মত হইলেন না দেখিয়া, দেবযানী ক্রোধান্বিতা হইয়া শাপ দিলেন—

"যত বিদ্যা তোরে পড়াইল তোর বাপে।
সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে।"

তখন কচও মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া দেবযানীকে এই অভিশাপ দিলেন যে—

"ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তাঁর।
মোর শাপে ক্ষত্রভর্ত্তা হইবে তোমার॥"

কচ সুরলোকে চলিয়া গেলেন। দেবযানী নিজ গৃহে রহিলেন। একদিন তিনি দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ও তাহার দাসিগণের সঙ্গে চৈত্ররথ নামক বনের মধ্যে এক সরোবরে স্নান করিতে গমন করেন। সরোবরতীরে সকলে পৃথক পৃথক স্থানে আপন আপন কাপড় রাখিয়া জলে অবতরণ করেন। কিন্তু বাতাস আসিয়া সকলের কাপড় একত্র জড় করিয়া ফেলে। স্নানান্তে ভুলক্রমে শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর কাপড় পরেন। শূদ্র কন্যা হইয়া ব্রাহ্মণ কন্যার কাপড় পরিয়াছেন দেখিয়া, দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠাকে তিরস্কার করেন। রাজার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সেই তিরস্কার অসহ্য হইল; তিনি দেবযানীকে ধাক্কা দিয়া এক কূপে ফেলিয়া দিয়া, সঙ্গীদের লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। দেবযানী কূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

এমন সময় দৈবযোগে চন্দ্রবংশোদ্ভব নহুষ রাজার পুত্র মহারাজ যযাতি মৃগয়া করিতে করিতে সসৈন্যে সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৈন্যগণ তৃষ্ণার্থ হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের নিকট যাইয়া, তাহাতে এক পরমা সুন্দরী রমণী দেখিতে পাইল। তাহারা রাজাকে এই খবর দিলে, তিনি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজাকে দেখিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে তোলার জন্য, দেবযানী অনুনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ শুক্রের যুবতী কন্যাকে স্পর্শ করা যুক্তি-যুক্ত মনে করিতেছিলেন না। অবশেষে দেবযানীর প্রাণ যায় দেখিয়া, তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, অগত্যা ডান হাত ধরিয়া কূপ হইতে টানিয়া তুলিলেন। দেবযানীকে কূপ-কূলে রাখিয়া রাজা স্বরাজ্যে চলিয়া গেলেন। দেবযানী মনের ক্ষোভে ও লজ্জায় সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।





ডিসেম্বর, ১৮৯০।



অদ্ভুত উদ্ভিদ্।—তোমরা হয়ত ভূগোলে জাবা ও সুমাত্রা দ্বীপের কথা পড়িয়াছ। সেই দুই দ্বীপে দুই প্রকারের লতা জাতীয় গাছ জন্মে। সেই দুই প্রকার গাছের গন্ধই বিষাক্ত ও মারাত্মক। কীট পতঙ্গাদি তাহার একটীর গন্ধ আঘ্রাণ করিলে অমনি মারা পড়ে। পক্ষী ও ক্ষুদ্র জন্তু অপরটীর নিকটস্থ হইলেই অচেতন হইয়া পড়ে;—তৎক্ষণাৎ সরাইয়া না নিলে অচিরাৎ তাহাদের মৃত্যু ঘটে। এমন কি মনুষ্যও যদি কতকক্ষণ তাহার গন্ধ শুঁকে, তবে তাহাতে তাহারও মৃত্যু ঘটিতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এই জাতীয় লতার গাছ সচরাচর নির্জ্জন স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্যান্য গাছের নিকট কখনও জন্মিতে দেখা যায় না, এবং কোন জন্তু তাহার কাছও বড় ঘেঁসে না।

* *
*

মানুষের নখ।—মানুষের নখকে বিধাতা পুরুষ কত উপকারী করিয়া সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু অযত্নে এত উপকারী পদার্থেই আবার অনিষ্ট ঘটায়। নখের ময়লা সর্ব্বদা পরিস্কার না করিলে, তাহাতে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ জন্মায় এবং শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। অনেকের দাঁত দিয়া নখ কাটার অভ্যাস আছে; কিন্তু তা ভাল নয়, তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। অনেকে আবার নখ কাটিয়া ভাল করে হাত পা ধোন না,—আধোয়া হাতেই খাওয়া দাওয়া করেন। এটা বড়ই দোষের বিষয়। প্রাচীন লোকেরা দাড়ি, নখ, চুল প্রভৃতি ফেলিয়া, স্নান না করিয়া খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই ভাল রীতি ছিল। আমাদের ঐ রীতি উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করা ভাল নয়। নাপিতের দ্বারা খেউরী হলে ত, ভাল করে সাবান দিয়া স্নান করাই উচিত;—কারণ এক অস্ত্রে তাহারা কত লোককেই কামায়। নাপিতের অস্ত্রে না কামানই ভাল। নিজের অস্ত্রে কামাইলেও ভালরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ধৌত করা উচিত।

* *
*

ক্রন্দনশীল বৃক্ষ।—আমেরিকা দেশে সম্প্রতি এক প্রকার বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে "ক্রন্দনশীল বৃক্ষ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। লোগান প্রদেশেই এই গাছ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সে গাছের অদ্ভুত গুণ। যখন ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া বৃষ্টিপাত হয় না, তখন সেই

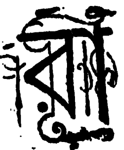
গাছের চারিদিক্ হইতে অবিরল ধারে দিবা রাত্রি জলধারা পড়িতে থাকে। ৫ মিনিট কাল যদি একজন লোক সেই গাছের নীচে দাঁড়ায়, তবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যায়। গাছের চারিপাশ সর্ব্বদা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে;—সূর্য্যোত্তাপ যত প্রখর হউক না কেন, তাহাতে সেই কুয়াশা ভাঙ্গে না। তাহাদের আশ পাশে আর যে সকল গাছ জন্মে, এই কুয়াশা কিম্বা জলধারাতে তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না। বিধাতার রাজ্যে কত অদ্ভুত পদার্থেরই সৃষ্টি হইয়াছে!



মহাভারতের গল্প।

যযাতি উপাখ্যান।

(১৭৬ পৃষ্ঠার পর।)


জা যযাতি চলিয়া গেলে, তার অল্পক্ষণ পরেই পূর্ণিকা নামে একজন স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতাকে আপন অবস্থা জানানের জন্য দেবযানী পূর্ণিকাকে শুক্রাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেন,—পিতা আসিলেই তিনি এই অসহ্য অপমানের জ্বালায় তাঁহার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিবেন। শুক্রাচার্য্য আসিয়া কন্যাকে কত কথায় প্রবোধ দিতে লাগিলেন—কিন্তু দেবযানীর প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। শর্ম্মিষ্ঠার অপমান তাঁহার প্রাণে বড়ই বাজিয়াছিল—

"শূদ্রী হইয়া মম বস্ত্র করিল পিন্ধন।
কতেক কহিব যে কহিল কুবচন॥
মোর বাপে স্তুতি শুক্র করে অনুব্রতে।
সকুটুম্ব বাঁচিস আমার ধন হৈতে॥"

শর্ম্মিষ্ঠার এই তীব্র গঞ্জনা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না। শুক্রাচার্য্য যতই বলিতে লাগিলেন—

"——দেবযানি ত্যজ মনস্তাপ।
ক্রোধে লোক ভ্রষ্ট হয় ক্রোধে হয় পাপ॥
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্ব ধর্ম্মে ধার্ম্মিক যে ক্রোধকে সম্বরে॥
শতেক বৎসর তপ করে যেই জন।
অক্রোধী সহিত সম নহে কদাচন॥"

ততই ফুলিয়া ফুলিয়া দেবযানী কাঁদিতে লাগিলেন। একমাত্র কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া, শুক্রাচার্য্য বিষণ্ণমনে দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের নিকট গেলেন; পাপানুচর দৈত্য সহবাস ছাড়িয়া তিনি দেশান্তরে গমন করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন এবং শর্ম্মিষ্ঠার আচরণের জন্য রাজাকে তীব্র ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বৃষপর্ব্ব ভীত হইয়া শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। বৃষপর্ব্ব দেবযানীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তিনি তাঁহার রাজ্যে থাকিবেন, না হলে নিশ্চয়ই স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। দৈত্যরাজ দেবযানীর নিকট আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা যদি তাহার সহস্র দাসিগণসহ তাঁহার দাসী হয়, তাহলেই দেবযানী প্রসন্ন হইবেন,—নতুবা নহে। তখন রাজা ধাত্রীকে কন্যার নিকট

পাঠাইলেন। শর্ম্মিষ্ঠা ধাত্রীর কথা শুনিয়া বলিলেন—

"——যাহে হবে জ্ঞাতির কুশল।
প্রবোধিয়া শুক্রাচার্য্যে করিব নিশ্চল॥"

পিতার নিকট গেলে, পিতা তাঁহাকে দেবযানীর দাসী হইয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা তাহাতেই রাজি হইলেন। এখানেই শর্ম্মিষ্ঠার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে—পিতার ও জ্ঞাতি কুটুম্বের জন্য শর্ম্মিষ্ঠা রাজকন্যা হইয়াও অম্লান বদনে দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল;—শর্ম্মিষ্ঠা ও তাঁহার সহস্র দাসী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, চৈত্ররথ নামক বনে দেবযানী ক্রীড়াকৌতুকে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এক দিন যযাতি রাজা সেই বনে মৃগয়া করিতে উপনীত হইলেন। রাজা দেবযানীকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবযানী নিজ পরিচয় দিয়া রাজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার পরিচয় পাইয়া দেবযানী বলিলেন, আপনি ইতিপূর্ব্বে একবার হাত ধরিয়া আমাকে কূপ হইতে তুলিয়াছিলেন। পুরুষ হইয়া যখন আপনি আমার হাত ধরিয়াছেন, তখন আমাকে আপনার বিবাহ করিতে হইবে। বিশেষতঃ আপনাদের বংশে কেহই বিবাহ করেনা,—বর আসিয়া কন্যার হাত ধরিয়াই লইয়া যায়। আমাকে বিবাহ করিলে, দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ও তাহার এক সহস্র দাসী আপনার দাসী হইবে। দেবযানী মহাতেজ-ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা, তিনি ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ-কন্যা ক্ষত্রিয়ের বিবাহনীয়া নহে,—পূজনীয়া; তাতে আবার শুক্রাচার্য্যের কন্যা। দেবযানীকে বিবাহ করিতে তাঁহার ইচ্ছা সত্বেও তাঁহার প্রাণ কাঁপিতেছিল—তাই দেবযানীর প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। দেবযানী তখন পিতার নিকট যাইয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শুক্রাচার্য্য রাজার নিকট আসিয়া কন্যা সম্প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণকন্যা অধোবর্ণের বিবাহনীয়া নহে বলিয়া যযাতি আপত্তি করিলেন। শুক্রাচার্য্য নিজ তপোবলে সেই দোষ খণ্ডন করিবেন বলিয়া, তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। কিন্তু একটী কথা বলিয়া দিলেন, দেবযানীর দাসী দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যেন তাঁহার বৈধ বা অবৈধ কোন রূপ সম্বন্ধ না ঘটে। রাজা যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহেই, কচের সেই অভিশাপ ফলিল।

যযাতি, দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠাদি একাধিক সহস্র দাসী সঙ্গে করিয়া স্বরাজ্যে গমন করিলেন। রাজা দেবযানীকে প্রধান পাটেশ্বরী করিলেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ব্ভে এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম যদু রাখা হইল। যে যাহা চাহিবে, রাজা তাহাই তাহাকে প্রদান করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা এক দিন তাঁহার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলে, রাজাকে অগত্যা তাহাতে সম্মত হইতে হইল; এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে দ্রুহ্যু নামে এক পরম সুন্দর পুত্র জন্মিল। শর্ম্মিষ্ঠার সন্তান হইয়াছে শুনিয়া, রাণী দেবযানী ছুটিয়া আসিলেন। দ্রুহ্যুর রূপের ছটা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কাহা কর্ত্তৃক এই সন্তান জন্মিয়াছে, শর্ম্মিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কোন জ্যোতিষ্মান ঋষিকুমার কর্ত্তৃক তাঁহার সন্তান হইয়াছে বলিয়া, রাণীর নিকট শর্ম্মিষ্ঠা প্রকৃত কথা গোপন রাখিলেন। কালক্রমে রাজার দেবযানীর গর্ব্ভে তুর্ব্বসু নামে আর এক এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে অনু ও পুরু নামে আর দুই পুত্র জন্মিল।

একদিন রাজা ও রাণী এক উদ্যানে বসিয়া আছেন, এমন সময় শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র আসিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। দেবযানী তাহাদের

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা আপন পরিচয় দিল। দেবযানী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে ডাকাইলেন। শর্ম্মিষ্ঠা আসিয়া রাণীকে স্তুতি মিনতি করিতে লাগিল,—রাজাও অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু দেবযানীর ক্রোধ কিছুতেই প্রশমিত হইল না। তিনি পিতার নিকট চলিয়া গেলেন,—যযাতিও তাঁহার পিছনে পিছনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যার কথা শুনিয়া রাজার উপর শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ হইল,—তাঁহার নিষেধ অমান্য করিয়াছেন বলিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন,—রাজা যৌবনে জরাগ্রস্ত হইলেন। হাতে হাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটিল।

অভিসম্পাত শুনিয়া রাজা কাঁদিয়া শুক্রাচার্য্যের পায় পড়িলেন,—তখনও তাঁহার ভোগ বিলাসের আসক্তি মিটে নাই। ঋষি প্রসন্ন হইয়া এই আজ্ঞা করিলেন যে, যদি অন্য কেহ তাঁহার জরা গ্রহণ করে, তবে তিনি ততদিন জরামুক্ত থাকিবেন। রাজার পাঁচ পুত্রের মধ্যে যে তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়া নিজের যৌবন প্রদান করিবে, সেই রাজা হইবে, শুক্রাচার্য্যের নিকট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শুক্রাচার্য্য তাহাতে সম্মত হইলে, রাজা দেবযানীকে লইয়া আবার স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহে আসিযা রাজা প্রথম পুত্র যদুকে ডাকিয়া সহস্র বৎসরের জন্য জরা গ্রহণ করিতে বলিলেন,—যদু অস্বীকৃত হইলেন। তখন দেবযানীর দ্বিতীয় পুত্র তুর্ব্বসুকে ডাকিলেন,—তুর্ব্বসুও অস্বীকৃত হইলেন। রাজা রাগ করিয়া তুর্ব্বসু ম্লেচ্ছদেশের রাজা হইবেন বলিয়া অভিশাপ দিলেন। তখন শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রদিগকে একে একে ডাকিলেন—প্রথম দ্রুহ্য আসিলেন। দ্রুহ্যও জরা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন,—যে দেশে চারি বর্ণের প্রভেদ নাই, সেই দেশে তাঁহার বংশধরগণ রাজা হইবেন বলিয়া শাপ দিলেন। তখন অনুকে ডাকাইলেন,—অনু অস্বীকৃত হইলে তাঁহার পুত্রগণ যৌবনে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। অবশেষে পুরু আসিলেন। পুরু পিতার আদেশ ক্রমে আপন যৌবন পিতাকে দিয়া, পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। রাজা তাহাতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজা করিবেন এবং তাঁহার বংশধরগণই পর্য্যায়ক্রমে রাজা হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

যযাতি সহস্র বৎসর কাল সুখভোগ করিয়া ও দান যজ্ঞাদিতে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পুনরায় জরা গ্রহণ করিলেন; এবং পুরুকে রাজসিংহাসনে বসাইবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে রাজা করার জন্য রাজ্যের প্রজারা প্রথমতঃ রাজাকে অনুরোধ করিল। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে সম্মত করিয়া, পুরুকেই রাজা করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। তিনি বনবাসী হইয়া দুই সহস্রাধিক বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া, অবশেষে স্বর্গে গমন করিলেন।

স্বর্গে ব্রহ্মলোকে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। একদিন তিনি ইন্দ্রের নিকট আসিলেন। কোন্ পুণ্যবলে তিনি স্বর্গবাসী হইয়াছেন, ইন্দ্র তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেন। রাজা নিজের পুণ্যকীর্ত্তি বলিতে আরম্ভ করিলেন। নিজ পুণ্যের কথা বলাতে, রাজার স্বর্গচ্যুতি ঘটিল। তিনি মর্ত্ত্যের দিকে নামিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় পথে অষ্টক, শিবি, বসু ও প্রতর্দ্দিনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা তাঁহার পরিচয় শুনিয়া স্বর্গচ্যুতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিজ মুখে নিজের যশো গান করাতে, ক্ষীণপুণ্য হইয়া তাঁহার এ দুর্গতি ঘটিয়াছে, তিনি তাঁহাদিগকে একথা বলিলেন। রাজার কথা শুনিয়া তাঁহারা আপন পুণ্য রাজাকে দিতে স্বীকৃত

হইলেন। রাজা অন্যের পুণ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন তাঁহারাও এরূপ ধার্ম্মিকের সহিত নরকগামী হইতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় আবার স্বর্গলোক হইতে রথ আসিয়া তাঁহাদের পাঁচ জনকেই দেবলোকে লইয়া গেল। তাঁহারা যযাতির দৌহিত্র ছিলেন,—নাতিদের পুণ্যবলে মাতামহের ক্ষীণপুণ্য আবার পূর্ণত্ব লাভ করিল। পুনরায় তাঁহার স্বর্গে অবস্থান ঘটিল।

পুরু পিতার সুখভোগ বাসনা তৃপ্তির জন্য যে দুর্বিষহ যাতনা সহ্য করিয়াছেন, তাহা সৎপুত্রের আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার পরম্পরার স্বরূপ ভারতের গৌরবস্থানীয় পৌরবকুলের উৎপত্তি।

ইংরাজী সাহিত্য পড়িতে হইলে যেরূপ অন্ধ-কবি হোমারের ইলিয়দ ও ওদিসির গল্প জানা আবশ্যক,—গ্রীক উপাখ্যান জানা প্রয়োজন; তেমনি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্য পড়িতে হইলে রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান অবগত থাকা একান্ত প্রয়োজন। রামায়ণ মহাভারত হিন্দুজাতির ইতিহাস বিশেষ—প্রাচীন রীতি নীতির ইতিবৃত্ত। সুতরাং হিন্দু সন্তান মাত্রেরই তাহা পাঠ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ কালকার দিনের ছেলে মেয়েরা আর রামায়ণ মহাভারত পড়ে না,—দেশ হইতে কথকতা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, যাত্রা গানের স্থান নাটকাভিনয়ে অধিকার করিয়াছে। তাই রামায়ণ মহাভারতের অমৃতভাষিণী উপাখ্যানাবলী সম্বন্ধে আমাদের বালক বালিকাগণ কেন, শিক্ষিত শিক্ষিতাগণও অনভিজ্ঞ। সখার পাঠক পাঠিকা-গণের এই অনভিজ্ঞতা কতক পরিমাণে দূর করার উদ্দেশেই, আমরা মহাভারতের প্রধান প্রধান উপাখ্যানগুলি সংক্ষেপে সখাতে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

গ্রেস ডার্লিং।

নর্থাম্বার্লেণ্ডের উপকূল হইতে কিঞ্চিৎদূরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ অবস্থিত আছে। তথায় জনমানবের বসতি নাই,—অতিশয় নির্জ্জন এবং বৃক্ষাদি বর্জ্জিত। তাহারা সংখ্যায় পঁচিশটী হইবে,—ভিন্ন ভিন্ন আকার এবং আয়তনবিশিষ্ট এই দ্বীপগুলি ফার্ণদ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে দ্বীপটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহার নাম লঙ্গষ্টোন্। ঐ স্থানেই গ্রেস ডার্লিং অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

এই দ্বীপের এক সীমান্ত ভাগে আলোক স্তম্ভ বিরাজিত। তাহার নিকটে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। তাহা আলোক স্তম্ভের রক্ষকের বাসস্থান। সম্মুখে উত্তাল তরঙ্গমালা-সঙ্কুল সমুদ্র লঙ্গষ্টোন্ দ্বীপের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। দিবা রাত্রি তাহার লহরীমালা আসিয়া দ্বীপাঙ্গে আঘাত করিতেছে এবং তাহাতে শুভ্র ফেণরাশি উৎপন্ন হইয়া সুনীল জলের সহিত অতি সুন্দর শোভা পাইতেছে।

এই সমুদ্রতীরবর্ত্তী দ্বীপখানি কেমন নির্জ্জন!—চারিদিক নীরব, যেন প্রকৃতি তথায় বিশ্বেশ্বর ধ্যানে চিরনিমগ্ন। সময়ে সময়ে কেবল সহস্র সহস্র পক্ষীর সমতানে উত্থিত সুমধুর কলরব সেই নীরব ধ্যান ভঙ্গ করে,—অথবা তাহারই সহিত বুঝি দেব-দেবের স্তুতি গান করে।

এই দ্বীপে তখন গ্রেস ডার্লিংএর পিতা সেই আলোক স্তম্ভের রক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারটী লইয়া তথায় বাস করিতেন।

এই নির্জ্জন প্রদেশে গ্রেস তাহার স্বপ্নময় শৈশব অতিবাহিত করিয়াছে। পিতা মাতার আদরের ধন গ্রেস এই দ্বীপে আনন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরখানিকে ভালবাসিত। হয়ত অপরের নিকট এই দ্বীপের আকর্ষণী শক্তি কিছুই ছিল না, কিন্তু গ্রেসের নিকট তাহা শোভা ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ বলিয়া মনে হইত। গ্রেস শৈশব হইতে এই দ্বীপেই বাস করিতেছে, তাহার সুখ দুঃখের স্মৃতি এখানেই জড়িত; সুতরাং এ স্থান তাহার গৃহের ন্যায় সুমধুর মনে হইত।

'গৃহ' এই শব্দের ভিতর না জানি কি মোহিনী-মন্ত্র আছে, মানব মাত্রেই তাহাতে মুগ্ধ হয়। সংসার পথে বিচরণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়াছে যে মানব, তাহার নিকট গৃহ কেমন সুখকর, যেন সকল শ্রান্তি দূর করে! ওই যে দুঃখভারে অবসন্ন মানব পথে চলিতে চলিতে শত-কণ্টক-বিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কর্ণে একবার এই কথাটি বল দেখি, অমনি দেখিবে তাহার হৃদয়ে নব বল সঞ্চার হইয়াছে; সে আবার উৎসাহিত হৃদয়ে জীবন পথে অগ্রসর হইবে। সুখী যে, তাহারও জীবনের প্রিয়তম দ্রব্য গৃহ, সুখ ও আনন্দেব প্রস্রবণ।

সেই নির্জ্জন কুটীরে গ্রেসের পিতা মাতা তাহাদের কোলাহল শূন্য জীবন অতিবাহিত করিত। গ্রেসও সেইরূপ নীরবতা ভালবাসিত। বালিকা গৃহ কর্ম্মে মাতার সাহায্য করিত এবং পিতার সহিত জাহাজ ও সমুদ্র দেখিতে ভালবাসিত। প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে মোহিত হইত। আবার যখন প্রকৃতি ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিত, তখনও বালিকার হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইত। যখন ঘনঘটায় গগন আচ্ছন্ন হইত, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিত,—ঝটিকা প্রবাহিত হইত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের শ্রবণ-ভেদী সুগম্ভীর গর্জ্জন সমুত্থিত হইত, তখন বালিকা পুলকিত হইয়া তাহা অবলোকন করিত এবং উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সেই দেবদেবের চরণ বন্দনা করিত। এইরূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার চরিত্র গঠিত হইতে লাগিল; প্রকৃত সাহস এবং কোমলতা তাহার হৃদয়ে বিকাশ পাইল।

ক্রমে গ্রেসের বাল্য অতিবাহিত হইল। এক্ষণে গ্রেস দ্বাবিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় বালিকা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিল। গ্রেস দেখিতে যে পরমা সুন্দরী ছিল, তাহা নহে; কিন্তু তাহার সর্ব্বাবয়বে কেমন লাবণ্য ছিল। তাহার হৃদয়ের সুকোমল ভাবগুলি বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। বালিকার মমতাপূর্ণ উদার মুখখানি দেখিলে তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিত।

একদা দুর্য্যোগে, শরৎকালীন রাত্রি শেষে, একখানি জাহাজ ফার্ণ দ্বীপপুঞ্জের নিকট দিয়া গমন করিতেছিল। সহসা সেই জাহাজের একটি ছিদ্র খুলিয়া প্রবলবেগে তাহাতে জল প্রবেশ করিতে লাগিল। বিপদ কখন একাকী আসে না, আবার দৈববশতঃ সেই সময়েই ঝটিকা বহিতে লাগিল; শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই সব দেখিয়া জাহাজবাসীগণ অতিশয় শঙ্কিত হইল। ক্রমে ঝটিকা প্রবলবেগ ধারণ করিল। ঘূর্ণি-বায়ু প্রবাহিত হইল। সমুদ্র-তরঙ্গ, পর্ব্বত সমান উত্থিত হইতে লাগিল এবং চারিদিক কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন আর জাহাজ রক্ষার আশা রহিল না। জাহাজবাসীগণ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল। অন্ধকারে ঝটিকাহত হইয়া জাহাজখানি কোথায় গিয়া পড়িবে, তাহা কে বলিতে পারে? চতুর্দ্দিকে যেন যমদূত তাহার অপেক্ষা করিতেছে। সহসা বায়ু তাড়িত হইয়া সবেগে একটি দ্বীপে আহত

হইয়া জাহাজের পশ্চাদ্ভাগ সমুদ্রগর্ভে নিহিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেন এবং অধিকাংশ আরোহী জল নিমগ্ন হইল। জাহাজের অগ্রভাব সেই দ্বীপের উপর গিয়া পড়িল। অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক আরোহী সেই ভগ্নাবশেষ প্রাণপণে অবলম্বন করিয়া কোন রূপে সেই দ্বীপে প্রাণ রক্ষা করিল। কিন্তু তথায়ও তাহাদের প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমুদ্র তরঙ্গ আসিয়া তাহাদিগকে সবেগে আঘাত করিতে লাগিল। সুতরাং তাহারা প্রায় জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া তথায় পড়িয়া রহিল।



এক্ষণে ঝটিকা থামিয়াছে। ধীরে ধীরে উষার আলো দেখা দিয়াছে। ঝটিকাহত দৃশ্যের উপর সূর্য্যের লোহিত কিরণছটা পড়িয়া বড় সুন্দর শোভা হইয়াছে। প্রকৃতি কেমন ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে আবার চারিদিক যেন হাসিতে লাগিল। উষার আলোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেস ডার্লিং কুটীর হইতে নির্গত হইল এবং বিস্ময়াভিভূত হইয়া চারিদিকের শোভা দেখিতে লাগিল। তখনও অল্প অল্প কুয়াসা আছে; সেই জন্য দ্বীপগুলি সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। বায়ু তখনও একটু বেগে বহিতেছিল এবং সমুদ্র ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জ্জন করিতেছিল। সহসা প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একটি দ্বীপের প্রতি গ্রেসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই দ্বীপের প্রান্ত ভাগে কতকগুলি দ্রব্য স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে, গ্রেস্ দেখিতে পাইল। অন্ধকার বশতঃ তাহা কি নির্ণয় করা যায় না। অবশেষে দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে দেখা গেল যে, সেই স্তূপাকার দ্রব্য আর কিছুই নহে;—কতকগুলি লোক একটি ভগ্নাবশেষ অবলম্বন করিয়া তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রেসের হৃদয় তাহাদের জন্য ব্যথিত হইল। তৎক্ষণাৎ কুটীরাভ্যন্তরে গমন করিয়া গ্রেস পিতাকে এই সংবাদ দিল এবং সেই হতভাগ্য লোকদের উদ্ধারার্থে গমন করিতে উৎসুক হইল। কিন্তু তাহার পিতা জানিতেন যে, তথায় গেলে তাঁহাদের মৃত্যু নিশ্চয়। তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রে হয়ত নৌকাসহিত তাঁহারা নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু বালিকা গ্রেস কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। সেই হতভাগ্য লোকদের জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। এত গুলি লোকের প্রাণ যায়, আর ঘরে বসিয়া নীরবে তাহা অবলোকন করিতে হইবে, ইহা গ্রেসের সহ্য হইল না। তাহাদের রক্ষা করিতে গিয়া যদি নিজের প্রাণ যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? গ্রেস তাহাতেও ভীত নহে। সমুদায় বিপদ তৃণজ্ঞান করিয়া বালিকা পুনঃ পুনঃ পিতাকে অনুনয় করিতে লাগিল। অবশেষে পিতার মন বিচলিত হইল। বালিকার এরূপ পরদুঃখকাতরতা, এত আগ্রহ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

তিনি কন্যার সহিত তাহাদের নিকট যাইতে সম্মত হইলেন। তাঁহাদের নৌকাখানি সমুদ্রে খুলিয়া দেওয়া হইল। উভয়ে দাঁড় গ্রহণ করিলেন। সেই ভীষণাকার সমুদ্রের তরঙ্গ ঠেলিয়া তাঁহারা অতি কষ্টে নৌকা বাহিয়া যাইতে লাগিলেন। পথে কত বিপদ ঘটিতে পারে; হয়ত বা নৌকাখানি কোনও পর্ব্বতময় স্থানে আহত হইয়া ভগ্ন হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া এবং ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহারা নিরাপদে লক্ষ্যস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই দ্বীপের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

তখন সেই জীবনাশাবর্জ্জিত লোকদের অন্তরে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা বেশ অনুভব করা যায়। তাহারা প্রতি নিমেষে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিল, সহসা দেখিল এক খানি নৌকা তাহাদের দিকে আসিতেছে। তাহারা আনন্দে ও বিস্ময়ে যুগপৎ অভিভূত হইল। আবার যখন দেখিল যে, তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহ নহে—একটি বালিকা ও একটি বৃদ্ধ, তখন আর তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ঝটিকাহত বৃদ্ধ পিতার পার্শ্বে বসিয়া বালিকা কেমন উৎসাহের সহিত দাঁড় বাহিতেছে;—তাহার মনে ভয়ের লেশমাত্র নাই! বালিকার বদনমণ্ডল কেমন প্রশান্ত, কেমন প্রফুল্ল—তাহারা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। কে জানিত যে, অবশেষে একটী বালিকা আসিয়া তাহাদিগকে এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে? এই দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের সকলের হৃদয় বিগলিত হইল। তাহারা ঈশ্বরকে সানন্দচিত্তে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। এমন সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা, তিনি ভিন্ন আর কে করিতে পারে? এই ভীষণ স্থানে এমন স্বর্গীয় ছবি তিনি ভিন্ন আর কে অঙ্কিত করিবে? সেই বালিকা এবং পিতার জন্য সর্ব্বহৃদয়ের কাতর প্রার্থনাধ্বনি স্বর্গদ্বারে উত্থিত হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল—বিশ্বদেব তাঁহার শুভ্র আশীর্ব্বাদরাশি পিতা ও কন্যার মস্তকে বর্ষণ করিলেন।

কন্যা ও পিতা কোনও প্রকারে নয়জন লোককে নৌকাতে উঠাইলেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় দুর্ভাগ্য বশতঃ স্রোতের গতি ফিরিল; সুতরাং তাঁহারা অতি কষ্টে স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড় বাহিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন সেই জলনিমগ্ন লোকগণ তাঁহাদের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। যখন এইরূপে তরণী আলোকস্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইল, তখন পিতা ও কন্যা সাদরে অতিথিদিগকে নিজ গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। তাহারা দুই দিন তথায় থাকিয়া স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিল।

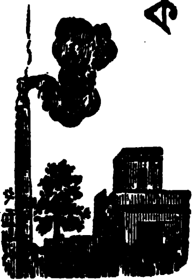
সেই ঝটিকার রাত্রিতে গ্রেস যখন বিশ্রাম করিতে গেল, তখন হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও সন্তোষ অনুভব করিল। পরোপকারের পুরস্কার এই। গ্রেসকে প্রশংসা করিবার কেহই ছিল না এবং পৃথিবীতে পিতা মাতা ভিন্ন ভালবাসিবার লোকও ছিল না; কিন্তু এই ঘটনার পরে তাহার নাম ইউরোপ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে কেবল তাহারই প্রশংসা, তাহারই যশ কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। গ্রেস সর্ব্বসাধারণের সম্মান প্রাপ্ত হইল। বহুতর সম্মানসূচক পত্র এবং উপহার তাহার নিকট আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে ৭০০০ হাজার টাকার একটি উপহার আসিয়াছিল। বিপণীতে বিপণীতে গ্রেসের ছবি বিক্রয় হইতে লাগিল। তাহার গুণরাশি দেশে দেশে গীত হইতে লাগিল। কিন্তু এত সম্মানেও গ্রেসের হৃদয় গর্ব্বিত হয় নাই। গ্রেস তেমনি নম্রস্বভাবা, তেমনি বিনয়ী রহিল। প্রকৃত বীরত্বের নিদর্শন যে বিনয়, তাহা গ্রেস বিস্মৃত হয় নাই।

গ্রেস্ তাহাদের কুটীরখানিকে বড় ভাল বাসিত। সর্ব্বসাধারণে অনুরোধ করিলেও সেই নির্জ্জন স্থান পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। মৃত্যু পর্য্যন্ত গ্রেস তাহার পিতা মাতার নিকট ছিল তাহাদের আদর পাইয়াই পরমাহ্লাদিত ছিল। অবশেষে কেবল মৃত্যু আসিয়া তাহাকে পিতা মাতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। ক্রমে গ্রেসের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। দারুণ ক্ষয়কাস রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। উল্লিখিত ঘটনার তিন বৎসর পরে গ্রেস্ পিতা মাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমৃতময় স্বর্গধামে চলিয়া গেল।



পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী।

(১৬৬ পৃষ্ঠার পর।)



কয়েক বৎসর এই ভাবে যাইতে না যাইতে অনন্তশাস্ত্রীর পাণ্ডিত্যের কথা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে অধ্যয়নার্থী ছাত্র আসিয়া যুটিতে লাগিল। এদিকে অনন্তর কুটীরে শিশুর কোলাহল ধ্বনি উঠিল। যথাসময়ে লক্ষ্মীবাই এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান লাভ করিলেন। গঙ্গমলের সেই ঘোর নির্জ্জনতা আর রহিল না। অনন্তশাস্ত্রী প্রায় সর্ব্বদাই পুত্র, জ্যেষ্ঠা কন্যা, ও পাঠার্থী ছাত্রগণের অধ্যাপনায় ব্যস্ত থাকিতেন; লক্ষ্মী গৃহকর্ম্মে, সন্তানপালনে, এবং শিষ্যগণের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদনে সময় অতিবাহিত করিতেন। এ পর্য্যন্ত অনন্তর সংসার এক প্রকার স্বচ্ছল ভাবে চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু এখন সংসারে কষ্ট দেখা দিল। পুত্র কন্যা ও বহু ছাত্রে সংসার খুব বড় হইয়া পড়িল। তাহা ছাড়া গঙ্গমল একটী প্রধান তীর্থস্থানসংলগ্ন হওয়াতে সদা সর্ব্বদাই অনন্তশাস্ত্রীর নামে তাঁহার কুটীরে এখন বহু অতিথি যুটিতে লাগিল। এইরূপ নানা কারণে সাংসারিক খরচের যেমন নিতান্ত অনাটন পড়িতে লাগিল, অনন্তশাস্ত্রী দিন দিন ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিলেন। লক্ষ্মীবাই কোন মতে অতি কষ্টে অথচ প্রফুল্ল মনে সংসার চালাইতে লাগিলেন।

১৮৫৮ সালে অনন্তশাস্ত্রীর কনিষ্ঠা কন্যা রমাবাইয়ের জন্ম হয়। রমার বয়স যেমন বাড়িতে লাগিল, অনন্ত শাস্ত্রী ও বার্দ্ধক্যবশতঃ দিন দিন কাতর হইয়া পড়িতেছিলেন। তাহা ছাড়া এখন তিনি পাঠার্থী ছাত্রগণের অধ্যাপনায় এবং অন্যান্য নানা আবশ্যকীয় কার্য্যেই সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিতেন। সুতরাং রমার শিক্ষার ভার তাহার মাতার উপরেই সম্পূর্ণরূপে পড়িল। লক্ষ্মীবাইও যে গৃহকর্ম্মাদি করিয়া বিশেষ অবকাশ পাইতেন তাহা নহে। এই কারণে অতি প্রত্যুষেই তিনি রমার শিক্ষাকার্য্য শেষ করিয়া রাখিতেন। রজনী প্রভাতে যখন তাঁহাদের কুটীরের চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষ শাখায় বিহঙ্গকুল ভগবানের স্তুতিগান আরম্ভ করিত, লক্ষ্মী প্রাণাধিকা কন্যাকে নানারূপ মিষ্ট বাক্যে আদর করিতে করিতে নিদ্রা হইতে উঠাইতেন, এবং রমার নিদ্রায় ঢুলুঢুলু নয়নদ্বয়ে চুম্বন করিতে করিতে তাহাকে কোলে তুলিয়া

লইতেন। যখন ঘুম ভালরূপে ভাঙ্গিয়া যাইত, তখন অতি মৃদুভাবে এবং যত্ন ও আগ্রহের সহিত রমাকে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দান করিতেন। মাতার এই শিক্ষাই রমার সমস্ত উন্নতির মূল। অতি অল্প বয়সেই রমাবাই এত উন্নতি দেখাইলেন যে, লোকে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি অদ্ভুত বলিয়া মনে করিত।

প্রকৃতপক্ষে মাতার শিক্ষাই সন্তানের উন্নতির পক্ষে ও চরিত্র গঠনে বিশেষ ফলপ্রদ। সখার পাঠক পাঠিকা, তোমরা "সখাতে" যত বড় লোকের জীবনী পাঠ করিয়াছ, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই মাতা যে বেশ শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন ইহা দেখিতে পাও নাই কি? আমাদের এই হতভাগ্য ভারতে শিক্ষিতা মাতা অধিক নাই বলিয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা। যতদিন ভারতের ঘরে ঘরে শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী মা না দেখা দিবেন, ততদিন ভারত সন্তানের উন্নতির আশা অতি কম। "সখার" পাঠিকাগণ, এত দিন "সখা" পড়িয়া তোমরা এ কথা বুঝিতে পারিয়াছ ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

রমাবাই অল্প বয়সে সংস্কৃত ব্যতীত মহারাষ্ট্রী ভাষাও সুন্দররূপ শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমস্ত সময়েই তিনি পড়া শুনা নিয়া থাকিতেন, অন্য চিন্তা ছিল না। সর্ব্বদা দেশীয় খবরের কাগজ ও নানা পুস্তকাদি পাঠ করার অভ্যাস থাকাতে মহারাষ্ট্রী ভাষা তিনি রীতিমত শিখিয়াছিলেন। এইরূপ বিদ্যায় অনুরাগ দেখিয়া অনন্ত শাস্ত্রী রমাবাইকে ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিতে একটুও কুণ্ঠিত হন নাই। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহের পরেও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত নিজের কাছে রাখিয়া তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, ইহাকেও ভালরূপ বিদ্যাশিক্ষা দিয়া বড় হইলে শেষে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু হিন্দুর ঘরে বিবাহের পর কন্যার উপর পিতা মাতার কোন অধিকারই বড় থাকে না। সুতরাং কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতেই অনন্তশাস্ত্রীর বাধ্য হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত কন্যাকে তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিতে হইল। সেখানে গিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই হতভাগিনী বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিল।

রমার বয়স যখন ৯ বৎসর তখন অনন্তশাস্ত্রীর আর্থিক কষ্ট এত বাড়িয়া পড়িয়াছিল যে, সংসার আর কোন মতেই চালাইতে পারিতেছিলেন না। সংসারে খরচ যথেষ্ট ছিল অথচ তদনুরূপ আয় তাঁহার এখন কিছুই ছিল না। এখন আর গঙ্গমলে থাকা তাঁহার কোন মতেই চলিল না। দেশে তাঁহার যে কিছু জায়গা জমী ছিল, তাহার অর্দ্ধাংশ তাঁহার প্রথম বিবাহের যে এক পুত্র দেশে ছিল তাহারই পাইবার কথা; অপরার্দ্ধ দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর প্রাপ্য ছিল। শ্রীনিবাসের মতানুসারে তাহার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য হইতে অনন্ত শাস্ত্রী তাঁহার ঋণ শোধ করিলেন; এবং অবিলম্বে গঙ্গমল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে তীর্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। হাতে অর্থ কিছুই ছিল না। সুতরাং এই অবস্থায় বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে কত সময় কত কষ্ট যে তাঁহাদের পাইতে হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই তীর্থ পর্য্যটন কালে এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও মাতার নিকট রমার সেই প্রত্যুষ সময়ের শিক্ষা সমভাবে চলিতেছিল, এবং এখন তিনি হিন্দুস্থানী, কর্ণাটী, উর্দ্দু প্রভৃতি নানা স্থানের নানা ভাষা সুন্দররূপ শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অনন্তশাস্ত্রী সাত বৎসর কাল এইরূপ নানা তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করেন। এই সাত বৎসরেই রমা ও তাঁহার ভ্রাতা সর্ব্ব প্রকার দুঃখ কষ্টের ভুক্তভোগী হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া অনন্তশাস্ত্রী তাঁহার চক্ষু দুইটী একেবারে হারাইয়াছিলেন। যে পিতা তাঁহাদের জন্য এত দুঃখ কষ্ট বহন করিছেন, তাঁহাকে এখন এইরূপ অন্ধাবস্থায় কষ্ট পাইতে দেখিয়া রমাবাই ও তাঁহার ভ্রাতা দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে হঠাৎ অনন্তশাস্ত্রী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন; এবং ইহার পরে এক মাস কাটিতে না কাটিতেই লক্ষ্মীবাইও পুণ্যাত্মা স্বামীর পদ-সেবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রমা ও শ্রীনিবাস এখন অকূল সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হাতে এখন এমন অর্থ ছিল না যদ্দ্বারা জননীর মৃতদেহের সৎকার করান। সৎকার স্থান প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। সুতরাং কেবল ভ্রাতা ভগ্নীতে সেই মৃতদেহ অতদূরে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাঁহাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া দুইটী ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে রমাবাই ও শ্রীনিবাস কোন মতে অতি কষ্টে জননীর মৃতদেহের সৎকার করিয়া আসিলেন।

ইহার পরে রমাবাই ও শ্রীনিবাসশাস্ত্রী নিঃসহায় অবস্থায় নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা বাল্যবিবাহের অপকারিতা এবং স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে লোকের মত ও বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। মান্দ্রাজ, মধ্যভারত, রাজপুতনা, পাঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাঁহারা কলিকাতা উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যেখানে যখন গিয়াছেন, লোকে সসমাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থণা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছে। এত অল্প বয়সে তাঁহাদের এমন বিদ্যাবুদ্ধি, উদারমত, এবং পরদুঃখকাতরতা দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়াছে। কলিকাতা নগরে নানা সভা সমিতি হইতে তাঁহাদিগকে অভিনন্দন পত্র ও উপঢৌকন ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছিল। কলিকাতার পণ্ডিতগণ রমাবাইকে "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করেন। কলিকাতা হইতে বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে তাঁহারা ভ্রমণ করেন। ঢাকা অবস্থান কালে হঠাৎ শ্রীনিবাসশাস্ত্রীর মৃত্যু হয়। জীবনের একমাত্র সহায় ভ্রাতাকে হারাইয়া রমাবাই অকূল পাথারে পড়িলেন; চারিদিক এখন শূন্য দেখিতে লাগিলেন। এই বিপদের সময় স্থানীয় লোকে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

কয়েক মাস পরে রমাবাই শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র মেধাবী এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়কে পাণিদান করেন। কিন্তু পরমেশ্বর রমার জীবন সংসারের সুখভোগের জন্য করেন নাই। বিবাহের পর ১৮। ১৯ মাস গত হইতে না হইতেই রমাবাই বিধবা হইলেন। বিসূচিকা রোগে হঠাৎ বিপিন বাবুর মৃত্যু হইল। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার একটী সুকুমারী কন্যা জন্মে। বড় স্নেহের পাত্রী বলিয়া স্বামী স্ত্রী আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "মনোরমা"। বৈধব্যাবস্থায় মনোরমাকে নিয়া এখন তিনি আরও অধিক তর নিঃসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই বিষম শোকের আতিশর্য্য একটু কমিলে রমাবাই তাঁহার প্রাণের কাণে যেন শুনিতে পাইলেন যে, ভগবান এখন তাঁহাকে তাঁহারই কার্য্যে ডাকিতেছেন,—ভারতের অত্যাচারপ্রপীড়িতা মহিলাগণের দুঃখ কষ্ট নিবারণের চেষ্টায় আহ্বান করিতেছেন।

রমাবাই সেই ডাকের অনুসরণ করিলেন। দেশে ফিরিয়া গিয়া হিন্দুমহিলাগণের উন্নতিকল্পে পুনা নগরে আর্য্যমহিলা-সমাজ নামে একটী সমিতি স্থাপন করিলেন। এবং প্রাচীন শাস্ত্রানুযায়ী মহিলাগণের কি প্রকারে উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে নগরে নগরে বক্তৃতা করিয়া সমস্ত লোককে সেই কার্য্যে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ১৮৮২ সালে যখন শিক্ষা সমিতি বম্বাই নগরে তথাকার প্রধান প্রধান লোকের মত গ্রহণের জন্ত গমন করেন, রমাবাই একটী সুন্দর ও তেজস্বী বক্তৃতায় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থণা করিয়া বম্বাইনগরের টাউনহলে গ্রহণ করেন। স্ত্রীলোকের শিক্ষা সম্বন্ধে পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর মত গৃহিত হইয়াছিল, এবং শিক্ষা সমিতির সভাপতি ডাক্তার হণ্টর তাঁহার মত এতদূর মূল্যবান জ্ঞান করেন যে, তিনি উহা মহারাষ্ট্রী ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করাইয়া পৃথকরূপে মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতা রমাবাই তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে নিজকে এখন কতটা অনুপযুক্তা বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। এই কঠিন কার্য্য ভালরূপে সম্পন্ন করিতে গেলে অনেক জ্ঞানের আবশ্যক। সেরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অনেক দেখা শুনা চাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানে গিয়া কিছুকাল থাকিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া আসিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল। ১৮৮৩ সালে তাঁহার কন্যাকে নিয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া ইংরাজী, গণিত, এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত সুন্দররূপ শিক্ষা করেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর কখনও বিশ্বাস ছিল না। ইংলণ্ড অবস্থান কালে রমাবাই খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও তিনি হিন্দুর আচারব্যবহার কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই। বৈধব্যাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহার অঙ্গের ভূষণ করিয়াছেন।

১৮৮৬ সালে রমাবাই তাঁহার বন্ধু আনন্দীবাই যোশীর এম, ডি উপাধী প্রাপ্তি দেখিবার জন্ত ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় ফিলাডল্‌ফিয়া নগরে গমন করেন। ডাক্তার আনন্দীবাই যেরূপ সুখ্যাতির সহিত চিকিৎসা শাস্ত্রে এই উচ্চ উপাধি লাভ করে তাহা হিন্দুমহিলাগণের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা। রমাবাই কয়েক বৎসর আমেরিকায় অবস্থিতি করিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া ১৮৮৭ সালে দেশে ফিরিয়া আসেন। এখন তিনি "সারদা সদন" স্থাপন করিয়া বাল-বিধবাগণের উন্নতিকল্পে যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পরমেশ্বরের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা যে, তিনি পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

